শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ

স্বামী সারদানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

নবম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

দুই টাকা আট আনা

নিবেদন

গুরুভাবের উত্তরার্দ্ধ প্রকাশিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যভাগের পরিচয়মাত্র গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়া পাঠক হয়ত বলিবেন, এ বিপরীত প্রথার অবলম্বন কেন? ঠাকুরের জন্মাবধি সাধনকাল পর্য্যন্ত সময়ের জীবনেতিহাস পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ না করিয়া তাঁহার সিদ্ধাবস্থার কথা অগ্রে বলা হইল কেন? তদুত্তরে আমাদিগকে বলিতে হয় যে—

প্রথম—পূর্ব্ব হইতে মতলব আঁটিয়া আমরা ঐ লোকোত্তর পুরুষের জীবনী লিখিতে বসি নাই। তাঁহার মহদুদার জীবনেতিহাস আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা যথাযথ লিপিবদ্ধ হওয়া যে সম্ভবপর, এ উচ্চাশাও কখন হৃদয়ে পোষণ করিতে সাহসী হই নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দুই চারিটি কথামাত্র 'উদ্বোধনের' পাঠকবর্গকে জানাইবার অভিপ্রায়েই আমরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। উহাতে এতদূর যে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে সে কথা তখন বুঝিতে পারি নাই। অতএব ঐরূপ স্থলে পরের কথা যে পূর্ব্বে বলা হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

দ্বিতীয়তঃ—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনের কথা লিপিবদ্ধ করিতে আমাদের পূর্ব্বে অনেকেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। স্থলে স্থলে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলেও ঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই ঐরূপে মোটামুটি-ভাবে সাধারণের নয়নগোচর হইয়াছিল। তজ্জন্য পুনরায় ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া এ পর্য্যন্ত

কেহই যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই তদ্বিষয়ে অর্থাৎ ঠাকুরের অলৌকিক ভাবসকল পাঠককে যথাযথ বুঝাইতে যত্ন করাই আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলাম। আবার ঠাকুরের ভাবমুখে অবস্থান এবং তাঁহাতে গুরুভাবের স্বাভাবিক বিকাশপ্রাপ্তি এই বিষয়টি প্রথমে না বুঝিতে পারিলে তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র, অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোভাব এবং অসাধারণ কার্য্যকলাপের কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না বলিয়াই আমরা ঐ বিষয় পাঠককে সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে স্থলে স্থলে ঠাকুরের বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও মনোভাবের কথা বুঝাইতে যাইয়া তোমরা নিজে ঐ সকল যে ভাবে বুঝিয়াছ তাহাই পাঠককে বলিতে চেষ্টা করিয়াছ। উহাতে তোমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাকেই ঠাকুরের দুরবগাহ চরিত্র ও মনোভাবের পরিমাপক করা হইয়াছে। ঐরূপে তোমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা যে ঠাকুরকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ এ কথা স্পষ্টতঃ না হউক পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া তোমরা কি তাঁহাকে সাধারণ নয়নে ছোট কর নাই? ঐরূপ না করিয়া যথার্থ ঘটনার কেবলমাত্র যথাযথ উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই ত হইত? উহাতে ঠাকুরকেও ছোট করা হইত না এবং যাহার যেরূপ বুদ্ধি সে সেইভাবেই ঐ সকলের অর্থ বুঝিয়া লইতে পারিত।

কথাগুলি আপাতমনোহর হইলেও অল্প চিন্তার ফলেই উহাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতীয়মান হইবে। কারণ, বিষয়বিশেষ ধরিতে ও বুঝিতে মানব চিরকালই তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে এবং পরেও তদ্রূপ করিতে থাকিবে। ঐরূপ করা ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর নাই। উহাতে এ কথা কিন্তু

কখনই প্রতিপন্ন হয় না যে, গ্রাহ্য বিষয়াপেক্ষা তাহার মনবুদ্ধ্যাদি বড়। দেশ, কাল, বিশ্ব, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি সকল অনন্ত পদার্থকেই মানব মন-বুদ্ধির অতীত জানিয়াও পূর্ব্বোক্তভাবে সর্ব্বদা ধরিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ঐ সকল পদার্থকে তাহার ঐরূপে বুঝিবার চেষ্টাকে আমরা পরিমাণ করাও বলি না অথবা দূষণীয়ও বিবেচনা করি না। পরন্তু ইহাই বুঝিয়া থাকি যে, ঐ চেষ্টার ফলে তাহার নিজ মন-বুদ্ধিই পরিশেষে প্রশস্ততা লাভ করিয়া তাহার কল্যাণসাধন করিবে।

অতএব লোকোত্তর পুরুষদিগের অলৌকিক চেষ্টাদির ঐরূপে অনুধাবন করিলে উহাতে আমাদের নিজ কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে পরিমাণ করা হয় না। মন ও বুদ্ধির সাধন-প্রসূত শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারেই লোকে তাঁহাদের দিব্যভাব ও কার্য্যকলাপ অল্প বা অধিক পরিমাণে বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র-সম্বন্ধে আমরা যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিকতরভাবে উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ নিজ মন-বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে উহাতে দূষ্য কিছুই নাই; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি —এ কথা মনে না করিলেই হইল। ঐ কথাটির দৃঢ় ধারণা হৃদয়ে থাকিলেই ঐ সকল বৃথা আশঙ্কার আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। ইতি

বিনীত

গ্রন্থকার



বিস্তারিত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

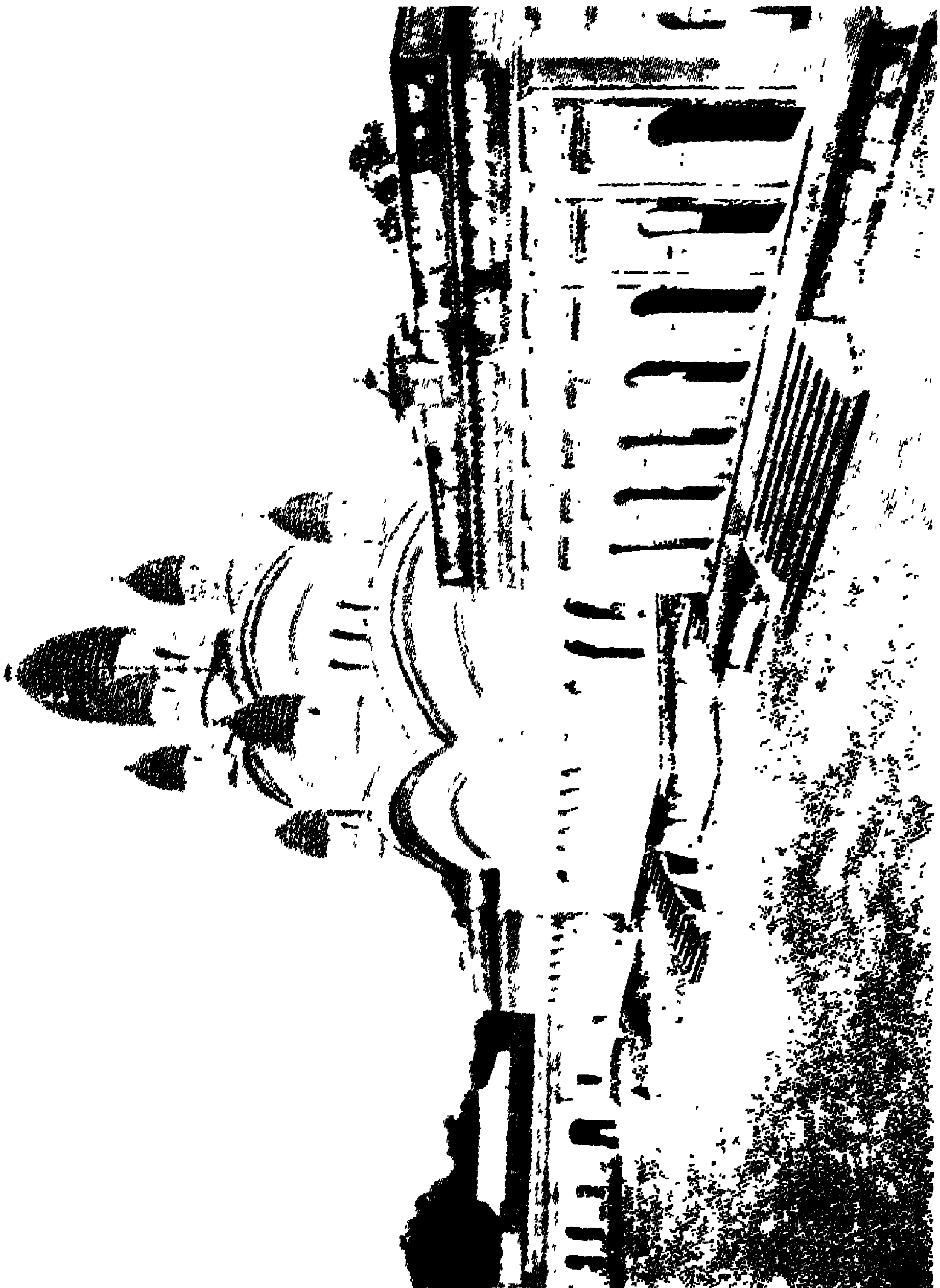
চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

পরিশিষ্ট



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীর কথা

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥

—গীতা, ৩।৩১

কলিকাতার জনসাধারণের ধারণা, ঠাকুর কলিকাতার কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ কতকগুলি ইংরাজীশিক্ষিত, পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত নব্য হিন্দুদলের লোকের ভিতরেই ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন বা তাঁহাদের ভিতরে পূর্ব্ব হইতে প্রদীপ্ত ধর্ম্মভাবকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার লোকেরা ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা জানিতে পারিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ঠাকুরের নিকটে বাঙ্গালা এবং উত্তর ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশ হইতে সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধু, সাধক এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসকল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের জলন্ত জীবন্ত ধর্ম্মাদর্শ ও গুরুভাবসহায়ে আপন আপন নির্জীব ধর্ম্মজীবনে প্রাণসঞ্চার লাভ করিয়া অন্যত্র

দক্ষিণেশ্বরাগত সাধু ও সাধকগণের সহিত ঠাকুরের গুরুভাবের সম্বন্ধবিষয়ে কলিকাতার লোকের অজ্ঞতা

অনেকানেক লোকের ভিতর সেই নব ভাব, নব শক্তি সঞ্চারিত করিতে গমন করিয়াছিলেন—এ কথা কলিকাতার ইতরসাধারণে অবগত নহেন।

ঠাকুর বলিতেন—'ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আপনি আসিয়া জুটে', তাহাকে ডাকিয়া আনিতে হয় না। তোমার ভিতরে ঈশ্বরভক্তি ও প্রেম যথার্থই বিকশিত হইলে যাঁহারা ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুসন্ধানে, সত্যলাভের জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে কি একটা অনির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক নিয়মের বশে তোমার নিকট আসিয়া জুটিবেনই জুটিবেন! ঠাকুরের মতই ছিল সেজন্য—অগ্রে ঈশ্বরবস্তু লাভ কর, তাঁহার দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া যথার্থ লোক-হিতের জন্য কার্য্য করিবার ক্ষমতায় ভূষিত হও, ঐ বিষয়ে তাঁহার আদেশ বা 'চাপরাস' লাভ কর তবে ধর্ম্মপ্রচার বা বহুজনহিতায় কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হও; নতুবা ঠাকুর বলিতেন, "তোমার কথা লইবে কে? তুমি যাহা করিতে বলিবে, দশে তা লইবে কেন, শুনিবে কেন?"

'ফুল ফুটিলে ভ্রমর জুটে।' ধর্ম্মদানের যোগ্যতা চাই, নতুবা প্রচার বৃথা

বাস্তবিক এই জন্ম-জরা-মৃত্যু-সঙ্কুল দুঃখ-দারিদ্র্য-অজ্ঞানান্ধকার-পূর্ণ জগতে আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া যতই কেন আপনাদের অপরের অপেক্ষা বড় জ্ঞান করি না, অবস্থা আমাদের সকলেরই সমান! জড় বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী জগজ্জননীর মায়ার রাজ্যে দুই-চারিটা দ্রব্যগুণ জানিয়া লইয়া যতই কেন

আধ্যাত্মিক বিষয়ে সকলেই সমান অন্ধ

আমরা কল-কারখানার বিস্তার করি না, দুর্দ্দশা আমাদের চিরকাল সমানই রহিয়াছে! সেই ইন্দ্রিয়-তাড়না, সেই লোভ-লালসা, সেই নিরন্তর মৃত্যুভয়, সেই কে আমি, কেনই বা এখানে, পরেই বা কোথায় যাইব, পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধি-সহায়ে সত্যলাভের প্রয়াসী হইলেও ঐ সকলের দ্বারাই পদে পদে প্রতারিত ও বিপথগামী, আমার এ খেলার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কখনও হইবে কিনা—এ সকল বিষয়ে পূর্ণ মাত্রায় অজ্ঞানতা নিরন্তরই বিদ্যমান! এ চির-অভাবগ্রস্ত সংসারে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লইবার লোক ত সকলেই! কিন্তু তাহাদের উহা দেয় কে? বাস্তবিক কাহারও যদি কিছু দান করিবার থাকে ত সে কত দিবে দিক্ না। কিন্তু ভ্রান্ত— শত ভ্রান্ত মানব সে কথা বুঝে না। কিছু না থাকিলেও সে নাম-যশের বা অন্য কিছু স্বার্থের প্ররোচনায় অগ্রেই যাহা তাহার নাই অপরকে তাহা দিতে ছুটে বা সে যে তাহা দিতে পারে এইরূপ ভান করে এবং 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' আপনিও হায় হায় করিয়া পশ্চাত্তাপ করে এবং অপরকেও সেইরূপ করায়!

ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচার কি ভাবে করেন

সেই জন্যই ঠাকুর সংসারে সকলে যে পথে চলিতেছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ণমাত্রায় ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সংযমাদি-অভ্যাসে আপনাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের ঠিক ঠিক যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ফেলিলেন এবং সত্যবস্তু লাভ করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত হইয়া একই স্থানে বসিয়া জীবন কাটাইয়া যথার্থ কার্য্যানুষ্ঠানের এক নূতন ধারা দেখাইয়া গেলেন। দেখাইলেন যে, বস্তুলাভ করিয়া অপরকে দিবার যথার্থ কিছু সংগ্রহ করিয়া যেমন তিনি উহা বিতরণের নিমিত্ত

তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন, অমনি অনাহূত হইলেও কোথা হইতে পিপাসু লোকসকল আসিয়া জুটিতে লাগিল এবং তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ও স্পর্শে পূত হইয়া নিজেরাই যে কেবল ধন্য হইয়া গেল তাহা নহে, কিন্তু সেই নব ভাব তাহারা যেখানেই যাইতে লাগিল সেখানেই প্রসারিত করিয়া অপর সাধারণকে ধন্য করিতে লাগিল। কারণ ভিতরে যে ভাবরাশি থাকে তাহাই আমরা বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকি—তা আমরা যেখানেই থাকি না কেন। ঠাকুর তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় যেমন বলিতেন, "যে যা খায় তার ঢেকুরে (উদ্গারে) সেই গন্ধই পাওয়া যায়—শসা খাও, শসার গন্ধ বেরুবে; মূলো খাও, মূলোর গন্ধ বেরুবে—এইরূপই হয়।"

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত সম্মিলন ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। দেখিতে পাই, ঐ সময় হইতেই তিনি শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে যেমন দৃঢ় ও দ্রুতপদে অগ্রসর, তেমনি আবার তাঁহাতে গুরুভাবের বিশেষ প্রকাশ হইতে আরম্ভ। কিন্তু ঐ কালের পূর্ব্বে তাঁহাতে যে ঐ ভাব আদৌ ছিল না, তাহা বলিতে পারি না। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিকাশ বাল্যাবধি সকল সময়েই স্বল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান এবং এমন কি, তাঁহার নিজ দীক্ষা-গুরুগণও ঐ গুরুভাবের সহায়ে নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনের অভাব, ত্রুটি ও অবসাদ দূরীভূত করিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্তির অবসর পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণীর সহিত মিলনকালে ঠাকুরের অবস্থা

ব্রাহ্মণী আসিবার পূর্ব্বে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ ও

ব্যাকুলতা উন্মত্ততা ও শারীরিক ব্যাধি বলিয়াই অনেকটা গণ্য হইয়া আসিতেছিল এবং উহার উপশমের জন্য চিকিৎসাও হইতেছিল ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাটীতে। পূর্ব্ববঙ্গীয় জনৈক সাধক কবিরাজ চিকিৎসার জন্য আগত ঠাকুরকে দেখিয়া ঐ সকল শারীরিক লক্ষণসমূহকে 'যোগজ বিকার' বা যোগাভ্যাস করিতে করিতে শরীরে যে সকল অসাধারণ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও সে কথায় তখন কেহ একটা বড় আস্থা স্থাপন করেন নাই। মথুরপ্রমুখ সকলেই স্থির করিতেছিলেন, উহা ঈশ্বরানুরাগের সহিত বায়ুরোগের সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞা বিদুষী ব্রাহ্মণীই ঐ সকল শারীরিক বিকারকে প্রথম অসাধারণ ঈশ্বরভক্তি-প্রসূত দেববাঞ্ছিত মানসিক পরিবর্ত্তনের অনুরূপ দিব্য শারীরিক পরিবর্ত্তন বলিয়া সকলের সমক্ষে নির্দ্দেশ করিলেন। শুধু নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রেম-ভক্তিরূপিণী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধা হইতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত যোগী আচার্য্যগণের জীবনেই যে অপূর্ব্ব মানসিক অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ঐরূপ অনুভূতিসমূহ সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেকথা যে ভক্তিগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাও তিনি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া এবং ঠাকুরের শারীরিক লক্ষণের সহিত ঐ সকল মিলাইয়া নিজ বাক্য প্রমাণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে কথায় জননীর আশ্বাসে বালক যেমন সাহস ও বল পাইয়া আনন্দ প্রকাশ কবিতে থাকে, ঠাকুর ত তদ্রূপ করিতে

ঠাকুরের উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে অপরে কি বুঝিত

লাগিলেনই আবার মথুরপ্রমুখ কালীবাটীর সকলেও বড় অল্প আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তাহার উপর যখন ব্রাহ্মণী মথুরকে বলিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত সকলকে আন, আমি তাঁহাদের নিকট আমার একথা প্রমাণিত করিতে প্রস্তুত", তখন আর তাঁহাদের আশ্চর্য্যের পরিসীমা রহিল না।

ঠাকুরের অবস্থা বুঝিয়া ব্রাহ্মণী শাস্ত্রজ্ঞদের আনিতে বলায় মথুরের সিদ্ধান্ত

কিন্তু আশ্চর্য্য হইলে কি হইবে? ভিক্ষাব্রতাবলম্বিনী, নগণ্যা একটা অপরিচিতা স্ত্রীলোকের কথায় ও পাণ্ডিত্যে সহসা কে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে? কাজেই পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিরাজের কথার ন্যায় ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কথাও মথুরানাথ প্রভৃতির হৃদয়ে এক কান দিয়া প্রবেশলাভ করিয়া অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যাইত নিশ্চয়, তবে ঠাকুরের আগ্রহ ও অনুরোধে ব্যাপারটা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। বালকবৎ ঠাকুর মথুর বাবুকে ধরিয়া বসিলেন, 'ভাল ভাল পণ্ডিত আনাইয়া ব্রাহ্মণী যাহা বলিতেছে, তাহা যাচাইতে হইবে।' ধনী মথুরও ভাবিলেন—ছোট ভট্চাযের জন্য ঔষধে ও ডাক্তার খরচায় ত এত টাকা ব্যয় হইতেছে, তা ঐরূপ করিতে দোষ কি? পণ্ডিতেরা আসিয়া শাস্ত্রপ্রমাণে ব্রাহ্মণীর কথা কাটিয়া দিলে—এবং দিবেও নিশ্চিত—অন্ততঃ একটা লাভও হইবে। পণ্ডিতদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ছোট ভট্চাযের সরল বিশ্বাসী হৃদয়ে অন্ততঃ এ ধারণাটা হইবে যে তাঁহার রোগবিশেষ হইয়াছে—তাহাতে তাঁহার নিজের মনের উপর একটা বাঁধ দিতেও ইচ্ছা হইতে পারে। পাগল ত লোক এইরূপেই হয়—নিজে যাহা করিতেছি, বুঝিতেছি, তাহাই



শ্রীযুক্ত মথুরবাবু

ঠিক আর অপর দশ জনে যাহা বুঝিতেছে, করিতে বলিতেছ, তাহা ভুল—এইটি নিশ্চয় করিয়া নিজের মনের উপর, চিন্তার উপর বাঁধ না দিয়া মনকে নিজের বশীভূত রাখিবার চেষ্টা না করিয়াই ত লোক পাগল হয়! আর পণ্ডিতদের না ডাকিয়া ভট্‌চাযকে ব্রাহ্মণীর কথায় অবাধে বিশ্বাস করিতে দিলে তাঁহার মানসিক বিকার আরও বাড়িয়া শারীরিক রোগও যে বাড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। এইরূপে কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের প্রতি ভালবাসায়—ঐরূপ কিছু একটা ভাবিয়াই যে মথুর ঠাকুরের অনুরোধে পণ্ডিতদিগকে আনাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

বৈষ্ণবচরণ ও ইঁদেশের গৌরীকে আহ্বান

কলিকাতার পণ্ডিতমহলে তখন বৈষ্ণবচরণের বেশ প্রতিপত্তি। আবার অনেক স্থলে সকলের সমক্ষে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া পাঠ করায় ইতর-সাধারণের নিকটেও তাঁহার খুব নামযশ। সেজন্য ঠাকুর, মথুর বাবু ও ব্রাহ্মণী সকলেই তাঁহার কথা ইতি-পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। মথুর তাঁহাকে আনাইতে মনোনীত করিলেন এবং বাঁকুড়া অঞ্চলের ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিতের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকেও আনাইবার মানস করিলেন। এইরূপেই বৈষ্ণবচরণ ও ইঁদেশের গৌরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন হয়। ঠাকুরের নিকট আমরা ইঁদেশের অনেক কথা অনেক সময় শুনিয়াছি। তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।

বৈষ্ণবচরণ কেবল যে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু

একজন ভক্ত সাধক বলিয়াও সাধারণে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে বিশেষতঃ ভক্তি-শাস্ত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহাকে তাৎকালিক বৈষ্ণব-সমাজের একজন নেতা করিয়া তুলিয়াছিল, বলা যাইতে পারে। বিদায় আদায় নিমন্ত্রণাদিতে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে অগ্রেই সাদরে আহ্বান করিতেন। ধর্ম্মবিষয়ক কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে সমাজ অনেক সময় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন ও তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। আবার সাধনপথের ঠিক ঠিক নির্দ্দেশ পাইবার জন্য অনেক ভক্ত সাধকও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারই পরামর্শে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। কাজেই ভক্তির আতিশয্যে ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাদি হইতেছে কিংবা কোনরূপ শারীরিকব্যাধিগ্রস্ত হওয়াতে ঐরূপ হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে যে বৈষ্ণবচরণকে মথুর আনিতে সঙ্কল্প করিবেন ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

বৈষ্ণবচরণের তখন কতদূর খ্যাতি

ভৈরবী ব্রাহ্মণী আবার ইতিমধ্যে ঠাকুরের অবস্থা-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সত্য তদ্বিষয়ে এক বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া নিজেও উল্লসিতা হইয়াছিলেন এবং অপরেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহা এই—ব্রাহ্মণীর আগমন-কালের কিছু পূর্ব্ব হইতে ঠাকুর গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইতেছিলেন। সে জ্বালানিবারণে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, সূর্য্যোদয় হইতে যত বেলা হইত ততই সে জ্বালা অধিকতর বৃদ্ধি পাইত। দুই-প্রহরে এত অসহ্য হইয়া উঠিত যে,

ঠাকুরের গাত্রদাহ-নিবারণে ব্রাহ্মণীর ব্যবস্থা

গঙ্গার জলে শরীর ডুবাইয়া মাথায় একখানি ভিজা গামছা চাপা দিয়া দুই-তিন ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইত! আবার অত অধিকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিলে পাছে বিপরীত ঠাণ্ডা লাগিয়া অন্যরূপ অসুস্থতা উপস্থিত হয়, এজন্য ইচ্ছা না হইলেও জল হইতে উঠিয়া আসিয়া বাবুদের কুঠির-ঘরের মর্ম্মর-প্রস্তর-বাঁধান মেজে ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া ঘরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া সেই মেজেতে গড়াগড়ি দিতে হইত!

ব্রাহ্মণী ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থার কথা শুনিয়াই অন্যরূপ ধারণা করিলেন। বলিলেন, উহা ব্যাধি নয়; উহাও ঠাকুরের মনের প্রবল আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বরানুরাগের ফলেই উপস্থিত হইয়াছে। বলিলেন, ঈশ্বরদর্শনের অত্যুগ্র ব্যাকুলতায় শরীরে এইরূপ বিকার-লক্ষণসকল শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে অনেক সময় উপস্থিত হইত। এ রোগের ঔষধও অপূর্ব্ব—সুগন্ধি পুষ্পের মাল্যধারণ এবং সর্ব্বাঙ্গে সুবাসিত চন্দনলেপন।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণীর ঐ প্রকার রোগনির্দ্দেশে বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, মথুরপ্রমুখ সকলে হাস্য সংবরণ করিতেও পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, কত ঔষধসেবন, মধ্যমনারায়ণ বিষ্ণুতৈলাদি কত তৈলমর্দ্দন করিয়া যাহার কিছু উপশম হইল না, তাহা কি না বলে 'রোগ নয়'। তবে ব্রাহ্মণী যে সহজ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছে তাহার ব্যবহারে কাহারও কোনও আপত্তিই হইতে পারে না। দুই-এক দিন লাগাইয়া কোন ফল না পাইলে রোগী আপনিই উহা ত্যাগ করিবে। অতএব ব্রাহ্মণীর কথামত ঠাকুরের শরীর চন্দনলেপ ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইল। কিন্তু তিন দিন ঐরূপ অনুষ্ঠানের পর

দেখা গেল, ঠাকুরের সে গাত্রদাহ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে! সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু অবিশ্বাসী মন কি সহজে ছাড়ে? বলিল—ওটা কাকতালীয়ের ন্যায় হইয়াছে আর কি! ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শেষে ঐ যে বিষ্ণুতৈলটা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ওটা একেবারে খাঁটি তেল ছিল; কবিরাজের কথার ভাবেই সেটা বুঝা গিয়াছিল—সেই তৈলটাতেই উপকার হইয়া আসিতেছিল; আর দুই-এক দিন ব্যবহার করিলেই সব জ্বালাটুকু দূর হইত, এমন সময় ভৈরবী চন্দন মাখাইবার ব্যবস্থাটা করিয়াছে, তাই ঐ প্রকার হইয়াছে। ব্রাহ্মণী যাহাই বলুক আর ব্যবস্থা করুক না কেন, ও তৈলটা কিন্তু বরাবর মাখান উচিত।

ঠাকুরের বিপরীত ক্ষুধানিবারণে ব্রাহ্মণীর ব্যবস্থা

কিছুদিন পরে ঠাকুরের আবার এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণীর সহজ ব্যবস্থায় উহাও তিন দিনে নিবারিত হইয়াছিল—এ কথাও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, "এ-সময় একটা বিপরীত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। যতই কেন খাই না, পেট কিছুতেই যেন ভরৃত না। এই খেয়ে উঠলুম, আবার তখনি যেন কিছু খাই নাই—সমান খাবার ইচ্ছা! দিন-রাত্রি কেবলই 'খাই খাই' ইচ্ছা—তার আর বিরাম নেই। ভাবলুম, এ আবার কি ব্যারাম হল? বামনীকে বল্লুম, সে বল্লে—'বাবা, ভয় নেই; ঈশ্বরপথের পথিকদের ওরকম অবস্থা কখন কখন হয়ে থাকে, শাস্ত্রে এ কথা আছে; আমি তোমার ওটা ভাল করে দিচ্ছি।' এই বলে' মথুরকে বলে' ঘরের ভেতর চিঁড়ে-

মুড়কি থেকে সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি অবধি যত রকম খাবার আছে, সব থরে থরে সাজিয়ে রাখলে আর বল্লে, 'বাবা, তুমি এই ঘরে দিন-রাত্তির থাক আর যখন যা ইচ্ছে হবে তখনই তা খাও।' সেই ঘরে থাকি, বেড়াই ; সেই সব খাবার দেখি, নাড়িচাড়ি ; কখনও এটা থেকে কিছু খাই, কখনও ওটা থেকে কিছু খাই—এই রকমে তিন দিন কেটে যাবার পর সে বিপরীত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছাটা চলে গেল, তবে বাঁচি।"

যোগসাধনার ফলে ঐ সকল অবস্থার উদয়। ঠাকুরের ঐরূপ ক্ষুধা সম্বন্ধে আমরা যাহা দেখিয়াছি

যোগ বা ঈশ্বরে মনের তন্ময়ভাবে অবস্থানের অবস্থাটা সহজ হইয়া আসিবার পূর্ব্বে এবং কখন কখন পরেও এইরূপ বিপরীত ক্ষুধাদির উদ্রেকের কথা সাধকদিগের জীবনে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরের জীবনেও অনেকবার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়াছি! তবে ঠাকুরের সম্বন্ধে আমরা যাহা দেখিয়াছি, সেটা একটু অন্য প্রকারের অবস্থা। উপরোক্ত সময়ের মত তখন ঠাকুর নিরন্তর ঐরূপ ক্ষুধায় পীড়িত থাকিতেন না। কিন্তু সহজাবস্থায় সচরাচর তাঁহার যেরূপ আহার ছিল তাহার চতুর্গুণ বা ততোধিক পরিমাণ খাদ্য ভাবাবস্থায় উদরস্থ করিলেন, অথচ তজ্জন্য কোনই শারীরিক অসুস্থতা হইল না—এইরূপ হইতেই দেখিয়াছি। ঐরূপ দুই একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক উহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বেই ঐ বিষয়ের আভাস আমরা পাঠককে দিয়াছি।[১]

[১] পূর্ব্বার্দ্ধ, প্রথম অধ্যায়, দেখ।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে স্ত্রী-ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বে একস্থলে বাগবাজারের কয়েকটি ভদ্রমহিলার ভোলা ময়রার দোকান হইতে একখানি বড় সর লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গমনের কথা এবং তথায় তাঁহার দর্শন না পাইয়া কোনও প্রকারে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা 'মাষ্টার' মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের দর্শন-লাভ, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের—ঠাকুর যাঁহাকে 'মোটা বামুন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন—সহসা তথায় আগমন ও ঐ সকল মহিলাদের ঠাকুর যে তক্তাপোশের উপর বসিয়াছিলেন তাহারই তলে লুকাইয়া থাকা প্রভৃতি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি; সে রাত্রে ঠাকুর আহারাদির পর দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পুনরায় কিরূপে ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্ত্রীভক্তদিগের আনীত বড় সরখানির প্রায় সমস্ত খাইয়া ফেলেন, সেকথাও আমরা পাঠককে বলিয়াছি। এখন ঐরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আমরা এখানে করিব। কয়েকটি ঘটনার কথাই বলিব, কারণ ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিত। অতএব তদ্বিষয়ে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

১ম দৃষ্টান্ত—বড় একখানি সর খাওয়া

ম্যালেরিয়ার প্রথমাগমন ও প্রকোপে 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশ, বিশেষতঃ রাঢ়ভূমি বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হইবার পূর্ব্বাবধি হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলাসকলের স্বাস্থ্য যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসকলের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না, একথা এখনও প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

২য় দৃষ্টান্ত—কামারপুকুরে এক সের মিষ্টান্ন ও মুড়ি খাওয়া

তাঁহারা বলেন, লোকে তখন বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইত। কামারপুকুর বর্দ্ধমান হইতে বার তের ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ঐ স্থানের জলবায়ুও তখন বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল। দ্বাদশ বৎসর অদৃষ্টপূর্ব্ব কঠোর তপস্যায় এবং পরেও নিরন্তর শরীরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া 'ভাবমুখে' থাকায় ঠাকুরের বজ্রসম দৃঢ় শরীরও যে ক্রমে ক্রমে শারীরিক পরিশ্রমে অপটু এবং কখন কখন প্রবল-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে জন্য ঠাকুর সাধনকালের অন্তে প্রতিবৎসর চাতুর্ম্মাস্যের সময়টা জন্মভূমি কামারপুকুর অঞ্চলেই কাটাইয়া আসিতেন। পরম অনুগত সেবক ভাগিনেয় হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত এবং মথুর বাবু যাওয়া-আসার সমস্ত খরচা ছাড়া পল্লীগ্রামে তাঁহার কোন বিষয়ের পাছে অভাব হয় এজন্য সংসারের আবশ্যকীয় যত কিছু পদার্থ তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিতেন। শুনিয়াছি লোকে নিজ কন্যাকে প্রথম শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার কালে যেমন প্রদীপের সল্‌তেটি ও আহারান্তে ব্যবহার্য্য খড়কে-কাঠিটি পর্য্যন্ত সঙ্গে দিয়া থাকে, মথুর বাবু ও তাঁহার পরম ভক্তিমতী গৃহিণী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে কামারপুকুরে পাঠাইবার কালে অনেক সময় সেইরূপ ভাবে 'ঘর বসত্' সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিতেন। কারণ এ কথা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না যে, কামারপুকুরে ঠাকুরের সংসার যেন শিবের সংসার! সঞ্চয়ের নামগন্ধ ঠাকুরের পিতৃপিতামহের কাল হইতেই ছিল না। সৎপথে থাকিয়া যাহা জোটে তাহাই খাওয়া এবং ৺রঘুবীরের নামে প্রদত্ত দেড় বিঘা মাত্র জমিতে যে ধান্য হয় তাহাতেই সমস্ত বৎসর সংসার চালান

ঐ পরিবারের রীতি ছিল! পল্লীর মুদির দোকানই এ পবিত্র দেবসংসারের ভাণ্ডারস্বরূপ! যদি বিদায়-আদায়ে কিছু পয়সা-কড়ি পাওয়া গেল তবেই সে ভাণ্ডার হইতে সংসারের ব্যবহার্য্য তরি-তরকারি তৈল-লবণাদি সেদিনকার মত বাহির হইল, নতুবা পুষ্করিণীর পারের অযত্নলভ্য শাকান্নে আনন্দে জীবনধারণ! আর সর্ব্বসময়ে সকল বিষয়ে যা করেন জীবন্ত জাগ্রত কুলদেবতা ৺রঘুবীর! ঐ সকল কথা জানা ছিল বলিয়াই মথুর বাবুর কয়েক বিঘা ধান্যজমি শ্রীশ্রীরঘুবীরের নামে ক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ এবং ঠাকুরকে দেশে পাঠাইবার কালে সংসারের আবশ্যকীয় সকল পদার্থ ঠাকুরের সঙ্গে পাঠান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর চাতুর্ম্মাস্যের সময় কখন কখন কামারপুকুরে আসিতেন। প্রায় প্রতি বৎসরই আসিতেন। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় এইরূপে এক বৎসর আসিয়া জ্বররোগে বিশেষ কষ্ট পান—তদবধি আর দেশে যাইবেন না সঙ্কল্প করেন এবং আর তথায় গমনও করেন নাই। ঠাকুরের তিরোভাবের আট দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ বৎসর তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় কামারপুকুরে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার ধর্ম্মালাপ শুনিবার জন্য বাটীতে প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষের ভীড় লাগিয়াই আছে। আনন্দের হাট-বাজার বসিয়াছে! বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে পাইয়া মনের আনন্দে তাঁহার এবং তাঁহাকে দেখিতে সমাগত সকলের সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। দিনের পর দিন, সুখের দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া যাইতেছে তাহা কাহারও

অনুভব হইতেছে না! বাটীতে তখন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল দাদার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীই গৃহিণীস্বরূপে ছিলেন এবং তাঁহার কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী-দিদি ও পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী বাস করিতেছিলেন।

রাত্রি প্রায় এক-প্রহর হইয়াছে। প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষেরা রাত্রের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ বাটীতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঠাকুরের কয়েক দিন হইতে অগ্নিমান্দ্য ও পেটের অসুখ হইয়াছে, সেজন্য রাত্রে সাগু বার্লি ভিন্ন অন্য কিছুই খান না। আজও রাত্রে দুধ বার্লি খাইয়া শয়ন করিলেন। বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহার আহার ও শয়নের পর নিজেরা আহারাদি করিলেন এবং রাত্রিতে করণীয় সংসারের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া এইবার শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সহসা ঠাকুর তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভাবাবেশে টলমল করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন এবং রামলাল দাদার মাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সব শুলে যে? আমাকে কিছু খেতে না দিয়ে শুলে যে?"

রামলালের মাতা—ওমা, সে কি গো? তুমি যে এই খেলে!

ঠাকুর—কৈ খেলুম? আমি ত এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আস্‌চি—কৈ খাওয়ালে?

স্ত্রীলোকেরা সকলে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন! বুঝিলেন, ঠাকুর ভাবাবেশে ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু উপায়? ঘরে এখন আর এমন কোনরূপ খাদ্য-দ্রব্যই নাই, যাহা ঠাকুরকে খাইতে দিতে পারেন! এখন

উপায়? কাজেই রামলাল দাদার মাতাকে ভয়ে ভয়ে বলিতে হইল—"ঘরে এখন তো আর কিছু খাবার নেই, কেবল মুড়ি আছে। তা মুড়ি খাবে? দুটি খাও না। তাতে পেটের অসুখ করবে না।" এই বলিয়া থালে করিয়া মুড়ি আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর তাহা দেখিয়া বালকের ন্যায় রাগ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন—"শুধু মুড়ি আমি খাব না।" অনেক বুঝান হইল—"তোমার পেটের অসুখ, অপর কিছু তো খাওয়া চলবে না, আর দোকান-পসারও এ রাত্রে সব বন্ধ—সাগু বালি যে কিনে এনে করে দেব তারও যো নেই। আজ এই দুটি খেয়ে থাক, কাল সকালে উঠেই ঝোল-ভাত রেঁধে দেব" ইত্যাদি; কিন্তু সে কথা শুনে কে? অভিমানী আবদেরে বালকের ন্যায় ঠাকুরের সেই একই কথা—"ও আমি খাব না।"

কাজেই রামলাল দাদা তখন বাহিরে যাইয়া ডাকাডাকি করিয়া দোকানীর ঘুম ভাঙ্গাইলেন এবং এক সের মিঠাই কিনিয়া আনিলেন। সেই এক সের মিষ্টান্ন এবং সহজ লোকে যত খাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক মুড়ি থালে ঢালিয়া দেওয়া হইলে তবে ঠাকুর আনন্দ করিয়া খাইতে বসিলেন এবং উহার সকলই নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলেন! তখন বাটীর সকলের ভয়—'এই পেট-রোগা মানুষ, মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন সাগু বার্লি খেয়ে থাকা, আর এই রাত্রে এইসব খাওয়া! কাল একটা কাণ্ড হবে আর কি!' কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দেখা গেল পরদিন ঠাকুরের শরীর বেশ আছে, রাত্রে খাইবার জন্য কোনরূপ অসুস্থতাই নাই!

আর একবার ঐরূপে কামারপুকুর অঞ্চলে বাস করিবার

কালে ঠাকুরকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে জয়রামবাটী গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। রাত্রের আহারাদির পর শয়ন করিবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন—"বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" বাটীর মেয়েরা ভাবিয়া আকুল—কি খাইতে দিবে, ঘরে কিছুই নাই! কারণ সে দিন বাটীতে পূর্ব্বপুরুষদিগের কাহারও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা ঐরূপ একটা কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম হইয়াছিল এবং সেজন্য বাটীতে অনেক লোকের আগমন হওয়ায় সকল প্রকার খাদ্যাদিই নিঃশেষে উঠিয়া গিয়াছিল। কেবল হাঁড়িতে কতকগুলা পান্তাভাত ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে ভয়ে ভয়ে ঐ কথা জানাইলে ঠাকুর বলিলেন, "তাই নিয়ে এস।" তিনি বলিলেন—"কিন্তু তরকারী ত নাই।"

৩য় দৃষ্টান্ত—জয়রামবাটীতে একটি মৌরলা মাছ সহায়ে এক রেক চালের পান্তাভাত খাওয়া

ঠাকুর—দেখ না খুঁজে-পেতে; তোমরা 'মাছ চাটুই' (ঝাল-হলুদে মাছ) করেছিলে তো? দেখ না তার একটু আছে কি না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অনুসন্ধানে দেখিলেন, ঐ পাত্রে একটি ক্ষুদ্র মৌরলা মাছ ও একটু কাই কাই রস লাগিয়া আছে। অগত্যা তাহাই আনিলেন। দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ! সেই রাত্রে সেই পান্তাভাত খাইতে বসিলেন এবং ঐ একটি ক্ষুদ্র মৎস্যের সহায়ে এক রেক চালের ভাত খাইয়া শান্ত হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ হইত। একদিন ঐরূপে প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় উঠিয়া ঠাকুর রামলাল দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ভারি ক্ষুধা পেয়েছে, কি হবে?"

৪র্থ দৃষ্টান্ত—দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি দু-প্রহরে এক সের হালুয়া খাওয়া

ঘরে অন্য দিন কত মিষ্টান্নাদি মজুত থাকে, সেদিন খুঁজিয়া দেখা গেল, কিছুই নাই! অগত্যা রামলাল দাদা নহবৎখানার নিকটে যাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীভক্ত ছিলেন তাঁহাদের সেই সংবাদ দিলেন। তাঁহারা শশব্যস্তে উঠিয়া খড়কুটো দিয়া উনুন জ্বালিয়া একটি বড় পাথর-বাটির পুরোপুরি এক বাটি, প্রায় এক সের আন্দাজ হালুয়া তৈয়ার করিয়া ঠাকুরের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। জনৈকা স্ত্রী-ভক্তই উহা লইয়া আসিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি ঘরে প্রবেশ করিয়াই চমকিত হইয়া দেখিলেন ঘরের কোণে মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, ঠাকুর ঘরের ভিতর ভাবাবিষ্ট হইয়া পায়চারি করিতেছেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল নিকটে বসিয়া আছে। সেই ধীর স্থির নীরব নিশীথে ঠাকুরের গম্ভীর ভাবোজ্জ্বল বদন, সেই উন্মাদবৎ মাতোয়ারা নগ্ন বেশ ও বিশাল নয়নে স্থির অন্তর্মুখী দৃষ্টি—যাহার সমক্ষে সমগ্র বিশ্বসংসার ইচ্ছামাত্রেই সমাধিতে লুপ্ত হইয়া আবার ইচ্ছামাত্রেই প্রকাশিত হইত—সেই অনন্যমনে গুরুগম্ভীর পাদবিক্ষেপ ও উদ্দেশ্য-বিহীন সানন্দ বিচরণ দেখিয়াই স্ত্রী-ভক্তটির হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইল! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুরের শরীর যেন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়িয়া কত বড় হইয়াছে! তিনি যেন এ পৃথিবীর লোক নহেন! যেন ত্রিদিবের কোন দেবতা নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া দুঃখ-হাহাকার-পূর্ণ নরলোকে রাত্রির তিমিরাবরণে গুপ্ত লুক্কায়িত ভাবে নির্ভীক পদসঞ্চারে বিচরণ করিতেছেন এবং কেমন করিয়া এ শ্মশানভূমিকে দেবভূমিতে পরিণত করিবেন,

করুণাপূর্ণ হৃদয়ে তদুপায়-নির্দ্ধারণে অনন্যমনা হইয়া রহিয়াছেন। যে ঠাকুরকে সর্ব্বদা দেখেন ইনি সেই ঠাকুর নহেন! তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং নিকটে যাইতে একটা অব্যক্ত ভয় হইতে লাগিল।

ঠাকুরের বসিবার জন্য রামলাল পূর্ব্ব হইতেই আসন পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি কোনরূপে যাইয়া সেই আসনের সম্মুখে হালুয়ার বাটিটা রাখিলেন। ঠাকুর খাইতে বসিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভাবের ঘোরে সমস্ত হালুয়াই খাইয়া ফেলিলেন! ঠাকুর কি স্ত্রী-ভক্তের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন? কে জানে! কিন্তু খাইতে খাইতে স্ত্রী-ভক্তটি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি, কে খাচ্চে? আমি খাচ্চি, না আর কেউ খাচ্চে?"

স্ত্রী-ভক্ত—আমার মনে হচ্চে, আপনার ভিতরে যেন আর একজন কে রয়েছেন, তিনিই খাচ্চেন।

ঠাকুর 'ঠিক বলেছ' বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

প্রবল মনোভাবে ঠাকুরের শরীর পরিবর্ত্তিত হওয়া

এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যায়, প্রবল মানসিক ভাবতরঙ্গে ঐ সকল সময়ে ঠাকুরের শরীরে এতদূর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইত যে, তাঁহাকে তখন যেন আর এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইত এবং তাঁহার চাল-চলন, আহার-বিহার, ব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয়ই যেন অন্য প্রকারের হইয়া যাইত! অথচ ঐরূপ বিপরীত আচরণে ভাবভঙ্গের পরেও শরীরে কোনরূপ বিকার লক্ষিত হইত না! ভিতরে অবস্থিত মনই যে আমাদের স্থুল

শরীরটাকে সর্ব্বক্ষণ ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতেছে—এ বিষয়টি আমরা জানিয়াও জানি না, শুনিয়াও বিশ্বাস করি না। কিন্তু বাস্তবিকই যে ঐরূপ হইতেছে তাহার প্রমাণ আমরা এ অদ্ভুত ঠাকুরের জীবনের এই সামান্য ঘটনাসমূহের আলোচনা হইতেও বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু থাক এখন ও কথা, আমরা পূর্ব্ব কথারই অনুসরণ করি।

বৈষ্ণবচরণের আগমনে দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতসভা

কেহ কেহ বলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মুখেই বৈষ্ণবচরণের কথা মথুর বাবু প্রথম জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থাসকল শারীরিক ব্যাধিবিশেষের সহিত যে সম্মিলিত নহে, তাহা পরীক্ষা করাইবার মানস করেন। যাহাই হউক, কিছুদিন পরে বৈষ্ণবচরণ নিমন্ত্রিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন যে একটি ছোটখাট পণ্ডিতসভার আয়োজন হইয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে কতকগুলি ভক্ত সাধক ও পণ্ডিত নিশ্চয়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন; তাহার উপর বিদুষী ব্রাহ্মণী ও মথুর বাবুর দলবল, সকলে ঠাকুরের জন্য একত্র সম্মিলিত; সেই জন্যই সভা বলিতেছি।

ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে ঐ সভায় আলোচনা

এইবার ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। ব্রাহ্মণী ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা লোকমুখে শুনিয়াছেন এবং যাহা স্বয়ং চক্ষে দেখিয়াছেন সেই সমস্তের উল্লেখ করিয়া ভক্তিপথের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণের জীবনে যে-সকল অনুভব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঐ সকল কথার সহিত

ঠাকুরের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া উহা একজাতীয় অবস্থা বলিয়া নিজমত প্রকাশ করিলেন। বৈষ্ণবচরণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি এ বিষয়ে অনুরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ঐরূপ কেন করিতেছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।" মাতা যেমন নিজ সন্তানকে রক্ষা করিতে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হন, ব্রাহ্মণীও যেন আজ সেইরূপ কোন দৈববলে বলশালিনী হইয়া ঠাকুরের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর। আর ঠাকুর—যাঁহার জন্য এত কাণ্ড হইতেছে? আমরা যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, ঠাকুর বাদানুবাদে নিবিষ্ট ঐ সকল লোকের ভিতর আলুথালু ভাবে বসিয়া 'আপনাতে আপনি' আনন্দানুভব ও হাস্য করিতেছেন, আবার কখন বা নিকটস্থ বেটুয়াটি হইতে দুটি মউরি বা কাবাবচিনি মুখে দিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা এমনভাবে শুনিতেছেন যেন ঐ সকল কথা অপর কাহারও সম্বন্ধে হইতেছে! আবার কখন বা নিজের অবস্থার বিষয়ে কোন কথা "ওগো, এই রকমটা হয়" বলিয়া বৈষ্ণবচরণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণবচরণ সাধনপ্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে বৈষ্ণবচরণের সিদ্ধান্ত

কিন্তু পারুন আর নাই পারুন, এ ক্ষেত্রে সকল কথা শুনিয়া ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি ব্রাহ্মণীর সকল কথাই হৃদয়ের সহিত যে অনুমোদন করেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। শুধু তাহাই নহে—বলিয়াছিলেন যে, যে প্রধান প্রধান উনবিংশ প্রকার

ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে শক্তিশাস্ত্র 'মহাভাব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যাহা কেবল একমাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য তাহার সকল লক্ষণগুলিই (ঠাকুরকে দেখাইয়া) ইঁহাতে প্রকাশিত বোধ হইতেছে! জীবের ভাগ্যক্রমে যদি কখন জীবনে মহাভাবের আভাস উপস্থিত হয়, তবে ঐ উনিশ প্রকারের অবস্থার ভিতর বড় জোর দুই পাঁচটা অবস্থাই প্রকাশ পায়! জীবের শরীর ঐ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ কখনই ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং শাস্ত্র বলেন পরেও ধারণে কখন সমর্থ হইবে না। মথুর প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বৈষ্ণব-চরণের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্! ঠাকুরও স্বয়ং বালকের ন্যায় বিস্ময় ও আনন্দে মথুরকে বলিলেন, "ওগো, বলে কি? যা হোক্, বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।"

কর্ত্তাভজাদি সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে ঐরূপ মতপ্রকাশ বৈষ্ণবচরণ যে একটা কথার কথামাত্র ভাবে করেন নাই, তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার অদ্য হইতে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আধিক্য হইতেই পাইয়া থাকি। এখন হইতে তিনি ঠাকুরের দিব্য সঙ্গসুখের জন্য প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে থাকেন, নিজের গোপনীয় রহস্যসাধন-সমূহের কথা ঠাকুরকে বলিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করেন এবং কখন কখন নিজ সাধনপথের সহচর ভক্ত-সাধক সকলেও যাহাতে ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার ন্যায় কৃতার্থ হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটেও তাঁহাকে বেড়াইতে লইয়া যান।

পবিত্রতার ঘনীভূত প্রতিমা-সদৃশ দেবস্বভাব ঠাকুর ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া এবং ইঁহাদের জীবন ও গুপ্ত সাধনপ্রণালীসমূহ অবগত হইয়া সাধারণ দৃষ্টিতে দূষণীয় এবং নিন্দার্হ অনুষ্ঠানসকলও যদি কেহ 'ভগবান-লাভের জন্য করিতেছি,' ঠিক ঠিক এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধন বলিয়া অনুষ্ঠান করে, তবে ঐ সকল হইতেও অধঃপাতে না গিয়া কালে ক্রমশঃ ত্যাগ ও সংযমের অধিকারী হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয় ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করে—এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তবে প্রথম প্রথম ঐ সকল অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া এবং কিছু কিছু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ঠাকুরের মনে 'ইহারা সব বড় বড় কথা বলে অথচ এমন সব হীন অনুষ্ঠান করে কেন ?'—এরূপ ভাবেরও যে উদয় হইয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অনেক সময় শুনিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে ইঁহাদের ভিতরে যাঁহারা যথার্থ সরল বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে দেখিয়া ঠাকুরের মত-পরিবর্ত্তনের কথাও আমরা তাঁহারই নিকট শুনিয়াছি। ঐ সকল সাধন-পথাবলম্বীদিগের উপর আমাদের বিদ্বেষবুদ্ধি দূর করিবার জন্য ঠাকুর তাঁহার ঐ বিষয়ক ধারণা আমাদের নিকট কখন কখন এইভাবে প্রকাশ করিতেন—"ওরে, দ্বেষবুদ্ধি করবি কেন ? জান্‌বি ওটাও একটা পথ, তবে অশুদ্ধ পথ। বাড়ীতে ঢোক্‌বার যেমন নানা দরজা থাকে—সদর ফটক থাকে, খিড়কির দরজা থাকে, আবার বাড়ীর ময়লা সাফ্ করবার জন্য, বাড়ীর ভেতর মেথর ঢোক্‌বারও একটা দরজা থাকে—এও জান্‌বি তেমনি একটা পথ। যে যেদিক দিয়েই ঢুকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌লে সকলে

একস্থানেই পৌঁছয়। তা বলে কি তোদের ঐরূপ করতে হবে? না—ওদের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে? তবে দ্বেষ করবি না।"

প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব-মন কি সহজে নিবৃত্তিপথে উপস্থিত হয়? সহজে কি সে শুদ্ধ সরলভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে অগ্রসর হয়? শুদ্ধতার ভিতরে সে কিছু কিছু অশুদ্ধতা স্বেচ্ছায় ধরিয়া রাখিতে চায়; কামকাঞ্চন-ত্যাগ করিয়াও উহার একটু আধটু গন্ধ প্রিয় বোধ করে; অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া শুদ্ধভাবে জগদম্বার পূজা করিতে হইবে একথা লিপিবদ্ধ করিবার পরেই তাঁহার সন্তোষার্থ বিপরীত কামভাবসূচক সঙ্গীত গাহিবার বিধান পূজাপদ্ধতির ভিতর ঢুকাইয়া রাখে! ইহাতে বিস্মিত হইবার বা নিন্দা করিবার কিছুই নাই। তবে ইহাই বুঝা যায় যে, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-নায়িকা মহামায়ার প্রবল প্রতাপে দুর্ব্বল মানব কামকাঞ্চনের কি বজ্র-বন্ধনেই আবদ্ধ রহিয়াছে! বুঝা যায় যে, তিনি এ বন্ধন কৃপা করিয়া না ঘুচাইলে জীবের মুক্তিলাভ একান্ত অসাধ্য। বুঝা যায় যে, তিনি কাহাকে কোন্ পথ দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। আর স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আপনার অন্তরের কথা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া ধরিয়া এ অদ্ভুত ঠাকুরের জীবন-রহস্য তুলনায় পাঠ করিতে বসিলে ইনি এক অপূর্ব্ব, অমানব, পুরুষোত্তম পুরুষ স্বেচ্ছায় লীলায় বা আমাদের প্রতি করুণায় আমাদের এ হীন সংসারে কিছু কালের জন্য—বহির্দৃষ্টে দীনের দীন ভাবে হইলেও জ্ঞানদৃষ্টে—রাজরাজেশ্বরের মত বাস করিয়া গিয়াছেন।

প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব কিরূপ ধর্ম্ম চায়

বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞাদিপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডে যোগের সহিত ভোগের মিলন ছিল; দেবতার উপাসনা করিয়াই রূপরসাদি সকল বিষয়ের নিয়মিত ভোগ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানব-মন যখন অনেকটা বাসনাবর্জ্জিত হইয়া আসিত তখনই সে উপনিষদোক্ত শুদ্ধা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইত। কিন্তু বৌদ্ধযুগে চেষ্টা হইল অন্য প্রকারের। অরণ্যবাসী বাসনাশূন্য সাধকদিগের শুদ্ধভাবের উপাসনা ভোগবাসনাপূর্ণ সংসারী মানবকে নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইল। তাৎকালিক রাজশাসনও বৌদ্ধ যতি-দিগের ঐ চেষ্টার সহায়তা করিতে লাগিল। ফলে দাঁড়াইল, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির—যাহা প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত মানবমনকে নিয়মিত ভোগাদি প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে যোগের নিবৃত্তিমার্গে উপনীত করিতেছিল—বাহিরে উচ্ছেদ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নীরব নিশীথে জনশূন্য বিভীষিকাপূর্ণ শ্মশানাদির চত্বরে অনুষ্ঠেয় তন্ত্রোক্ত গুপ্ত সাধনপ্রণালীরূপে প্রকাশ। তন্ত্রে প্রকাশ, মহাযোগী মহেশ্বর বৈদিক অনুষ্ঠানসকল নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে দেখিয়া উহাদিগকে পুনরায় সজীব করিয়া ভিন্নাকারে তন্ত্ররূপে প্রকাশিত করিলেন। এই প্রবাদে বাস্তবিকই মহা সত্য নিহিত রহিয়াছে। কারণ তন্ত্রে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ন্যায় যোগের সহিত ভোগের সম্মিলন ত লক্ষিত হইয়াই থাকে, তদ্ভিন্ন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডসমূহ যেমন উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডসমূহ হইতে সুদূরে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতেছিল, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানসকল তেমন

তন্ত্রোৎপত্তির ইতিহাস ও তন্ত্রের নূতনত্ব

ভাবে না থাকিয়া প্রতি ক্রিয়াটিই অদ্বৈত জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত রহিয়াছে—ইহাও পরিলক্ষিত হয়। দেখ না—তুমি কোনও দেবতার পূজা করিতে বসিলে অগ্রেই কুল-কুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থ সহস্রারে উঠাইয়া ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চিন্তা তোমায় করিতে হইবে; পরে পুনরায় তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া জীবভাব ধারণ করিলে এবং ঈশ্বর-জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার পূজ্য দেবতারূপে প্রকাশিত হইলেন এবং তুমি তাঁহাকে তোমার ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে বসিলে—ইহাই চিন্তা করিতে হইবে। মানবজীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য—প্রেমে ঈশ্বরের সহিত একাকার হইয়া যাইবার কি সুন্দর চেষ্টাই না ঐ ক্রিয়ায় লক্ষিত হইয়া থাকে! অবশ্য সহস্রের ভিতর হয়ত একজন উন্নত উপাসক ঐ ক্রিয়াটি ঠিক ঠিক করিতে পারেন, কিন্তু সকলেই ঐরূপ করিবার অল্পবিস্তর চেষ্টাও ত করে, তাহাতেই যে বিশেষ লাভ। কারণ ঐরূপ করিতে করিতেই যে তাহারা ধীরে ধীরে উন্নত হইবে। তন্ত্রের প্রতি ক্রিয়ার সহিতই এইরূপে অদ্বৈত জ্ঞানের ভাব সম্মিলিত থাকিয়া সাধককে চরম লক্ষ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাই তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালীর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হইতে নূতনত্ব এবং এইজন্যই তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালীর ভারতের জনসাধারণের মনে এতদূর প্রভুত্ব-বিস্তার।

তন্ত্রের আর এক নূতনত্ব—জগৎকারণ মহামায়ার মাতৃত্বভাবের প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তির উপর একটা শুদ্ধ পবিত্র ভাব আনয়ন। বেদ পুরাণ ঘাঁটিয়া দেখ, এ ভাবটি

আর কোথাও নাই। উহা তন্ত্রের একেবারে নিজস্ব। বেদের সংহিতাভাগে স্ত্রী-শরীরের উপাসনার একটু আধটু বীজ মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, বিবাহকালে কন্যার ইন্দ্রিয়কে 'প্রজাপতের্দ্বিতীয়ং মুখং' বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি করিবার দ্বিতীয় মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া উহা যাহাতে সুন্দর তেজস্বী গর্ভ ধারণ করে এজন্য 'গর্ভং ধেহি সিনীবালি' ইত্যাদি মন্ত্রে উহাতে দেবতাসকলের উপাসনার এবং ঐ ইন্দ্রিয়কে পবিত্রভাবে দেখিবার বিশেষ বিধান আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন, বৈদিক সময় হইতেই যোনিলিঙ্গের উপাসনা ভারতে প্রচলিত ছিল। বাবিল-নিবাসী সুমের জাতি এবং তচ্ছাখা দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই স্থূলভাবে ঐ উপাসনা যে প্রথম প্রচলিত ছিল, ইতিহাস তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। ভারতীয় তন্ত্র বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ভাব যেমন আপন শরীরে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল, তেমনি আবার অধিকারী বিশেষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঐ উপাসনার ভিতর দিয়াই সহজে হইবে দেখিয়া দ্রাবিড় জাতির ভিতরে নিবদ্ধ স্ত্রীশরীরের উপাসনাটির স্থূলভাব অনেকটা উল্টাইয়া দিয়া উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত বৈদিক যুগের উপাসনার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবটি সম্মিলিত করিয়া পূর্ণ বিকশিত করিল এবং ঐরূপে উহাও নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লইল। তন্ত্রে বীরাচারের উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তন্ত্রকার কুলাচার্য্যগণ ঠিকই বুঝিয়াছিলেন—প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব স্থূল রূপরসাদির অল্পবিস্তর ভোগ করিবে, কিন্তু যদি কোনরূপে তাঁহার

তন্ত্রে বীরাচারের প্রবেশেতিহাস

প্রিয় ভোগ্যবস্তুর উপর ঠিক ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধার উদয় করিয়া দিতে পারেন, তবে সে কত ভোগ করিবে করুক না ; ঐ তীব্র শ্রদ্ধাবলে স্বল্পকালেই সংযমাদি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইবে নিশ্চয়। সে জন্যই তাঁহারা প্রচার করিলেন—'নারীশরীর পবিত্র তীর্থস্বরূপ, নারীতে মনুষ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেবী-বুদ্ধি সর্ব্বদা রাখিবে এবং জগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ ভাবনা করিয়া সর্ব্বদা স্ত্রীমূর্ত্তিতে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে ; নারীর পাদোদক ভক্তিপরায়ণ হইয়া পান করিবে এবং ভ্রমেও কখনও নারীর নিন্দা বা নারীকে প্রহার করিবে না।' যথা—

যস্যাঃ অঙ্গে মহেশানি সর্ব্বতীর্থানি সন্তি বৈ।

—পুরশ্চরণোল্লাসতন্ত্র, ১৪ পটল

শক্তৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু যঃ করোতি বরাননে।
ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্বিপরীতং ফলং লভেৎ ॥

—উত্তরতন্ত্র, ২য় পটল

শক্ত্যাঃ পাদোদকং যস্তু পিবেদ্ভক্তিপরায়ণঃ।
উচ্ছিষ্টং বাপি ভুঞ্জীত তস্য সিদ্ধিরখণ্ডিতা ॥

—নিগমকল্পদ্রুম

স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্।
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যস্তাসু নিন্দাং প্রহারকম্ ॥

—মুণ্ডমালাতন্ত্র, ৫ম পটল

কিন্তু হইলে কি হইবে? কালে তান্ত্রিক সাধকদিগের ভিতরেও এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যখন ঈশ্বরীয় জ্ঞানলাভ ছাড়িয়া তাঁহারা সামান্য সামান্য মানসিক শক্তি বা সিদ্ধাইসকল-লাভেই

মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই নানাপ্রকার অস্বাভাবিক সাধনপ্রণালী ও ভূতপ্রেতাদির উপাসনা তন্ত্রশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে বর্ত্তমান আকার ধারণ করাইয়াছিল। প্রতি তন্ত্রের ভিতরেই সেজন্য উত্তম ও অধম, উচ্চ ও হীন এই দুই স্তরের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উচ্চাঙ্গের ঈশ্বরোপাসনার সহিত হীনাঙ্গের সাধনসকলও সন্নিবেশিত দেখা যায়। আর যাহার যেমন প্রকৃতি সে এখন উহার ভিতর হইতে সেই মতটি বাছিয়া লয়।

প্রত্যেক তন্ত্রে উত্তম ও অধম দুই বিভাগ আছে

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রাদুর্ভাবে আবার একটি নূতন পরিবর্ত্তন তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি ও তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাধারণে দ্বৈতভাবের বিস্তারেই মঙ্গল ধারণা করিয়া তান্ত্রিকসাধন-প্রণালীর ভিতর হইতে অদ্বৈতভাবের ক্রিয়াগুলি অনেকাংশে বাদ দিয়া কেবল তন্ত্রোক্ত মন্ত্রশাস্ত্র ও বাহ্যিক উপাদানটি জনসাধারণে প্রচলিত করিলেন। ঐ উপাসনা ও পূজাদিতেও তাঁহারা নবীন ভাব প্রকাশ করাইয়া আত্মবৎ দেবতার সেবা করিবার উপদেশ দিলেন। তান্ত্রিক দেবতাকুল নিবেদিত ফলমূল আহার্য্যাদি দৃষ্টিমাত্রেই সাধকের নিমিত্ত পূত করিয়া দেন এবং উহার গ্রহণে সাধকের কামক্রোধাদি পশুভাবের বৃদ্ধি না হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে—ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নব-প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে দেবতাগণ ঐ সকল আহার্য্যের সূক্ষ্মাংশ এবং সাধকের ভক্তির আতিশয্য ও আগ্রহনিবন্ধে কখন কখন স্থূলাংশও

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত নূতন পূজা-প্রণালী

গ্রহণ করিয়া থাকেন—এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত হইল। উপাসনা-প্রণালীতে এইরূপে আরও অনেক পরিবর্ত্তন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সংসাধিত হয়, তন্মধ্যে প্রধান এইটিই বলিয়া বোধ হয় যে তাঁহারা যতদূর সম্ভব তন্ত্রোক্ত পশুভাবেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বাহ্যিক শৌচাচারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং আহারে শৌচ, বিহারে শৌচ, সকল বিষয়ে শুচিশুদ্ধ থাকিয়া 'জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্নসংশয়ঃ'—নামই ব্রহ্ম—এইজ্ঞানে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের নাম-জপ দ্বারাই জীব সিদ্ধকাম হইবে, এই মত সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন।

ঐ প্রণালী হইতে কালে কর্ত্তাভজাদি মতের উৎপত্তি ও সে-সকলের সার কথা

কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ করিলে কি হইবে? তাঁহাদের তিরোভাবের স্বল্পকাল পরেই প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবমন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধমার্গেও কলুষিত ভাবসকল প্রবেশ করাইয়া ফেলিল। সূক্ষ্ম ভাবটুকু ছাড়িয়া স্থূল বিষয় গ্রহণ করিয়া বসিল—পরকীয়া নায়িকার উপপতির প্রতি আন্তরিক টানটুকু গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরে উহার আরোপ না করিয়া পরকীয়া স্ত্রী-ই গ্রহণ করিয়া বসিল এবং এইরূপে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধযোগ-মার্গের ভিতরেও কিছু কিছু ভোগ প্রবেশ করাইয়া উহাকে কতকটা নিজের প্রবৃত্তির মত করিয়া লইল! ঐরূপ না করিয়াই বা সে করে কি? সে যে অত শুদ্ধভাবে চলিতে অক্ষম। সে যে যোগ ও ভোগের মিশ্রিত ভাবই গ্রহণ করিতে পারে। সে যে ধর্ম্মলাভ চায় কিন্তু তৎসঙ্গে একটু আধটু রূপরসাদি-ভোগের লালসা রাখে। সেইজন্যই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভিতর কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই

প্রভৃতি মতের উপাসনা ও গুপ্ত সাধনপ্রণালীসকলের উৎপত্তি। অতএব ঐ সকলের মূলে দেখিতে পাওয়া যায় সেই বহুপ্রাচীন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রবাহ, সেই যোগ ও ভোগের সম্মিলন; আর দেখিতে পাওয়া যায় সেই তান্ত্রিক কুলাচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত-জ্ঞানের সহিত প্রতি ক্রিয়ার সম্মিলনের কিছু কিছু ভাব।

কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, মুক্তি, সংযম, ত্যাগ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটি কথার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঠাকুর ঐ সকল সম্প্রদায়ের কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় এগুলি আমাদের বলিতেন। সরল ভাষায় ও ছন্দোছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়া উহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের ঐ সকল বিষয় বুঝিবার কতদূর সহায়তা করে, তাহা পাঠক ঐ সকল শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকে ঈশ্বরকে 'আলেক্‌লতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত 'অলক্ষ্য' কথাটি হইতেই 'আলেক্' কথাটির উৎপত্তি। ঐ 'আলেক্' শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনে প্রবিষ্ট বা তদবলম্বনে প্রকাশিত হইয়া 'কর্ত্তা' বা 'গুরু'-রূপে আবির্ভূত হন। ঐরূপ মানবকে ইঁহারা 'সহজ' উপাধি দিয়া থাকেন। যথার্থ গুরুভাবে ভাবিত মানবই এ সম্প্রদায়ের উপাস্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় উহার নাম 'কর্ত্তাভজা' হইয়াছে। 'আলেক্‌লতার' স্বরূপ ও বিশুদ্ধ মানবে আবেশ সম্বন্ধে ইঁহারা এইরূপ বলেন—

কর্ত্তাভজাদি মতে সাধ্য ও সাধনবিধি সম্বন্ধে উপদেশ

আলেকে আসে, আলেকে যায়,
আলেকের দেখা কেউ না পায়।

আলেক্‌কে চিনিছে যেই,
তিন লোকের ঠাকুর সেই।

'সহজ' মানুষের লক্ষণ—তিনি 'অটুট' হইয়া থাকেন অর্থাৎ রমণীর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলেও তাঁহার কখনও কামভাবে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না।

এই সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন—

রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।

সংসারে কামকাঞ্চনের ভিতর অনাসক্তভাবে না থাকিলে সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সেজন্য সাধকদিগের প্রতি উপদেশ—

রাঁধুনী হইবি, ব্যঞ্জন বাঁটিবি, হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়,
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, সাপ না গিলিবে তায়।
অমিয়-সাগরে সিনান করিবি, কেশ না ভিজিবে তায়॥

তন্ত্রের ভিতর সাধকদিগকে যেমন পশু, বীর ও দিব্যভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা আছে, ইঁহাদের ভিতরেও তেমনি সাধকের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথা আছে—

আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই
সাঁইয়ের পর আর নাই।

অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে তবে মানব 'সাঁই' হইয়া থাকে।

ঠাকুর বলিতেন, "ইঁহারা সকলে ঈশ্বরের 'অরূপ রূপের' ভজন করেন" এবং ঐ সম্প্রদায়ের কয়েকটি গানও আমাদের নিকট অনেক সময় গাইতেন। যথা—

বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীর কথা

বাউলের সুর

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেমরত্নধন॥
(ওরে) খোঁজ্‌ খোঁজ্‌ খোঁজ্‌ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
(আবার) দীপ্‌ দীপ্‌ দীপ্‌ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গি চালায় আবার সে কোন জন?
কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

এইরূপে গুরুর উপাসনা ও সকলে একত্রিত হইয়া ভজনাদিতে নিবিষ্ট থাকা—ইহাই তাঁহাদের প্রধান সাধন। ইঁহারা দেবদেবীর মূর্ত্ত্যাদির অস্বীকার না করিলেও উপাসনা বড় একটা করেন না। ভারতে গুরু বা আচার্য্যের উপাসনা অতীব প্রাচীন, উপনিষদের কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ উপনিষদেই রহিয়াছে "আচার্য্যদেবো ভব"। তখন দেবদেবীর উপাসনা আদৌ প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। সেই আচার্য্যোপাসনা কালে ভারতে কতরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এতদ্ভিন্ন শুচি-অশুচি, ভাল-মন্দ প্রভৃতি ভেদজ্ঞান মন হইতে ত্যাগ করিবার জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠানও সাধককে করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, সে-সকল, সাধকেরা গুরুপরম্পরায় অবগত হইয়া থাকেন। ঠাকুর তাহারও কিছু কিছু কখন কখন উল্লেখ করিতেন।

ঠাকুরকে অনেক সময় বলিতে শুনা যাইত, 'বেদ পুরাণ কানে শুনতে হয়; আর তন্ত্রের সাধনসকল কাজে করতে হয়, হাতে

হ্যাতে করতে হয়।' দেখিতেও পাওয়া যায়, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই স্মৃতির অনুগামী সকলে কোন না কোনরূপ তান্ত্রিকী সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় ন্যায়-বেদান্তের পণ্ডিতসকল অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক। বৈষ্ণবসম্প্রদায়সকলের ভিতরেও সেইরূপ অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ কর্ত্তাভজাদি সম্প্রদায়সকলের গুপ্ত সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিতেছেন। পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও এই দলভুক্ত ছিলেন। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে কাছিবাগানে ঐ সম্প্রদায়ের আখড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ঐ স্থলে থাকিয়া তাঁহার উপদেশমত সাধনাদিতে রত থাকিতেন। ঠাকুরকে বৈষ্ণবচরণ এখানে কয়েকবার লইয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এখানকার কতকগুলি স্ত্রীলোক ঠাকুরকে সদাসর্ব্বক্ষণ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিতে দেখিয়া এবং ভগবৎ-প্রেমে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবাদি হইতে দেখিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হইয়াছেন কি না জানিবার জন্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'অটুট সহজ' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য বালকস্বভাব ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে ও অনুরোধে তথায় সরলভাবেই বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উহারা যে তাঁহাকে ঐরূপে পরীক্ষা করিবে, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না। যাহাই হউক, তদবধি তিনি আর ঐ স্থানে গমন করেন নাই।

বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে কাছিবাগানের আখড়ায় লইয়া যাইয়া পরীক্ষা

বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীর কথা

ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্রবল, পবিত্রতা ও ভাবসমাধি দেখিয়া তাঁহার উপর বৈষ্ণবচরণের ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল যে, পরিশেষে তিনি ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান

বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের নিকট কিছুদিন যাতায়াত করিতে না করিতেই ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী পণ্ডিত একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তিনি পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে লইয়া একটি মজার ঘটনা ঘটে। ঠাকুরের নিকটেই আমরা উহা শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, গৌরীর একটি সিদ্ধাই বা তপস্যালব্ধ ক্ষমতা ছিল। শাস্ত্রীয় তর্ক-বিচারে আহূত হইয়া যেখানে তিনি যাইতেন সেই বাটীতে প্রবেশকালে এবং যেখানে বিচার হইবে সেই সভাস্থলে প্রবেশ-কালে তিনি উচ্চরবে কয়েকবার 'হা রে রে রে, নিরালম্বো লম্বোদর-জননী কং যামি শরণম্'—এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া তবে সে বাটীতে ও সভাস্থলে প্রবেশ করিতেন; ঠাকুর বলিতেন, জলদগম্ভীরস্বরে বীরভাবদ্যোতক 'হা রে রে রে' শব্দ এবং আচার্য্যকৃত দেবীস্তোত্রের ঐ এক পাদ তাঁহার মুখ হইতে শুনিলে সকলের হৃদয় কি একটা অব্যক্ত ত্রাসে চমকিত হইয়া উঠিত। উহাতে দুইটি কার্য্য সিদ্ধ হইত। প্রথম, ঐ শব্দে গৌরীর ভিতরের শক্তি সম্যক্ জাগরিতা হইয়া উঠিত এবং দ্বিতীয়, তিনি উহার দ্বারা শত্রুপক্ষকে চমকিত ও মুগ্ধ করিয়া তাহাদের বলহরণ

তান্ত্রিক গৌরী পণ্ডিতের সিদ্ধাই

করিতেন। ঐরূপ শব্দ করিয়া এবং কুস্তিগীর পাহালোয়ানেরা যেরূপে বাহুতে তাল ঠোকে সেইরূপ তাল ঠুকিতে ঠুকিতে গৌরী সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন ও বাদসাহী দরবারে সভ্যেরা যে ভাবে উপবেশন করিত, পদদ্বয় মুড়িয়া তাহার উপর সেইভাবে সভাস্থলে বসিয়া তিনি তর্কসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তখন গৌরীকে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত না।

গৌরীর ঐ সিদ্ধাইয়ের কথা ঠাকুর জানিতেন না। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পদার্পণ করিয়া যেমন গৌরী উচ্চরবে 'হা রে রে রে' শব্দ করিলেন, অমনি ঠাকুরের ভিতরে কে যেন ঠেলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গৌরীর অপেক্ষা উচ্চরবে ঐ শব্দ করাইতে লাগিল। ঠাকুরের মুখনিঃসৃত ঐ শব্দে গৌরী উচ্চতর রবে ঐ শব্দ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাহাতে উত্তেজিত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর উচ্চরবে 'হা রে রে রে' করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেন, বারংবার সেই দুই পক্ষের 'হা রে রে রে' রবে যেন ডাকাত-পড়ার মত এক ভীষণ আওয়াজ উঠিল। কালীবাটীর দারোয়ানেরা যে যেখানে ছিল, শশব্যস্তে লাঠি-সোটা লইয়া তদভিমুখে ছুটিল! অন্য সকলে ভয়ে অস্থির। যাহা হউক, গৌরী এক্ষেত্রে ঠাকুরের অপেক্ষা উচ্চতর রবে আর ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া শান্ত হইলেন এবং একটু যেন বিষণ্ণভাবে ধীরে ধীরে কালী-বাটীতে প্রবেশ করিলেন। অপর সকলেও ঠাকুর এবং নবাগত পণ্ডিতজীই ঐরূপ করিতেছিলেন জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, "তারপর মা

জানিয়ে দিলেন, গৌরী যে শক্তি বা সিদ্ধাইয়ে লোকের বলহরণ করে' নিজে অজেয় থাকত, সেই শক্তির এখানে ঐরূপে পরাজয় হওয়াতে তার ঐ সিদ্ধাই থাকল না! মা তার কল্যাণের জন্য তার শক্তিটা (নিজেকে দেখাইয়া) এর ভিতর টেনে নিলেন।" বাস্তবিকও দেখা গিয়াছিল, গৌরী দিন দিন ঠাকুরের ভাবে মোহিত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৌরী পণ্ডিত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, গৌরী প্রতি বৎসর ৺দুর্গাপূজার সময় জগদম্বার পূজার যথাযথ সমস্ত আয়োজন করিতেন এবং বসনালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া আল্‌পনাদেওয়া পীঠে বসাইয়া নিজের গৃহিণীকে শ্রীশ্রীজগদম্বাজ্ঞানে তিন দিন ভক্তিভাবে পূজা করিতেন! তন্ত্রের শিক্ষা—যত স্ত্রী-মূর্ত্তি, সকলই সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্ত্তি—সকলের মধ্যেই জগন্মাতার জগৎপালিনী ও আনন্দদায়িনী শক্তির বিশেষ প্রকাশ। সেইজন্য স্ত্রী-মূর্ত্তিমাত্রকেই মানবের পবিত্রভাবে পূজা করা উচিত। স্ত্রী-মূর্ত্তির অন্তরালে শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ং রহিয়াছেন, একথা স্মরণ না রাখিয়া ভোগ্যবস্তুমাত্র বলিয়া সকামভাবে স্ত্রী-শরীর দেখিলে উহাতে শ্রীশ্রীজগন্মাতারই অবমাননা করা হয় এবং উহাতে মানবের অশেষ অকল্যাণ আসিয়া উপস্থিত হয়। চণ্ডীতে দেবতাগণ দেবীকে স্তব করিতে করিতে ঐ কথা বলিতেছেন—

গৌরীর আপন পত্নীকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥

হে দেবি! তুমিই জ্ঞানরূপিণী; জগতে উচ্চাবচ যত প্রকার বিদ্যা আছে—যাহা হইতে লোকের অশেষ প্রকার জ্ঞানের উদয় হইতেছে—সে সকল তুমিই, তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা। তুমিই স্বয়ং জগতের যাবতীয় স্ত্রী-মূর্ত্তিরূপে বিদ্যমান। তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীতা—স্তব করিয়া তোমার অনন্ত গুণের উল্লেখ করিতে কে কবে পারিয়াছে বা পারিবে।

ভারতের সর্ব্বত্র আমরা নিত্যই ঐ স্তব অনেকে পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু হায়! কয়জন কতক্ষণ দেবীবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীর অবলোকন করিয়া ঐরূপ যথাযথ সম্মান দিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে উদ্যম করিয়া থাকি? শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ-প্রকাশের আধার-স্বরূপিণী স্ত্রী-মূর্ত্তিকে হীন বুদ্ধিতে কলুষিত নয়নে দেখিয়া কে না দিনের ভিতর শতবার সহস্রবার তাঁহার অবমাননা করিয়া থাকে? হায় ভারত, ঐরূপ পশুবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীরের অবমাননা করিয়াই এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে ভুলিয়াই তোমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। কবে জগদম্বা আবার কৃপা করিয়া তোমার এ পশুবুদ্ধি দূর করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

গৌরী পণ্ডিতের আর একটি অদ্ভুত শক্তির কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকেরা জগন্মাতার নিত্যপূজান্তে হোম করিয়া থাকেন। গৌরীও সকল দিন না হউক, অনেক সময় হোম করিতেন। কিন্তু তাহার

হোমের প্রণালী অতি অদ্ভুত ছিল। অপর সাধারণে যেমন জমির উপর মৃত্তিকা বা বালুকা দ্বারা বেদি রচনা করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ সাজাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করেন এবং আহুতি দিয়া থাকেন, তিনি সেরূপ করিতেন না। তিনি স্বীয় বামহস্ত শূন্যে প্রসারিত করিয়া হস্তের উপরেই এককালে একমণ কাঠ সাজাইতেন এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ অগ্নিতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেন। হোম করিতে কিছু অল্প সময় লাগে না, ততক্ষণ হস্ত শূন্যে প্রসারিত রাখিয়া ঐ একমণ কাষ্ঠের গুরুভার ধারণ করিয়া থাকা এবং তদুপরি হস্তে অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়া মন স্থির রাখা ও যথাযথভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আহুতি প্রদান করা—আমাদের নিকটে একেবারে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়, সেজন্য আমাদের অনেকে ঠাকুরের মুখে শুনিয়াও ঐ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেন, "আমি নিজের চক্ষে তাকে ঐরূপ করতে দেখেছি রে! ওটাও তার একটা সিদ্ধাই ছিল।"

গৌরীর অদ্ভুত হোমপ্রণালী

গৌরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কয়েকদিন পরেই মথুর বাবু বৈষ্ণবচরণপ্রমুখ কয়েকজন সাধক পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া একটি সভার অধিবেশন করিলেন। উদ্দেশ্য, পূর্ব্বের ন্যায় ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণপ্রয়োগে নবাগত পণ্ডিতজীর সহিত আলোচনা ও নির্দ্ধারণ করা। প্রাতেই সভা আহূত হয়। স্থান শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দিরের

বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে সভা। ভাবাবেশে ঠাকুরের বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধারোহণ ও তাঁহার স্তব

সম্মুখে নাটমন্দিরে। বৈষ্ণবচরণের কলিকাতা হইতে আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর গৌরীকে সঙ্গে করিয়া অগ্রেই সভাস্থলে চলিলেন এবং সভাপ্রবেশের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্মাতা কালিকার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও শ্রীচরণবন্দনাদি করিয়া ভাবে টলমল করিতে করিতে যেমন মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে বৈষ্ণবচরণ তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইতেছেন। দেখিয়াই ঠাকুর ভাবে প্রেমে সমাধিস্থ হইয়া বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধদেশে বসিয়া পড়িলেন এবং বৈষ্ণবচরণও উহাতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া তদ্দণ্ডেই রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ঠাকুরের স্তব করিতে লাগিলেন! ঠাকুরের সেই সমাধিস্থ প্রসন্নোজ্জ্বল মূর্ত্তি এবং বৈষ্ণবচরণের তদ্রূপে আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সুললিত স্তবপাঠ দেখিয়া শুনিয়া মথুরপ্রমুখ উপস্থিত সকলে স্থিরনেত্রে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল, তখন ধীরে ধীরে সকলে তাঁহার সহিত সভাস্থলে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এইবার সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু গৌরী প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন—(ঠাকুরকে দেখাইয়া) "উনি যখন পণ্ডিতজীকে এরূপ কৃপা করিলেন, তখন আজ আর আমি উঁহার (বৈষ্ণবচরণের) সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইব না; হইলেও আমাকে নিশ্চয় পরাজিত হইতে হইবে, কারণ উনি (বৈষ্ণবচরণ) আজ দৈববলে বলীয়ান। বিশেষতঃ উনি (বৈষ্ণবচরণ) ত দেখিতেছি আমারই মতের লোক—

ঠাকুরের সম্বন্ধে উহারও যাহা ধারণা, আমারও তাহাই ; অতএব এস্থলে তর্ক নিষ্প্রয়োজন।” অতঃপর শাস্ত্রীয় অন্যান্য কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ কাটাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

গৌরী যে বৈষ্ণবচরণের পাণ্ডিত্যে ভয় পাইয়া তাঁহার সহিত অদ্য তর্কযুদ্ধে নিরস্ত হইলেন, তাহা নহে। ঠাকুরের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য লক্ষণাদি দেখিয়া এই অল্পদিনেই তিনি তপস্যা-প্রসূত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসহায়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন—ইনি সামান্য নহেন, ইনি মহাপুরুষ! কারণ ইহার কিছুদিন পরেই ঠাকুর একদিন গৌরীর মন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—“আচ্ছা, বৈষ্ণবচরণ (নিজের শরীর দেখাইয়া) একে অবতার বলে ; এটা কি হতে পারে? তোমার কি বোধ হয় বল দেখি?”

গৌরী তাহাতে গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—“বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে ত ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোককল্যাণ-সাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য্য সাধন করেন, আপনি তিনিই!”

ঠাকুরের সম্বন্ধে গৌরীর ধারণা

ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“ও বাবা! তুমি যে আবার তাকেও (বৈষ্ণবচরণকেও) ছাড়িয়ে যাও! কেন বল দেখি? আমাতে কি দেখেছ, বল দেখি?” গৌরী বলিলেন, “শাস্ত্রপ্রমাণে এবং নিজের প্রাণের অনুভব হইতেই বলিতেছি। এ বিষয়ে যদি কেহ বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বনে আমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি আমার ধারণা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি।”

ঠাকুর বালকের ন্যায় বলিলেন, "তোমরা সব এত কথা বল, কিন্তু কে জানে বাবু, আমি ত কিছু জানি না!"

গৌরী বলিলেন, "ঠিক কথা। শাস্ত্র ঐ কথা বলেন—আপনিও আপনাকে জানেন না। অতএব অন্যে আর কি করে আপনাকে জানবে বলুন? যদি কাহাকেও কৃপা করে জানান তবেই সে জানতে পারে।"

পণ্ডিতজীর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। দিন দিন গৌরী ঠাকুরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

ঠাকুরের সংসর্গে গৌরীর বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগ করিয়া তপস্যায় গমন

তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনের ফল এতদিনে ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া সংসারে তীব্র বৈরাগ্যরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। দিন দিন তাঁহার মন পাণ্ডিত্য, লোক-মান্য, সিদ্ধাই প্রভৃতি সকল বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে গুটাইয়া আসিতে লাগিল। এখন আর গৌরীর সে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নাই, সে দাম্ভিকতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সে তর্কপ্রিয়তা এককালে নীরব হইয়াছে। তিনি এখন বুঝিয়াছেন, ঈশ্বরপাদপদ্ম-লাভের একান্ত চেষ্টা না করিয়া এতদিন বৃথা কাল কাটাইয়াছেন—আর ওরূপে কালক্ষেপ উচিত নহে। তাঁহার মনে এখন সঙ্কল্প স্থির—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিয়া দিন কয়টা কাটাইয়া দিবেন; এইরূপে যদি তাঁর কৃপা ও দর্শনলাভ করিতে পারেন!

এইরূপে ঠাকুরের সঙ্গসুখে ও ঈশ্বরচিন্তায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেক দিন বাটী হইতে অন্তরে আছেন বলিয়া ফিরিবার জন্য পণ্ডিতজীর স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গ বারংবার পত্র লিখিতে লাগিল। কারণ তাহারা লোকমুখে আভাস পাইতেছিল, দক্ষিণেশ্বরের কোন এক উন্মত্ত সাধুর সহিত মিলিত হইয়া পণ্ডিতজীর মনের অবস্থা কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছে।

পাছে তাহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে টানাটানি করিয়া সংসারে পুনরায় লিপ্ত করে, তাহাদের চিঠির আভাসে পণ্ডিতজীর মনে ঐ ভাবনাও ক্রমশঃ প্রবেশ হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গৌরী উপায় উদ্ভাবন করিলেন এবং শুভ মুহূর্ত্তের উদয় জানিয়া ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণাম করিয়া সজলনয়নে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "সে কি গৌরী, সহসা বিদায় কেন ? কোথায় যাবে ?"

গৌরী করযোড়ে উত্তর করিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরবস্তু লাভ না করিয়া আর সংসারে ফিরিব না।" তদবধি সংসারে আর কখনও কেহ বহু অনুসন্ধানেও গৌরী পণ্ডিতের দেখা পাইলেন না।

এইরূপে ঠাকুর বৈষ্ণবচরণ এবং গৌরীর জীবনের নানা কথা আমাদিগের নিকট অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। আবার কখন বা কোন বিষয়ের কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ে কি মতামত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলেন, সে বিষয়েরও উল্লেখ করিতেন। আমাদের মনে

বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীর কথা উল্লেখ করিয়া

ঠাকুরের উপদেশ—নরলীলায় বিশ্বাস

আছে, একদিন জনৈক ভক্ত সাধককে উপদেশ দিতে দিতে ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, "মানুষে ইষ্টবুদ্ধি ঠিক ঠিক হলে তবে ভগবানলাভ হয়। বৈষ্ণবচরণ বোল্‌তো—নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হয়।"

কখন বা কোন ভক্তের 'কালী' ও 'কৃষ্ণে' বিশেষ ভেদবুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে বলিতেন, "ও কি হীন বুদ্ধি তোর? জানবি যে তোর ইষ্টই কালী, কৃষ্ণ, গৌর, সব হয়েছেন। তা বলে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বলছি, তা নয়। তবে দ্বেষবুদ্ধিটা ত্যাগ কর্‌বি। তোর ইষ্টই কৃষ্ণ হয়েছেন, গৌর হয়েছেন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখবি। দেখ না, গেরস্তের বৌ শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেওর, ভাসুর সকলকে যথাযোগ্য মান্য ভক্তি ও সেবা করে—কিন্তু মনের সকল কথা খুলে বলা আর শোয়া কেবল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে যে, স্বামীর জন্যই শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি তার আপনার। সেই রকম নিজের ইষ্টকে ঐ স্বামীর মতন জানবি। আর তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হতেই তাঁর অন্য সকল রূপের সহিত সম্বন্ধ, তাঁদের সব শ্রদ্ধা ভক্তি করা—এইটে জানবি। ঐরূপ জেনে দ্বেষবুদ্ধিটা তাড়িয়ে দিবি। গৌরী বোল্‌তো—'কালী আর গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে বুঝবো যে ঠিক জ্ঞান হল।'"

কালী ও কৃষ্ণে অভেদ-বুদ্ধি সম্বন্ধে গৌরী

আবার কখন বা ঠাকুর কোন ভক্তের মন সংসারে কাহারও প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় স্থির হইতেছে না দেখিয়া তাহাকে

তাহার ভালবাসার পাত্রকেই ভগবানের মূর্ত্তিজ্ঞানে সেবা করিতে ও ভালবাসিতে বলিতেন। লীলাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, কেমন করিয়া ঠাকুর জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের মন তাঁহার অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অত্যন্ত আসক্ত দেখিয়া তাঁহাকে ঐ বালককেই গোপাল বা বালকৃষ্ণ জ্ঞানে সেবা করিতে ও ভালবাসিতে বলিতেছেন এবং ঐরূপ অনুষ্ঠানের ফলে ঐ স্ত্রী-ভক্তের স্বল্পকালেই ভাবসমাধি-উদয়ের কথারও উল্লেখ করিয়াছি।[১] ভালবাসার পাত্রকে ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করার কথা বলিতে বলিতে কখন কখন ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের ঐ বিষয়ক মতের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "বৈষ্ণবচরণ বোল্‌তো, যে যাকে ভালবাসে তাকে ইষ্ট বলে জানলে ভগবানে শীঘ্র মন যায়।" বলিয়াই আবার বুঝাইয়া দিতেন, "সে ঐ কথা তাদের সম্প্রদায়ের মেয়েদের করতে বোল্‌তো; তজ্জন্য দূষ্য হত না—তাদের সব পরকীয়া নায়িকার ভাব কি না? পরকীয়া নায়িকার উপপতির ওপর যেমন মনের টান, সেই টানটা ঈশ্বরে আরোপ করতেই তারা চাইত।" ওটা কিন্তু সাধারণের শিক্ষা দিবার যে কথা নহে, তাহাও ঠাকুর বলিতেন। বলিতেন, তাতে ব্যভিচার বাড়বে। তবে নিজের পতি পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয়কে ঈশ্বরের মূর্ত্তি-জ্ঞানে সেবা করিতে, ভালবাসিতে ঠাকুরের অমত ছিল না এবং তাঁহার পদাশ্রিত অনেক ভক্তকে যে তিনি ঐরূপ করিতে শিক্ষাও দিতেন, তাহা আমাদের জানা আছে।

ভালবাসার পাত্রকে ভগবানের মূর্ত্তি বলিয়া ভাবা সম্বন্ধে বৈষ্ণবচরণ

১ পূর্ব্বার্দ্ধ, প্রথম অধ্যায়।

ভাবিয়া দেখিলে বাস্তবিক উহা যে অশাস্ত্রীয় নবীন মত নহে, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। উপনিষৎকার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রিয়ী-সংবাদে[১] শিক্ষা দিতেছেন—পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয়; স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই পবিত্র মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রাহ্মণের ভিতর, ক্ষত্রিয়ের ভিতর, ধনের ভিতর; পৃথিবীর যে সমস্ত বস্তু অন্তরের প্রিয়বুদ্ধির উদয় করিয়া মানব-মন আকর্ষণ করে সে সমস্তের ভিতরেই প্রিয়-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ঐশ্বরিক অংশের বিদ্যমানতা দেখিয়া ভাল-বাসিবার উপদেশ ভারতের উপনিষৎকার ঋষিগণ বহু প্রাচীন যুগ হইতেই আমাদের শিক্ষা দিতেছেন। দেবর্ষি নারদাদি ভক্তি-সূত্রের আচার্য্যগণও জীবকে ঈশ্বরের দিকে কামক্রোধাদি রিপু-সকলের বেগ ফিরাইয়া দিতে বলিয়া এবং সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসাদি আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবার উপদেশ করিয়া উপনিষৎকার ঋষিদিগেরই যে পদানুসরণ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব ঠাকুরের ঐ বিষয়ক মত যে শাস্ত্রানুগত, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রসকলের মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষা করিয়া তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিধানের অবিরোধী কোন নূতন পথের সংবাদই যে ধর্ম্মজগতে আনিয়া দেন, একথা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। যে-কোন অবতারপুরুষের জীবনালোচনা করিলেই উহা

ঐ উপদেশ শাস্ত্রসম্মত—উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রিয়ী-সংবাদ

[১] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—৫ম ব্রাহ্মণ।

বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও যে ঐ বিষয়ের অক্ষুণ্ণ পরিচয় আমরা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পাইয়াছি, একথাই আমরা পাঠককে 'লীলাপ্রসঙ্গে' বুঝাইতে প্রয়াসী। যদি না পারি, তবে পাঠক যেন বুঝেন উহা আমাদের একদেশী বুদ্ধির দোষেই হইতেছে—যে ঠাকুর 'যত মত তত পথ'-রূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্য আধ্যাত্মিক জগতে প্রথম প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার ত্রুটি বা দোষে নহে।

অবতার পুরুষেরা সর্ব্বদা শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করেন। সকল ধর্ম্মমতকে সম্মান করা সম্বন্ধে ঠাকুরের শিক্ষা

পাশ্চাত্য নীতি—যাহার প্রয়োগ সুচতুর দুনিয়াদার পাশ্চাত্য কেবল অপর ব্যক্তি ও জাতির কার্য্যাকার্য্য-বিচারণের সময়েই বিশেষভাবে করিয়া থাকেন, নিজের কার্য্যকলাপ বিচার করিতে যাইয়া প্রায়ই পাল্টাইয়া দেন, সেই পাশ্চাত্য নীতির অনুসরণ করিয়া আমরা যাহাকে জঘন্য কর্ত্তাভজাদি মত বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করি, ঐ কর্ত্তাভজাদি মত হইতে শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তমত পর্য্যন্ত সকল মতই এ দেবমানব ঠাকুরের নিকট সসম্মানে ঈশ্বরলাভের পথ বলিয়া স্থান-প্রাপ্ত হইত এবং অধিকারি-বিশেষে অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্টও হইত। আমরা অনেকে দ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ঠাকুরকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছি—'মহাশয়, অত বড় উচ্চদরের সাধিকা ব্রাহ্মণী পঞ্চ-মকার লইয়া সাধন করিতেন, এটা কিরূপ? অথবা অত বড় উচ্চদরের ভক্ত সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ পরকীয়া-গ্রহণে বিরত হন নাই—এ ত বড় খারাপ!'

ঠাকুরও তাহাতে বারংবার আমাদের বলিয়াছেন, "ওতে ওদের দোষ নেই রে! ওরা ষোলআনা মন দিয়ে বিশ্বাস কোর্‌ত, ঐটেই

ঈশ্বর-লাভের পথ। ঈশ্বরলাভ হবে বোলে যে যেটা সরলভাবে প্রাণের সহিত বিশ্বাস কোরে অনুষ্ঠান করে, সেটাকে খারাপ বলতে নেই, নিন্দা করতে নেই। কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। কেন-না যে-কোন একটা ভাব ঠিক ঠিক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়, যে যার ভাব ধ'রে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডেকে যা। আর, কারো ভাবের নিন্দা করিস নি বা অপরের ভাবটা নিজের বলে ধরতে, নিতে যাস্ নি।" এই বলিয়াই সদানন্দময় ঠাকুর অনেক সময় গাহিতেন—

আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সে পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
(ও মন) কত মণি পড়ে আছে, সে চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥
তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ, মন উচাটন হয়োনা রে,
(তুমি) আনন্দে ত্রিবেণী-স্নানে শীতল হওনা মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
(তুমি) বাজিকরে চিন্‌লেনাকো, (যে এই) ঘটের
ভিতর বিরাজ করে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

গুরুভাব ও নানা সাধুসম্প্রদায়

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

—গীতা, ১০।৮

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

—গীতা, ১০।১১

ঠাকুর এক সময়ে আমাদের বলিয়াছিলেন, "কেশব সেনের আসবার পর থেকে তোদের মত 'ইয়ং বেঙ্গলের' (Young Bengal) দলই সব এখানে (আমার নিকটে) আস্‌তে শুরু করেছে। আগে আগে এখানে কত যে সাধু-সন্ত, ত্যাগী-সন্ন্যাসী, বৈরাগী-বাবাজী সব আস্‌ত যেতো, তা তোরা কি জানবি? রেল হবার পর থেকে তারা সব আর এদিকে আসে না। নইলে রেল হবার আগে যত সাধুরা সব গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটা পথ ধরে সাগরে চান্ (স্নান) কর্‌তে ও ৺জগন্নাথ দেখ্‌তে আস্‌ত। রাসমণির

ঠাকুরের সাধুদের সহিত মিলন কিরূপে হয়

বাগানে ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে অন্ততঃ দু-চার দিন থাকা, বিশ্রাম করা তারা সকলে কোরতোই কোর্‌তো। কেউ কেউ আবার কিছুকাল থেকেই যেত। কেন জানিস্? সাধুরা 'দিশা-জঙ্গল' ও 'অন্ন-পানির' সুবিধা না দেখে কোথাও আড্ডা করে না। 'দিশা-জঙ্গল'

কি না—শৌচাদির জন্য স্নবিধাজনক নিরেলা জায়গা। আর, 'অন্ন-পানি' কি না—ভিক্ষা। ভিক্ষান্নেই তো সাধুদের শরীরধারণ—সেজন্য যেখানে সহজে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তারই নিকটে সাধুরা 'আসন' অর্থাৎ থাকিবার স্থান ঠিক করে।

"আবার চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ভিক্ষার কষ্ট সহ্য করেও বরং সাধুরা কোন স্থানে দু-এক দিনের জন্য আড্ডা করে থাকে, কিন্তু যেখানে জলের কষ্ট এবং 'দিশা-জঙ্গলের' কষ্ট বা শৌচাদি যাবার 'ফারাকৎ' (নির্জন) স্থান নেই, সেখানে কখনও থাকে না। ভাল ভাল সাধুরা ওসব (শৌচাদি) কাজ যেখানে সকলে করে, যেখানে লোকের নজরে পড়তে হবে সেখানে করে না। অনেক দূরে নিরেলা (নিরালয়) জায়গায় গোপনে সেরে আসে ! সাধুদের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম—

সাধুদের জল ও 'দিশা-জঙ্গলের' স্নবিধা দেখিয়া বিশ্রাম করা

"একজন লোক ভাল ত্যাগী সাধু দেখ্‌বে বলে সন্ধান করে ফির্‌ছিল। তাকে একজন বলে দিলে যে, যে সাধুকে লোকালয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে শোচাদি সার্‌তে দেখবে, তাকেই জান্‌বে ঠিক ঠিক ত্যাগী। সে ঐ কথাটি মনে রেখে লোকালয়ের বাহিরে সন্ধান কর্‌তে কর্‌তে এক দিন একজন সাধুকে অপর সকলের চেয়ে অনেক অধিক দূরে গিয়ে ঐ সব কাজ সার্‌তে দেখতে পেলে ও তার পেছনে পেছনে গিয়ে সে কেমন লোক তাই জান্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগলো। এখন, সে দেশের রাজার মেয়ে শুনেছিল যে ঠিক ঠিক যোগী পুরুষকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে স্নপুত্তর লাভ হয়; কারণ শাস্ত্রে আছে—যোগী-

ঐ সম্বন্ধে গল্প

পুরুষদের ঔরসেই সাধুপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন। রাজার মেয়ে তাই সাধুরা যেখানে আড্ডা করেছিল, সেখানে মনের মত পতি খুঁজতে এসে ঐ সাধুটিকে পছন্দ করে বাড়ী ফিরে গিয়ে তার বাপকে বল্লে যে, সে ঐ সাধুকে বিবাহ কর্‌বে। রাজা মেয়েটিকে বড় ভালবাসতো। মেয়ে জেদ করে ধরেছে, কাজেই রাজা সেই সাধুর কাছে এসে 'অর্দ্ধেক রাজত্ব দেব' ইত্যাদি বলে অনেক করে বুঝালে যাতে সাধু রাজকন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু সাধু রাজার সে সব কথায় কিছুতেই ভুললো না। কাকেও কিছু না বলে রাতারাতি সে স্থান ছেড়ে পালিয়ে গেল। আগে যার কথা বলেছি, সেই লোকটি সাধুর ঐরূপ অদ্ভুত ত্যাগ দেখে বুঝলে যে, বাস্তবিকই সে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দর্শন পেয়েছে ও তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর মুখে উপদেশ পেয়ে তাঁর কৃপায় ঈশ্বর-ভক্তি লাভ করে কৃতার্থ হ'ল।

"রাসমণির বাগানে ভিক্ষার সুবিধা, মা গঙ্গার কৃপায় জলেরও অভাব নেই। আবার নিকটেই মনের মত 'দিশা-জঙ্গল' যাবার স্থান—কাজেই সাধুরা তখন তখন এখানেই ডেরা কর্‌তো। আবার, কথা মুখে হাঁটে—এ সাধু ওকে বল্‌লে, সে আর একজন এদিকে আস্‌ছে জেনে তাকে বল্‌লে—এইরূপে রাসমণির বাগান যে সাগর ও জগন্নাথ দেখ্‌তে যাবার পথে একটি ডেরা কর্‌বার বেশ জায়গা, একথাটা সকল সাধুদের ভেতরেই তখন চাউর হয়ে গিয়েছিল।"

দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে 'দিশা-জঙ্গল' ও ভিক্ষার বিশেষ সুবিধা বলিয়া সাধুদের তথায় আসা

ঠাকুর আরও বলিতেন, "এক এক সময়ে এক এক রকমের

সাধুর ভির লেগে যেত। এক সময়ে সন্ন্যাসী পরমহংসই যত আস্‌তে লাগল! পেট-বৈরাগীর দল নয়—সব ভাল ভাল লোক। (নিজের ঘর দেখাইয়া) ঘরে দিনরাত্তির তাদের ভিড় লেগেই থাকৃত। আর দিবারাত্তির ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ, অস্তি ভাতি প্রিয়—এই সব বেদান্তের কথাই চলতো।"

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাধুসম্প্রদায়ের আগমন

অস্তি, ভাতি, প্রিয়—ঠাকুর ঐ কথা কয়টি বলিয়াই আবার বুঝাইয়া দিতেন। বলিতেন, "সেটা কি জানিস্?—ব্রহ্মের স্বরূপ; বেদান্তে ঐ ভাবে বোঝান আছে, যিনিই 'অস্তি' কি না—ঠিক ঠিক বিদ্যমান আছেন, তিনিই 'ভাতি' কি না—প্রকাশ পাচ্চেন। এখন, 'প্রকাশটা' হচ্চে জ্ঞানের স্বভাব। যে জিনিসটার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হয়েছে সেটাই আমাদের কাছে প্রকাশিত রয়েছে। যেটার জ্ঞান নাই সে জিনিসটা আমাদের কাছে অপ্রকাশ রয়েছে। কেমন, না? তাই বেদান্ত বলে, যে জিনিসটার যখনি আমাদের অস্তিত্ব-বোধ হল, তখনি অমনি সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটা আমাদের কাছে দীপ্তিমান বা প্রকাশিত বলে বোধ হল—অর্থাৎ তার জ্ঞান-স্বরূপের কথাটা আমাদের বোধ হল। আর অমনি সেটা আমাদের প্রিয় বলে বোধ হল—অর্থাৎ তার ভেতরের আনন্দ-স্বরূপ আমাদের মনে প্রিয় বুদ্ধির উদয় করে সেটাকে ভালবাসতে আমাদের আকর্ষণ করলে। এইরূপে যেখানেই আমাদের অস্তিত্ব-জ্ঞান হচ্চে, সেখানেই আবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপের জ্ঞান হচ্চে। সে জন্য, যেটা

পরমহংসদেবের বেদান্তবিচার—'অস্তি, ভাতি, প্রিয়'

'অস্তি' সেটাই 'ভাতি' ও 'প্রিয়'—যেটা 'ভাতি' সেটাই 'অস্তি' ও 'প্রিয়' এবং যেটা 'প্রিয়' সেটাই 'অস্তি' ও 'ভাতি' বলে বোধ হচ্চে। কারণ যে ব্রহ্মবস্তু হতে এই জগৎ ও জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির উদয় হয়েছে, তাঁর স্বরূপই হচ্চে 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' বা সৎ-চিৎ-আনন্দ। সে জন্যই উত্তর গীতায় বলেছে—জ্ঞান হলে বোঝা যায়, যেখানে বা যে বস্তু বা ব্যক্তিতে তোমার মনকে টানছে, সেখানে বা সেই সেই বস্তু ও ব্যক্তির ভেতর পরমাত্মা রয়েছেন। 'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদং।' রূপ-রসেও তাঁর অংশ রয়েছে বলে লোকের মন সেদিকে ছোটে, একথা বেদেও আছে।

"ঐ সব কথা নিয়ে তাদের ভেতর খুব তর্কবিচার লেগে যেত। (আমার) আবার তখন খুব পেটের অসুখ, আমাশয়। হাতের জল শুকাত না! ঘরের কোণে হৃদু সরা পেতে রাখ্‌ত। সেই পেটের অসুখে ভুগ্‌চি, আর তাদের ঐ সব জ্ঞানবিচার শুন্‌চি! আর, যে কথাটার তারা কোন মীমাংসা করে উঠতে পার্‌চে না, (নিজের শরীর দেখাইয়া) ভিতর থেকে তার এমন এক একটা সহজ কথায় মীমাংসা মা তুলে দেখিয়ে দিচ্চেন।—সেইটে তাদের বল্‌চি, আর তাদের সব ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাচ্চে!

জনৈক সাধুর আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করায় উচ্চাবস্থার কথা

"একবার এক সাধু এল, তার মুখখানিতে বেশ একটি সুন্দর জ্যোতিঃ রয়েছে। সে কেবল বসে থাকে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে! সকাল সন্ধ্যা একবার করে ঘরের বাহিরে এসে সে গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ত ও আনন্দে বিভোর হয়ে দু হাত তুলে নাচ্‌ত; কখন বা হেসে গড়াগড়ি দিত, আর

বল্‌ত, 'বাঃ বাঃ ক্যায়া মায়া—ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া!' অর্থাৎ, ঈশ্বর কি সুন্দর মায়া বিস্তার করেছেন! তার ঐ ছিল উপাসনা। তার আনন্দলাভ হয়েছিল।

"আর একবার এক সাধু আসে—সে জ্ঞানোন্মাদ! দেখতে যেন পিশাচের মত—উলঙ্গ, গায়ে মাথায় ধূলো, বড় বড় নখ চুল, গায়ে মরার কাঁথার মত একখানা কাঁথা! কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন কর্‌তে কর্‌তে এমন স্তব পড়্‌লে, যেন মন্দিরটা শুদ্ধ কাঁপতে লাগ্‌ল; আর মা যেন প্রসন্না হয়ে হাস্‌তে লাগলেন! তারপর কাঙ্গালীরা থানে বসে প্রসাদ পায়, সেখানে তাদের সঙ্গে প্রসাদ পাবে বলে বস্‌তে গেল। কিন্তু তার ঐ রকম চেহারা দেখে তারাও তাকে কাছে বস্‌তে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। তারপর দেখি, প্রসাদ পেয়ে সকলে যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে, সেখানে বসে কুকুরদের সঙ্গে এঁটো ভাতগুলো খাচ্চে! একটা কুকুরের ঘাড়ে হাত দিয়ে রয়েছে, আর একই পাতে ঐ কুকুরটাও খাচ্চে, আর খাচ্চে! অচেনা লোকে ঘাড় ধরেছে, তাতে কুকুরটা কিছু বল্‌ছে না বা পালাতে চেষ্টাও কর্‌চে না! তাকে দেখে মনে ভয় হল যে, শেষে আমারও ঐরূপ অবস্থা হয়ে ঐ রকম থাকৃতে বেড়াতে হবে না কি!

ঠাকুরের জ্ঞানোন্মাদ সাধু-দর্শন

"দেখে এসেই হৃদুকে বল্লুম, 'হৃদু, এ যে-সে উন্মাদ নয়—জ্ঞানোন্মাদ।' ঐ কথা শুনে হৃদু তাকে দেখ্‌তে ছুটলো। গিয়ে দেখে, তখন সে বাগানের বাইরে চলে যাচ্চে। হৃদু অনেক দূর তার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লো, আর বল্‌তে লাগল, 'মহারাজ! ভগবানকে

কেমন করে পাব, কিছু উপদেশ দিন।' প্রথম কিছুই বললে না। তারপর যখন হৃদে কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল, তখন পথের ধারের নর্দ্দমার জল দেখিয়ে বললে—'এই নর্দ্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখন পাবি।' এই পর্য্যন্ত—আর কিছুই বললে না। হৃদে আরও কিছু শোন্‌বার ঢের চেষ্টা করলে, বললে, 'মহারাজ! আমাকে চেলা করে সঙ্গে নিন।' তাতে কোন কথাই বললে না।

ব্রহ্মজ্ঞানে গঙ্গার জল ও নর্দ্দমার জল এক বোধ হয়। পরমহংসদের বালক, পিশাচ বা উন্মাদের মত অপরে দেখে

তারপর অনেক দূর গিয়ে একবার ফিরে দেখ্‌লে হৃদু তখনও সঙ্গে সঙ্গে আসচে। দেখেই চোখ রাঙিয়ে ইট তুলে হৃদেকে মারতে তাড়া কর্‌লে। হৃদে যেমন পালাল অমনি ইট ফেলে সে পথ ছেড়ে কোন্ দিকে যে সরে পড়লো, হৃদে তাকে আর দেখতে পেলে না। অমন সব সাধু, লোকে বিরক্ত করবে বলে ঐ রকম বেশে থাকে। ঐ সাধুটির ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছিল। শাস্ত্রে আছে, ঠিক ঠিক পরমহংসেরা বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ হয়ে সংসারে থাকে। সে জন্য পরমহংসেরা ছোট ছোট ছেলেদের আপনাদের কাছে রেখে তাদের মত হতে শেখে। ছেলেদের যেমন সংসারের কোন জিনিসে আঁট নেই, সকল বিষয়ে সেই রকম হবার চেষ্টা করে। দেখিস্ নি, বালককে হয়ত একখানি নূতন কাপড় মা পরিয়ে দিয়েছে, তাতে কতই আনন্দ! যদি বলিস্, 'কাপড়খানি আমায় দিবি?' সে অমনি বলে উঠবে, 'না, দেব না, মা আমায় দিয়েছে।' বলেই আবার হয়ত কাপড়ের খোঁটটা জোর করে ধর্‌বে, আর

তোর দিকে দেখতে থাকবে—পাছে তুই সেখানি কেড়ে নিস্। কাপড়খানাতেই তখন যেন তার প্রাণটা সব পড়ে আছে! তার পরেই হয়ত তোর হাতে একটা সিকি-পয়সার খেলনা দেখে বল্‌বে, 'ঐটে দে, আমি তোকে কাপড়খানা দিচ্ছি।' আবার কিছু পরেই হয়ত সে খেলনাটা ফেলে একটা ফুল নিতে ছুটবে। তার কাপড়েও যেমন আঁট্, খেলনাটায়ও সেই রকম আঁট্। ঠিক ঠিক জ্ঞানীদেরও ঐ রকম হয়।

"এই রকম করে কতদিন গেল। তারপর তাদের (সন্ন্যাসী পরমহংসশ্রেণীর) যাওয়া-আসাটা কমে গেল। তারা গিয়ে, আসতে লাগল যত রামাইৎ বাবাজী—ভাল ভাল ত্যাগী ভক্ত বৈরাগী বাবাজী। দলে দলে আস্‌তে লাগলো। আহা, তাদের সব কি ভক্তি, বিশ্বাস! কি সেবায় নিষ্ঠা! তাদের একজনের কাছ (নিকট) থেকেই তো 'রামলালা'[১] আমার কাছে থেকে গেল। সে সব ঢের কথা!

রামাইৎ বাবাজীদের দক্ষিণেশ্বরে আগমন

"সে বাবাজী ঐ ঠাকুরটির চিরকাল সেবা কর্‌তো। যেখানে যেত, সঙ্গে করে নিয়ে যেত। যা ভিক্ষা পেত রেঁধে বেড়ে তাকে (রামলালাকে) ভোগ দিত। শুধু তাই নয়—সে দেখতে পেত রামলালা সত্য সত্যই খাচ্চে বা

রামলালা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

১ 'রামলালা' অর্থাৎ বালকবেশী শ্রীরামচন্দ্র। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লোকে বালকবালিকাদের আদর করিয়া লাল্ বা লালা ও লালী বলিয়া ডাকে। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যাবস্থার পরিচায়ক ঐ অষ্টধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিটিকে উক্ত বাবাজী 'রামলালা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বঙ্গভাষায়ও 'দুলাল', 'দুলালী' প্রভৃতি শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও একটা জিনিস খেতে চাচ্চে, বেড়াতে যেতে চাচ্চে, আবদার করচে, ইত্যাদি! আর ঐ ঠাকুরটি নিয়েই সে আনন্দে বিভোর, 'মস্ত্' হয়ে থাকতো! আমিও দেখতে পেতুম রামলালা ঐ রকম সব কচ্চে! আর রোজ সেই বাবাজীর কাছে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতুম—আর রামলালাকে দেখতুম!

"দিনের পর দিন যত যেতে লাগলো, রামলালারও তত আমার উপর পিরীত বাড়তে লাগলো। (আমি) যতক্ষণ বাবাজীর (সাধুর) কাছে থাকি ততক্ষণ সেখানে সে বেশ থাকে—খেলা-ধুলো করে; আর (আমি) যেই সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে আসি, তখন সেও (আমার) সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে! আমি বারণ করলেও সাধুর কাছে থাকে না! প্রথম প্রথম ভাবতুম, বুঝি মাথার খেয়ালে ঐ রকমটা দেখি। নইলে তার (সাধুর) চিরকেলে পূজোকরা ঠাকুর, ঠাকুরটিকে সে কত ভালবাসে—ভক্তি করে' সন্তর্পণে সেবা করে, সে ঠাকুর তার (সাধুর) চেয়ে আমায় ভালবাসবে—এটা কি হতে পারে? কিন্তু ওরকম ভাবলে কি হবে? দেখতুম, সত্য সত্য দেখতুম—এই যেমন তোদের সব দেখছি, এই রকম দেখতুম—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখন আগে কখন পেছনে নাচতে নাচতে আস্‌চে। কখন বা কোলে ওঠবার জন্য আবদার কচ্চে। আবার হয়ত কখন বা কোলে করে রয়েছি—কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়া-দৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়বে! যত বারণ করি, 'ওরে, অমন করিস নি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে! ওরে, অত জল ঘাটিস্ নি, ঠাণ্ডা লেগে

সর্দ্দি হবে, জ্বর হবে।' সে কি তা শোনে? যেন কে কাকে বলছে! হয়ত সেই পদ্মপলাশের মত সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো, আর আরো দুরন্তপনা করতে লাগলো বা ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গী কোরে ভ্যাঙ্চাতে লাগলো। তখন সত্যসত্যই রেগে বলতুম, 'তবে রে পাজি, রোস্, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো!'—ব'লে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি; আর এ-জিনিসটা ও-জিনিসটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের ভেতর খেলতে বলি। আবার কখন বা কিছুতেই দুষ্টামি থাম্‌চে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতাম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে সজলনয়নে আমার দিকে দেখতো! তখন আবার মনে কষ্ট হত; কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভুলাতাম! এ রকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম, করতুম!

"একদিন নাইতে যাচ্ছি, বায়না ধরলে সেও যাবে! কি করি, নিয়ে গেলুম। তারপর জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না, যত বলি, কিছুতেই শোনে না। শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বললুম—তবে নে, কত জল ঘাঁটতে চাস্ ঘাঁট; আর সত্য সত্য দেখলুম সে জলের ভিতর হাঁপিয়ে শিউরে উঠলো! তখন আবার তার কষ্ট দেখে, কি কল্লুম বলে কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি!

"আর একদিন তার জন্য মনে যে কত কষ্ট হয়েছিল, কত যে কেঁদেছিলাম তা বলবার নয়। সেদিন রামলালা বায়না করচে দেখে ভোলাবার জন্য চারটি ধান শুদ্ধ খই খেতে দিয়েছিলুম।

তারপর দেখি, ঐ খই খেতে খেতে ধানের তুষ লেগে তার নরম জিব চিরে গেছে! তখন মনে কষ্ট হ'ল; তাকে কোলে করে ডাক্ ছেড়ে কাঁদতে লাগলুম আর মুখখানি ধরে বলতে লাগলুম—'যে মুখে মা কৌশল্যা লাগবে বলে ক্ষীর, সর, ননীও অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন, আমি এমন হতভাগা যে, সেই মুখে এই কদর্য্য খাবার দিতে মনে একটুও সঙ্কোচ হল না!'"—কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুরের আবার পূর্ব্বশোক উথলিয়া উঠিল এবং তিনি আমাদের সম্মুখে অধীর হইয়া এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, রামলালার সহিত তাঁহার প্রেম-সম্বন্ধের কথার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝিতে না পারিলেও আমাদের চক্ষে জল আসিল!

ঠাকুরের মুখে রামলালার কথা শুনিয়া আমাদের কি মনে হয়

মায়াবদ্ধ জীব আমরা রামলালার ঐ সব কথা শুনিয়া অবাক। ভয়ে ভয়ে (রামলালা) ঠাকুরটির দিকে তাকাইয়া দেখি, যদি কিছু দেখিতে পাই। ওমা, কিছুই না! আর পাবই বা কেন? রামলালার উপর সে ভালবাসার টান তো আর আমাদের নেই। ঠাকুরের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ভাবটি ভিতরে ঘনীভূত হইয়া আমাদের সে ভাব-চক্ষু তো খুলে নাই যে বাহিরেও রামলালাকে জীবন্ত দেখিব। আমরা একটি ছোট পুতুলই দেখি, আর ভাবি, ঠাকুর যা বলিতেছেন তা কি হইতে পারে বা হওয়া সম্ভব? সংসারে সকল বিষয়েই তো আমাদের ঐরূপ হইতেছে, আর অবিশ্বাসের ঝুড়ি লইয়া বসিয়া আছি! দেখ না—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বলিলেন, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,' জগতে এক সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর কিছুই

নাই; তোরা যে নানা জিনিস নানা ব্যক্তি সব দেখিতেছিস্, তার একটা কিছুও বাস্তবিক নাই। আমরা ভাবিলাম, 'হবেও বা'; সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-বস্তুর নামগন্ধও খুঁজিয়া পাইলাম না; দেখিতে পাইলাম, কেবল কাঠ মাটি, ঘর দ্বার, মানুষ গরু, নানা রঙ্গের জিনিস। না হয় বড় জোর দেখিলাম, নীল সুনীল তারকামণ্ডিত অনন্ত আকাশ, শুভ্রকিরীটী হরিৎ-শ্যামলাঙ্গ ভূধর তাহাকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে, আর কলনাদিনী স্রোতস্বতীকুল 'অত স্পর্দ্ধা ভাল নয়' বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে নিমগ্না হইয়া তাহাকে দীনতা শিক্ষা দিতেছে! অথবা দেখিলাম, বাত্যাহত অনন্ত জলধি বিশাল বিক্রমে সর্ব্বগ্রাস করিতে যেন ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও বেলাতিক্রম করিতে পারিতেছে না! আর ভাবিলাম, ঋষিরা কি কোনরূপ নেশা ভাঙ করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন? ঋষিরা যদি বলিলেন, 'না হে বাপু, কায়মনোবাক্যে সংযম ও পবিত্রতার অভ্যাস করিয়া একচিত্ত হও, চিত্তকে স্থির কর, তাহা হইলেই আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা বুঝিতে—দেখিতে পাইবে; দেখিবে, জগৎটা তোমারই ভিতরের ভাবের ঘনীভূত প্রকাশ; দেখিবে, তোমার ভিতরে 'নানা' রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরেও 'নানা' দেখিতেছ।' অথবা বলিলাম, 'ঠাকুর, পেটের দায়ে ইন্দ্রিয়তাড়নায় অস্থির, আমাদের অত অবসর কোথায়?' অথবা বলিলাম, 'ঠাকুর, তোমার ব্রহ্মবস্তু দেখিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া ফর্দ্দ বাহির করিলে, তাহা করা তো দুই-চারি দিন বা মাস বা বৎসরের কাজ

নয়—মানুষে এক জীবনে করিয়া উঠিতে পারে কি না সন্দেহ। তোমাদের কথা শুনিয়া ঐ বিষয়ে লাগিয়া তারপর যদি ব্রহ্মবস্তু না দেখিতে পাই, অনন্ত আনন্দলাভটা সব ফাঁকি বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই তো আমার এ কূলও গেল, ও কূলও গেল—না পৃথিবীর, ক্ষণস্থায়ীই হউক আর যাহাই হউক, সুখগুলো ভোগ করিতে পাইলাম, না তোমার অনন্ত সুখটাই পাইলাম—তখন কি হইবে? না, ঠাকুর! তুমি অনন্ত সুখের আস্বাদ পাইয়া থাক, ভাল—তুমিই উহা শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে সুখে ভোগদখল কর; আমরা রূপরসাদি হইতে হাতে হাতে যে সুখটুকু পাইতেছি, আমাদের তাহাই ভোগ করিতে দাও; নানা তর্ক-যুক্তি, ফন্দি-ফারক্কা তুলিয়া আমাদের সে ভোগটুকু মাটি করিও না!'

আবার দেখ, বিজ্ঞানবিৎ আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে যন্ত্র-সহায়ে দেখাইয়া দিতেছি—এক সর্ব্ব-ব্যাপী প্রাণপদার্থ ইট-কাঠ, সোনা-রূপা, গাছপালা, মানুষ-গরু সকলের ভিতরেই সমভাবে রহিয়া ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।' আমরা দেখিলাম, বাস্তবিকই সকলের ভিতরে প্রাণস্পন্দন পাওয়া যাইতেছে! বলিলাম—'বা! বা! তোমার বুদ্ধিখানার দৌড় খুব বটে। কিন্তু শুধু ঐ জ্ঞান লইয়া কি হইবে? ও কথা ত আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন বহুকাল পূর্ব্বে।[১] তুমি না হয় উহা এখন দেখাইতেই

বর্ত্তমান কালের জড়বিজ্ঞান ভোগ-সুখ-বৃদ্ধির সহায়তা করে বলিয়া আমাদের উহাতে অনুরাগ

[১] "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ"—বৃক্ষপ্রস্তরাদি জড়পদার্থসকলেরও চৈতন্ত আছে; উহাদের ভিতরেও সুখদুঃখের অনুভূতি বর্ত্তমান।

পারিলে। উহার সহায়ে আমাদের রূপরসাদি-ভোগের কিছু বৃদ্ধি হইবে বলিতে পার? তাহা হইলে বুঝিতে পারি।' বিজ্ঞানবিৎ বলিলেন—'হইবে না? নিশ্চিত হইবে। এই দেখ না, তড়িৎশক্তির পরিচয় পাইয়া তোমার দেশ-দেশান্তরের সংবাদ পাইবার কত সুবিধা হইয়াছে; বাষ্পীয় শক্তির কথা জানিয়া রেল-জাহাজ, কল-কারখানা করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দ্বারা তোমার ভোগের মূল অর্থ-উপার্জ্জনের কত সুবিধা হইয়াছে; বিস্ফোরক পদার্থের গূঢ় নিয়ম বুঝিয়া বন্দুক কামান করিয়া তোমার ভোগসুখলাভের অন্তরায় শত্রুকুলনাশের কত সুবিধা হইয়াছে। এইরূপে আজ আবার এই যে সর্ব্বব্যাপী প্রাণশক্তির পরিচয় পাইলে তাহার দ্বারাও পরে ঐরূপ কিছু না কিছু সুবিধা হইবেই হইবে।' তখন আমরা বলিলাম, 'তা বটে; আচ্ছা, কিন্তু যত শীঘ্র পার ঐ নবাবিষ্কৃত শক্তিপ্রয়োগে যাহাতে আমাদের ভোগের বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়টায় লক্ষ্য রাখিয়া যাহা হয় কিছু একটা বাহির করিয়া ফেল; তাহা হইলে বুঝিব, তুমি বাস্তবিক বুদ্ধিমান বটে; ঐ বেদ-পুরাণ-বক্তা ঋষিগুলোর মত তুমি নেশা ভাঙ করিয়া কথা কহ না।' বিজ্ঞানবিৎও শুনিয়া আমাদের ধারা বুঝিয়া বলিলেন—'তথাস্তু!'

ধর্ম্মজগতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রচারক ঋষিরা ঐরূপে 'তথাস্তু' বলিতে পারিলেন না বলিয়াই তো যত গোল বাধিয়া গেল। আর তাহাদিগকে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে ঝোড়ে জঙ্গলে বাস করিয়া দুই-চারিটা সংসারবিরাগী লোককে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল! তবে ভারতে ধর্ম্মজগতে ঐরূপ 'তথাস্তু'

বলিবার চেষ্টা যে কোনকালে কখনও হয় নাই তাহা বোধ হয় না। বৌদ্ধযুগের শেষের কথাটা স্মরণ কর —যখন তান্ত্রিক কাপালিকেরা মারণ, উচাটন, বশীকরণাদির বিপুল প্রসার করিতেছেন, যখন শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিতে মানবের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উপশম ও আরোগ্যের এবং ভূত-প্রেত তাড়াইবার খুব ধুমধাম পড়িয়াছে, যখন তপস্যালব্ধ সিদ্ধাই-প্রভাবে অলৌকিক কিছু একটা না দেখাইতে পারিলে এবং শিষ্যবর্গের সাংসারিক ভোগসুখাদি নির্বিঘ্নে যাহাতে সম্পন্ন হয়, দৈবকে ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা তুমি যে ধারণ কর লোকের নিকট এরূপ ভান না করিতে পারিলে তুমি ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতে না—সেই যুগের কথা স্মরণ কর। তখন ধর্ম্মজগৎ একবার ভোগের কামনা পূর্ণ করিবার সহায়ক বলিয়া ধর্ম্মনিহিত গূঢ় সত্যসকলকে সংসারী মানবের নিকট প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কিন্তু আলোক ও অন্ধকার একত্রে একই স্থানে এক সময়ে থাকিবে কিরূপে? ফলে অল্পকালের মধ্যেই কাপালিক তান্ত্রিকদের যোগ ভুলিয়া ভোগভূমিতে অবরোহণ এবং ধর্ম্মের নামে রূপরসাদি সুবিস্তৃত ভোগশৃঙ্খলের গুপ্ত প্রচার! তখন দেশের যথার্থ ধার্ম্মিকেরা আবার বুঝিল যে, যোগ-ভোগ দুই পদার্থ পরস্পর-বিরোধী—একত্র একাধারে কোনরূপেই থাকিতে পারে না এবং বুঝিয়া পুনরায় ঋষিকুল-প্রবর্ত্তিত জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী হইয়া জীবনে তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

বৌদ্ধযুগের শেষে কাপালিকদের সকামধর্ম্ম-প্রচারের ফল। যোগ ও ভোগ একত্র থাকা অসম্ভব

আমাদেরও সংসারী মানবের মতে মত দিয়া ঐরূপে 'তথাস্তু' বলিবার সুযোগ কোথায়? আমরা যে এক জগৎছাড়া ঠাকুরের কথা বলিতে বসিয়াছি—যাঁহার মনে ত্যাগের ভাব এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, সুষুপ্তাবস্থায়ও হস্তে ধাতু স্পর্শ করিলে হস্ত সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট হইয়া যাইত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণের ভিতর বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইত—যাঁহার মনে জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান স্ত্রী-শরীর দেখিলেই উদয় হইত, নানা লোকে নানা চেষ্টা করিয়াও ঐ ভাব দূর করিতে পারে নাই!—সহস্র সহস্র মুদ্রার সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিল বলিয়া যাঁহার মনে এমন বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরম অনুগত মথুরকে যষ্টিহস্তে আরক্তনয়নে প্রহার করিতে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন এবং পরেও সে-সব কথা আমাদের নিকট কখন কখন বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া বলিতেন, "মথুর ও লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী বিষয় লেখাপড়া করে দেবে শুনে মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিয়েছিল, এমন যন্ত্রণা হয়েছিল!"—যাঁহার মনে সংসারের রূপরসাদির কখনও আসক্তির কলঙ্ক-কালিমা আনয়ন করিয়া সমাধিভূমির অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভবের বিন্দুমাত্র বিচ্ছেদ জন্মাইতে পারে নাই—এ সৃষ্টিছাড়া ঠাকুরের কথা বলিতে যাইয়া আমাদের যে অনেক তিরস্কার-লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, হে ভোগলোলুপ সংসারী মানব, তাহা আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই জানি। শুধু তাহাই নহে, পাছে তোমার দলবল, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-পৌত্রাদির ভিতর সরলমতি কেহ এ অলৌকিক চরিত্রের

ঠাকুরের নিজের অদ্ভুত ত্যাগ এবং ত্যাগধর্ম্মের প্রচার দেখিয়া সংসারী লোকের ভয়

প্রতি আমাদের কথায় সত্য সত্যই আকৃষ্ট হইয়া ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সংসারের বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, তজ্জন্য তুমি এ দেবচরিত্রেও যে কলঙ্কার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না—তাহাও আমরা জানি। কিন্তু জানিলে কি হইবে? যখন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আর আমাদের বিরত হইবার বা অন্ততঃ আংশিক গোপন করিয়া সত্য বলিবার সামর্থ্য নাই। যতদূর জানি, সমস্ত কথাই বলিয়া যাইতে হইবে। নতুবা শান্তি নাই। কে যেন জোর করিয়া বলাইতেছে যে! অতএব আমরা এ অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবমানবের কথা যতদূর জানি বলিয়া যাই, আর তুমি এই সকল কথা যতটা ইচ্ছা 'ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়া' নিজের যতটা 'রয় সয়' ততটা লইও, বা ইচ্ছা হইলে 'কতকগুলো গাঁজাখুরি কথা লিখিয়াছে' বলিয়া পুস্তকখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিত্য নূতন ফুলে 'বিষয়-মধু' পান করিতে ছুটিও। পরে সংসারে বিষম ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যদি কখন 'বিষয়-মধু তুচ্ছ হল কামাদি-কুসুমসকলে'—এমন অবস্থা তোমার ভাগ্যদোষে (বা গুণে?) আসিয়া পড়ে, তখন এ অলৌকিক পুরুষের লীলাপ্রসঙ্গ পড়িও, নিজেও শান্তি পাইবে এবং আমাদের ঠাকুরেরও 'কদর' বুঝিবে।

রামলালার ঠাকুরের নিকট থাকিয়া যাওয়া কিরূপে হয়

'রামলালার' ঐ অদ্ভুত আচরণের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বলিতেন, "এক এক দিন রেঁধেবেড়ে ভোগ দিতে বসে বাবাজী (সাধু) রামলালাকে দেখতেই পেত না। তখন মনে ব্যথা পেয়ে এখানে (ঠাকুরের ঘরে) ছুটে আস্‌ত; এসে দেখ্‌ত রামলালা ঘরে খেলা কর্‌চে! তখন অভিমানে তাকে কত কি

বল্‌ত! বল্‌ত, 'আমি এত করে রেঁধেবেড়ে তোকে খাওয়াব বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই কিনা এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে রয়েছিস্! তোর ধারাই ঐরূপ, যা ইচ্ছা তাই করবি, মায়া দয়া কিছুই নেই। বাপ-মাকে ছেড়ে বনে গেলি, বাপটা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, তবুও ফিরলি না—তাকে দেখা দিলি না'—এই রকম সব কত কি বোলে রামলালাকে টেনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। এই রকমে দিন যেতে লাগল। সাধু এখানে অনেক দিন ছিল—কারণ রামলালা এখান (আমাকে) ছেড়ে যেতে চায় না—আর সেও চিরকালের আদরের রামলালাকে ফেলে যেতে পারে না!

"তারপর একদিন বাবাজী হঠাৎ এসে সজলনয়নে বল্‌লে, 'রামলালা আমাকে কৃপা করে প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে যেমন ভাবে দেখতে চাইতাম তেমনি করে দর্শন দিয়েছে ও বলেছে, এখান থেকে যাবে না; তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না—আমার এখন আর মনে দুঃখকষ্ট নাই। তোমার কাছে ও সুখে থাকে, আনন্দে খেলাধুলো করে তাই দেখেই আমি আনন্দে ভরপূর হয়ে যাই! এখন আমার এমনটা হয়েছে যে ওর যাতে সুখ, তাতেই আমার সুখ। সেজন্য আমি এখন একে তোমার কাছে রেখে অন্যত্র যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে'—এই ব'লে রামলালাকে আমায় দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলে। সেই অবধি রামলালা এখানে রয়েছে।"

আমরা বুঝিলাম ঠাকুরের দেবসঙ্গেই বাবাজীর মন স্বার্থগন্ধহীন

ভালবাসার আস্বাদন পাইল এবং বুঝিতে পারিল যে ঐ প্রেমে প্রেমাস্পদের সহিত আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। বুঝিল যে, তাহার শুদ্ধ-প্রেমঘন উপাস্য তাহার নিকটেই সর্ব্বদা রহিয়াছেন, যখনি ইচ্ছা তখনি তাঁহার দর্শন পাইবে। সাধু ঐ আশ্বাস পাইয়াই যে প্রাণের রামলালাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়।

ঠাকুরের দেবসঙ্গে বাবাজীর স্বার্থশূন্য প্রেমানুভব

ঠাকুর বলিতেন, "আবার এক সাধু এসেছিল, তার ঈশ্বরের নামেই একান্ত বিশ্বাস! সেও রামাৎ; তার সঙ্গে অন্য কিছুই নেই, কেবল একটি লোটা (ঘটি) ও একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থখানি তার বড়ই আদরের—ফুল দিয়ে নিত্য পূজা কর্‌তো ও এক একবার খুলে দেখতো। তার সঙ্গে আলাপ হবার পর একদিন অনেক করে বলে কয়ে বইখানি দেখতে চেয়ে নিলুম, খুলে দেখি তাতে কেবল লাল কালিতে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, 'ওঁ রামঃ।' সে বল্‌লে, 'মেলা গ্রন্থ পড়ে কি হবে? এক ভগবান থেকেই ত বেদ-পুরাণ সব বেরিয়েছে; আর তাঁর নাম এবং তিনি তো অভেদ; অতএব চার বেদ, আঠার পুরাণ, আর সব শাস্ত্রে যা আছে, তাঁর একটি নামেতে সে-সব রয়েছে। তাই তাঁর নাম নিয়েই আছি।' তার (সাধুর) নামে এমনি বিশ্বাস ছিল!"

জনৈক সাধুর রামনামে বিশ্বাস

এইরূপে কত সাধুর কথাই না ঠাকুর আমাদের নিকট বলিতেন, আবার কখন কখন ঐ সকল রামাইৎ বাবাজীদের নিকট যে সকল ভগবানের ভজন শিখিয়াছিলেন, তাহা গাহিয়া আমাদের শুনাইতেন। যথা—

রামাইৎ সাধুদের ভজন-সঙ্গীত ও দোঁহাবলী

(মেরা) রামকো না চিনা হ্যায়, দিল্, চিনা হ্যায় তুম ক্যারে ;
আওর্ জানা হ্যায় তুম ক্যারে।
সন্ত্ ওহি যো রাম-রস চাখে
আওর্ বিষয়-রস চাখা হ্যায় সো ক্যারে ॥
পুত্র ওহি যো কুলকো তারে
আওর্ যো সব পুত্র হ্যায় সো ক্যারে ॥

অথবা—

সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাঈ।
ভজলে অযোধ্যানাথ, দুসরা ন কোঈ ॥
হসন বোলন চতুর চাল, অয়ন বয়ান দৃগ্-বিশাল।
ভ্রূকুটি কুটিল তিলক ভাল, নাসিকা সোহাঈ ॥
কেশরকো তিলক ভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল।
মানো গিরি শিখর ফোড়ি, স্থরসরি বহিরাঈ ॥
মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল।
শ্রবণ-কুণ্ডল-ঝলমলাত, রতিপতি-ছবি-ছাঈ ॥
সখা সহিত সরযূতীর বিহরে রঘুবংশবীর,
তুলসীদাস হরষ নিরখি, চরণরজ পাঈ ॥

অথবা গাহিতেন—

'রাম ভজা সেই জিয়ারে জগ্‌মে,
রাম ভজা সেই জিয়ারে ॥'

অথবা—

'মেরা রাম বিনা কোহি নাহিরে তারণ-ওয়ালা।'

—এই মধুর গীত দুইটির অপর চরণসকল আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

কখন বা আবার ঠাকুর ঐ সকল সাধুদিগের নিকট যে-সকল দোঁহা শিখিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের শুনাইতেন। বলিতেন, "সাধুরা চুরি, নারী ও মিথ্যা এই তিনের হাত থেকে সর্ব্বদা আপনাকে বাঁচাতে উপদেশ করে।" বলিয়াই আবার বলিতেন, "এই তুলসীদাসের দোঁহায় সব কি বল্‌ছে শোন্—

সত্যবচন্ অধীন্‌তা পরধন-উদাস।
ইস্‌মে না হরি মিলে তো জামিন্ তুলসীদাস॥
সত্যবচন্ অধীন্‌তা পরস্ত্রী মাতৃসমান।
ইস্‌সে না হরি মিলে, তুলসী ঝুট্ জবান্॥

"অধীন্‌তা কি জানিস্—দীনভাব। ঠিক ঠিক দীনভাব এলে অহঙ্কারের নাশ হয় ও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কবীর দাসের গানেও ঐ কথা আছে—

সেবা বন্দি আওর্ অধীন্‌তা, সহজ মিলি রঘুরাঈ।
হরিষে লাগি রহোরে ভাই॥" ইত্যাদি।

আবার একদিন ঠাকুর বলিলেন, "এক সময়ে এমনটা মনে হল যে, সকল রকমের সাধকদের যা কিছু জিনিস সাধনার জন্য দরকার, সে সব তাদের যোগাব! তারা এই সব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ঈশ্বরসাধনা করবে, তাই দেখবো আর আনন্দ কর্‌বো। মথুরকে বল্লুম। সে বল্লে, 'তার আর কি বাবা, সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি; তোমার যাকে যা ইচ্ছা হবে দিও।' ঠাকুরবাড়ীর ভাণ্ডার থেকে চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি যার যেমন ইচ্ছা তাকে

ঠাকুরের সকল সম্প্রদায়ের সাধকদিগকে সাধনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিবার ইচ্ছা ও রাজকুমারের (অচলানন্দের) কথা

সেই রকম সিধা দেবার বন্দোবস্ত তো ছিলই—তার উপর মথুর সাধুদের দিবার জন্য লোটা, কমণ্ডলু, কম্বল, আসন, মায় তারা যে-সব নেশা ভাঙ করে—সিদ্ধি, গাঁজা, তান্ত্রিক সাধুদের জন্য 'কারণ' প্রভৃতি সকল জিনিস দিবার বন্দোবস্ত করে দিলে। তখন তান্ত্রিক সব ঢের আস্‌তো ও শ্রীচক্রের অনুষ্ঠান করতো। আমি আবার তাদের সাধনার দরকার বলে আদা পেঁয়াজ ছাড়িয়ে, মুড়ি কড়াই ভাজা আনিয়ে সব যোগাড় করে দিতুম; আর তারা সব ঐ নিয়ে পূজা করছে, জগদম্বাকে ডাক্‌ছে, দেখতুম। আমাকে তারা আবার অনেক সময় চক্রে নিয়ে বসতো, অনেক সময় চক্রেশ্বর করে বসাতো; 'কারণ' গ্রহণ করতে অনুরোধ করতো। কিন্তু যখন বুঝতো যে, ও সব গ্রহণ করতে পারি না, নাম করলেই নেশা হয়ে যায়, তখন আর অনুরোধ করত না। তাদের সঙ্গে বসলে 'কারণ' গ্রহণ করতে হয় বলে 'কারণ' নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটতুম বা আঘ্রাণ নিতুম বা বড় জোর আঙ্গুলে করে মুখে ছিটে দিতুম আর তাদের পাত্রে সব ঢেলে ঢেলে দিতুম। দেখতুম, তাদের ভিতর কেউ কেউ উহা গ্রহণ করেই ঈশ্বরচিন্তায় মন দেয়, বেশ তন্ময় হয়ে তাঁকে ডাকে। অনেকে আবার কিন্তু দেখলুম লোভে পড়ে খায়, আর জগদম্বাকে ডাকা দূরে থাক্, বেশী খেয়ে শেষটা মাতাল হয়ে পড়ে। একদিন ঐ রকমে বেশী ঢলাঢলি করাতে শেষটা ও সব (কারণাদি) দেওয়া বন্ধ করে দিলুম। রাজকুমারকে[১] কিন্তু বরাবর দেখেছি,

---

১ ইনি কয়েক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। কালীঘাটে অনেক সময় থাকিতেন এবং অচলানন্দনাথ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি অনেকগুলি

গ্রহণ করেই তন্ময় হয়ে জপে বস্‌তো; কখন অন্য দিকে মন দিত না। শেষটা কিন্তু যেন একটু নাম-যশ প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক হয়েছিল। হতেই পারে—ছেলেপিলে পরিবার ছিল—বাড়ীতে অভাবের দরুণ টাকাকড়ি-লাভের দিকে একটু-আধটু মন দিতে হত; তা যাই হক্, সে কিন্তু বাবু, সাধনার সহায় বলেই 'কারণ' গ্রহণ করতো; লোভে পড়ে ঐ সব খেয়ে কখন ঢলাঢলি করে নি—ওটা দেখেছি।"

ঠাকুরের 'সিদ্ধি' বা 'কারণ' বলিবামাত্র ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় হইয়া নেশা ও খিস্তি-খেউর উচ্চারণেও সমাধি

ঠাকুর 'কারণ' গ্রহণ করিতে কখন পারিতেন না—এ প্রসঙ্গে কত কথারই না মনে উদয় হইতেছে! কতদিন না আমাদের সম্মুখে তিনি কথা-প্রসঙ্গে 'সিদ্ধি', 'কারণ' প্রভৃতি পদার্থের নাম করিতে করিতে নেশায় ভরপূর হইয়া এমন কি সমাধিস্থ পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিয়াছি! স্ত্রী-শরীরের বিশেষ গোপনীয় অঙ্গ, যাহার নামমাত্রেই সভ্যতাভিমানী জুয়াচোর আমাদের মনে কুৎসিত ভোগের ভাবই উদিত হয় বা ঐরূপ ভাব উদিত হইবে নিশ্চিত জানিয়া আমাদের ভিতর শিষ্ট যাঁহারা তাঁহারা 'অশ্লীল' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি-প্রদান পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে করিতেই এ অদ্ভুত ঠাকুরকে কতদিন না সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি! আবার দেখিয়াছি—সমাধিভূমি হইতে কিছু নিম্নে নামিয়া একটু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াই ঐ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

শিষ্য-প্রশিষ্য রাখিয়া যান। ইঁহার দেহত্যাগের পর শিষ্যেরা কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে মহাসমারোহে তাঁহার শরীরের মৃৎসমাধি দেয়।

"মা, তুই তো পঞ্চাশৎ-বর্ণ-রূপিণী ; তোর যে-সব বর্ণ নিয়ে বেদ-বেদান্ত, সেই সবই তো খিস্তি-খেউড়ে ! তোর বেদ-বেদান্তের ক খ আলাদা, আর খেউরের ক খ আলাদা তো নয় ! বেদ-বেদান্তও তুই, আর খিস্তি-খেউড়ও তুই !—এই বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন ! হায়, হায়, বলা-বুঝানর কথা দূরে যাউক, কে বুঝিবে এ অলৌকিক দেবমানবের নয়নে জগতের ভাল-মন্দ সকল পদার্থই কি অনির্ব্বচনীয়, আমাদের মনোবুদ্ধির অগোচর, এক অপূর্ব্ব আলোকে প্রকাশিত ছিল ! কে সে চক্ষু পাইবে যে তাহার ন্যায় দৃষ্টিতে জগৎ-সংসারটা দেখিতে পাইবে ! হে পাঠক, অবহিত হও ; স্তম্ভিত মনে কথাগুলি হৃদয়ে যত্নে ধারণ কর, আর ভাব—এ অদ্ভুত ঠাকুরের মানসিক পবিত্রতা কি সুগভীর, কি দুরবগাহ !

শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপাপাত্র শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমার মন-মাতালে মাতাল করে, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে।" ইত্যাদি। বাস্তবিক নেশা-ভাঙ না করিয়া কেবল ভগবদানন্দে যে লোকে, আমরা যে অবস্থাকে বেয়াড়া মাতাল বলি তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইতে পারে, এ কথা ঠাকুরকে দেখিবার পূর্ব্বে আমাদের ধারণাই হইত না। আমাদের বেশ মনে আছে, আমাদের জীবনে একটা সময় এমন গিয়াছে যখন 'হরি' বলিলেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত—একথা কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে কুসংস্কারাপন্ন নির্ব্বোধ বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। তখন ঐ প্রকারের একটা সকল বিষয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাসের তরঙ্গ যেন

শহরের সকল যুবকেরই মনে চলিতেছিল! তাহার পরেই এই অলৌকিক ঠাকুরের সহিত দেখা—দেখা, দিবসে রাত্রে সকল সময়ে দেখা, নিজের চক্ষে দেখা যে কীর্ত্তনানন্দে তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন বাহ্যজ্ঞানের লোপ—টাকা পয়সা হাতে স্পর্শ করাইলেই ঐ অবস্থাপ্রাপ্তি—'সিদ্ধি', 'কারণ' প্রভৃতি নেশার পদার্থের নাম করিবামাত্র ভগবদানন্দের উদ্দীপন হইয়া ভরপূর নেশা—ঈশ্বরের বা তদবতারদিগের নামের কথা দূরে থাক, যে নামের উচ্চারণে ইতর-সাধারণের মনে কুৎসিত ইন্দ্রিয়জ আনন্দেরই উদ্দীপনা হয়, তাহাতে ব্রহ্মযোনি ত্রিজগৎপ্রসবিনী আনন্দময়ী জগদম্বার উদ্দীপন হইয়া ইন্দ্রিয়সম্পর্কমাত্রশূন্য বিমল আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়া! এখনও কি বলিতে হইবে, এ অলৌকিক দেবমানবের কি এমন গুণ দেখিয়া আমাদের চক্ষু চিরকালের মত ঝলসিত হইয়া গেল, যাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতারজ্ঞানে হৃদয়ে আসন দান করিলাম?

ঐ বিষয়ের ১ম। দৃ—রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে

ঠাকুরের পরম ভক্ত, পরলোকগত ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র দত্তের সিমলার (কলিকাতা) ভবনে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে অনেক আনন্দ করিতেন। একদিন ঐরূপে কিছুকাল ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আনন্দ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। রাম বাবুর বাটীখানি গলির[১] ভিতর, বাটীর সম্মুখে গাড়ী আসিতে পারে না। বাটীর কিছু দূরে পূর্ব্বের বা পশ্চিমের বড় রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া পদব্রজে বাড়ীতে আসিতে হয়। ঠাকুরের

১ গলির নাম মধু রায়ের গলি।

যাইবার জন্য একখানি গাড়ী পশ্চিমের বড় রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল। ঠাকুর সেদিকে হাঁটিয়া চলিলেন, ভক্তেরা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবদানন্দে সেদিন ঠাকুর এমন টলমল করিতেছিলেন যে, এখানে পা ফেলিতে ওখানে পড়িতেছে। কাজেই বিনা সাহায্যে ঐ কয়েক পদ যাইতে পারিলেন না। দুই জন ভক্ত দুই দিক হইতে তাঁহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাইতে লাগিল। গলির মোড়ে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন —তাঁহারা ঠাকুরের ব্যাপার বুঝিবেন কিরূপে? আপনাদিগের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'উঃ! লোকটা কি মাতাল হয়েছে হে!' কথাগুলি ধীরস্বরে উচ্চারিত হইলেও আমরা শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না, আর মনে মনে বলিলাম, 'তা বটে'!

দক্ষিণেশ্বরে একদিন দিনের বেলায় আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে পান সাজিতে ও তাঁহার বিছানা ঝাড়িয়া ঘরটা ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিয়া ঠাকুর কালীঘরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে যাইলেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর মন্দির হইতে ফিরিলেন—একেবারে যেন পুরোদস্তুর মাতাল! চক্ষু রক্তবর্ণ, হেথায় পা ফেলিতে হোথায় পড়িতেছে, কথা এড়াইয়া অস্পষ্ট অব্যক্ত হইয়া গিয়াছে! ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঐ ভাবে টলিতে টলিতে একেবারে শ্রীশ্রীমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমা তখন একমনে গৃহকার্য্য করিতেছেন, ঠাকুর যে তাঁহার

ঐ ২য় দৃষ্টান্ত—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমার সম্মুখে

নিকটে ঐ ভাবে আসিয়াছেন তাহা জানিতেও পারেন নাই। এমন সময়ে ঠাকুর মাতালের মত তাঁহার অঙ্গ ঠেলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?' তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া সহসা ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবস্থ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত! বলিলেন—'না, না, মদ খাবে কেন?'

ঠাকুর—তবে কেন টল্‌চি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্চি না? আমি মাতাল?

শ্রীশ্রীমা—না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।

ঠাকুর 'ঠিক বলেছ' বলিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার ভক্তদিগের ঠাকুরের নিকট আগমন ও কৃপালাভের পর হইতেই ঠাকুর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দুই একবার কলিকাতায় কোন না কোন ভক্তের বাটীতে গমনাগমন করিতেন। নিয়মিত সময়ে কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে না পারিলে এবং অন্য কাহারও মুখে তাহার কুশল-সংবাদ না পাইলে কৃপাময় ঠাকুর স্বয়ং তাহাকে দেখিতে ছুটিতেন। আবার নিয়মিত সময়ে আসিলেও কাহাকেও কাহাকেও দেখিবার জন্য কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। তখন তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিতেন। কিন্তু সর্ব্ব সময়েই দেখা যাইত, তাঁহার ঐরূপ শুভাগমন সেই, সেই ভক্তের কল্যাণের জন্যই হইত। উহাতে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও স্বার্থ থাকিত না। বরাহনগরে বেণী সাহার কতকগুলি ভাল

ঐ ৩য় দৃষ্টান্ত—কাশীপুরে মাতাল দেখিয়া

ভাড়াটিয়া গাড়ী ছিল। ঠাকুর প্রায়ই কলিকাতা আসিতেন বলিয়া তাহার সহিত বন্দোবস্ত ছিল যে, ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে গাড়ী পাঠাইবে এবং কলিকাতা হইতে ফিরিতে যত রাত্রিই হউক না কেন গোলমাল করিবে না; অধিক সময়ের জন্ম নিয়মিত হারে অধিক ভাড়া পাইবে। প্রথমে মথুর বাবু, পরে পানিহাটির মণি সেন, পরে শম্ভু মল্লিক এবং তৎপরে কলিকাতা সিঁদুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ঠাকুরের ঐ সকল গাড়ী-ভাড়ার খরচ যোগাইতেন। তবে যাঁহার বাটীতে যাইতেন, পারিলে সেদিনকার গাড়ীভাড়া তিনিই দিতেন।

আজ ঠাকুর ঐরূপে কলিকাতায় যাইবেন—যদু মল্লিকের বাটীতে। মল্লিক মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন—তাঁহাকে দেখিয়া আসিবেন; কারণ, অনেক দিন তাঁহাদের কোন সংবাদ পান নাই। ঠাকুরের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, গাড়ী আসিয়াছে। এমন সময় আমাদের বন্ধু অ— কলিকাতা হইতে নৌকা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর অ—কে দেখিয়াই কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ। আজ আমি যদু মল্লিকের বাড়ীতে যাচ্চি; অমনি তোমাদের বাড়ীতেও নেবে একবার গি—কে দেখে যাব; সে কাজের ভিড়ে অনেক দিন এদিকে আসতে পারে নি। চল, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।" অ— সম্মত হইলেন। অ—র তখন ঠাকুরের সহিত নূতন আলাপ, কয়েকবার মাত্র নানা স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। আমরা যাহাকে তুচ্ছ, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য বা দর্শনযোগ্য বস্তু ও ব্যক্তি বলি সে সকলকে দেখিয়াও

যে অদ্ভুত ঠাকুরের ঈশ্বরোদ্দীপনায় ভাবসমাধি যেখানে সেখানে যখন তখন উপস্থিত হইয়া থাকে, অ— তাহা তখনও সবিশেষ জানিতে পারেন নাই।

এইবার ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। যুবক ভক্ত লাটু, যিনি এখন স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে সকলের পরিচিত, ঠাকুরের বেটুয়া, গামছাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন; আমাদের বন্ধু অ—ও উঠিলেন; গাড়ীর একদিকে ঠাকুর বসিলেন এবং অন্যদিকে লাটু মহারাজ ও অ— বসিলেন। গাড়ী ছাড়িল এবং ক্রমে বরাহনগরের বাজার ছাড়াইয়া মতিঝিলের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটিল না। ঠাকুর রাস্তায় এটা ওটা দেখিয়া কখন কখন বালকের ন্যায় লাটু বা অ—কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; অথবা একথা সেকথা তুলিয়া সাধারণ সহজ অবস্থায় যেরূপ হাস্য-পরিহাসাদি করিতেন, সেইরূপ করিতে করিতে চলিলেন।

মতিঝিলের দক্ষিণে একটি সামান্য বাজার গোছ ছিল; তাহার দক্ষিণে একখানি মদের দোকান, একটি ডাক্তারখানা এবং কয়েকখানি খোলার ঘরে চালের আড়ৎ, ঘোড়ার আস্তাবল ইত্যাদি ছিল। ঐ সকলের দক্ষিণেই এখানকার প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ দেবীস্থান ৺সর্ব্বমঙ্গলা ও ৺চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরে যাইবার প্রশস্ত পথ ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ পথটিকে দক্ষিণে রাখিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে হয়।

মদের দোকানে অনেকগুলি মাতাল তখন বসিয়া সুরাপান, গোলমাল ও হাস্য-পরিহাস করিতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ

আবার আনন্দে গান ধরিয়াছিল; আবার কেহ কেহ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেও ব্যাপৃত ছিল। আর দোকানের স্বত্বাধিকারী নিজ ভৃত্যকে তাহাদের সুরাবিক্রয় করিতে লাগাইয়া আপনি দোকানের দ্বারে অন্যমনে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কপালে বৃহৎ এক সিন্দূরের ফোঁটাও ছিল। এমন সময় ঠাকুরের গাড়ী দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। দোকানী বোধ হয় ঠাকুরের বিষয় জ্ঞাত ছিল; কারণ ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়াই হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

গোলমালে ঠাকুরের মন দোকানের দিকে আকৃষ্ট হইল এবং মাতালদের ঐরূপ আনন্দ-প্রকাশ তাঁহার চক্ষে পড়িল। কারণানন্দ দেখিয়াই অমনি ঠাকুরের মনে জগৎকারণের আনন্দস্বরূপের উদ্দীপনা!—খালি উদ্দীপনা নহে, সেই অবস্থার অনুভূতি আসিয়া ঠাকুর একেবারে নেশায় বিভোর, কথা এড়াইয়া যাইতেছে। আবার শুধু তাহাই নহে; সহসা নিজ শরীরের কিয়দংশ ও দক্ষিণ পদ বাহির করিয়া গাড়ীর পাদানে পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাতালের ন্যায় তাহাদের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বেশ হচ্ছে, খুব হচ্চে, বা, বা, বা!"

অ— বলেন, "ঠাকুরের যে সহসা ঐরূপ ভাব হইবে ইহার কোন আভাসই পূর্ব্বে আমরা পাই নাই; বেশ সহজ মানুষের মতই কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। মাতাল দেখিয়াই একেবারে হঠাৎ ঐ রকম অবস্থা! আমি তো ভয়ে আড়ষ্ট; তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে ধরিয়া গাড়ীর ভিতর তাঁহার শরীরটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে

বসাইব ভাবিয়া হাত বাড়াইয়াছি, এমন সময় লাটু বাধা দিয়া বলিল, 'কিছু করতে হবে না, উনি আপনা হ'তেই সামলাবেন, পড়ে যাবেন না।' কাজেই চুপ করিলাম, কিন্তু বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল; আর ভাবিলাম, এ পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে এক গাড়ীতে আসিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! আর কখনও আসিব না। অবশ্য এত কথা বলিতে যে সময় লাগিল, তদপেক্ষা ঢের অল্প সময়ের ভিতরই ঐ সব ঘটনা হইল এবং গাড়ীও ঐ দোকান ছাড়াইয়া চলিয়া আসিল। তখন ঠাকুরও পূর্ব্ববৎ গাড়ীর ভিতরে স্থির হইয়া বসিলেন এবং ৺সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর মন্দির দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'ঐ সর্ব্বমঙ্গলা, বড় জাগ্রত ঠাকুর, প্রণাম কর'। ইহা বলিয়া স্বয়ং প্রণাম করিলেন, আমরাও তাঁহার দেখাদেখি দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়া ঠাকুরের দিকে দেখিলাম—যেমন তেমনি, বেশ প্রকৃতিস্থ; মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আমার কিন্তু 'এখনি পড়িয়া গিয়া একটা খুনোখুনি ব্যাপার হইয়াছিল আর কি' ভাবিয়া সে বুক ঢিপ্-ঢিপানি অনেকক্ষণ থামিল না!

"তারপর গাড়ী বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া লাগিলে আমাকে বলিলেন, 'গি— বাড়ীতে আছে কি? দেখে এস দেখি।' আমিও জানিয়া আসিয়া বলিলাম, 'না।' তখন বলিলেন, 'তাই তো গি—র সঙ্গে দেখা হল না, ভেবেছিলাম তাকে আজকের বেশী ভাড়াটা দিতে বল্‌ব। তা তোমার সঙ্গে তো এখন জানা শুনা হয়েছে বাবু, তুমি একটা টাকা দেবে? কি জান, যদু মল্লিক কৃপণ লোক; সে সেই বরাদ্দ দু টাকা চার আনার বেশী গাড়ীভাড়া কখনও

দেবে না। আমার কিন্তু বাবু একে ওকে দেখে ফিরতে কত রাত হবে তা কে জানে? বেশী দেরী হলেই আবার গাড়োয়ান 'চল, চল' করে দিক্ করে। তাই বেণীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে, ফিরতে যত রাতই হোক না কেন, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোল করবে না। যদু দুই টাকা চার আনা দেবে, আর তুমি একটা টাকা দিলেই আজকের ভাড়ার আর কোন গোল রইল না; এই জন্যে বল্‌ছি।' আমি ঐ সব শুনে একটা টাকা লাটুর হাতে দিলাম এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। ঠাকুরও যদু মল্লিককে দেখিতে গেলেন।

ঠাকুরের এইরূপ বাহ্যদৃষ্টে মাতালের ন্যায় অবস্থা নিত্যই যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার কয়টা কথাই বা আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠককে বলিতে পারি!

দক্ষিণেশ্বরে আগত সকল সম্প্রদায়ের সাধুদেরই ঠাকুরের নিকটে ধর্ম্মবিষয়ে সহায়তা-লাভ

রাসমণির কালীবাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যত সাধু সাধক আসিতেন, তাঁহাদের কথা ঠাকুর ঐরূপে অনেক সময় অনেকের কাছেই গল্প করিতেন; কেবল যে আমাদের কাছেই করিয়াছিলেন তাহা নহে। ঐ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার এখনও অনেক লোক জীবিত। আমরা তখন সেণ্ট্‌ জেভিয়ার কলেজে পাঠ করি। সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবার দুই দিন কলেজ বন্ধ থাকিত। শনি ও রবিবারে ঠাকুরের নিকট অনেক ভক্তের ভিড় হইত বলিয়া আমরা বৃহস্পতিবারেও তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উহাতে তাঁহার জীবনের নানা কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিবার বেশ সুবিধা হইত। ঐ সকল কথা

শুনিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী স্বামিজী, মুসলমান গোবিন্দ—যিনি কৈবর্ত্ত-জাতীয় ছিলেন,[১] পূর্ণ নির্ব্বিকল্প ভূমিতে ছয়মাস থাকিবার সময় জোর করিয়া আহার করাইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিবার জন্য যে সাধুটি দৈবপ্রেরিত হইয়া কালীবাটীতে আগমন করেন, তিনি এবং ঐরূপ আরও দুই একটি ছাড়া নানা সম্প্রদায়ের অপর যত সাধু-সাধকসকল ঠাকুরের নিকটে আমরা যাইবার পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকেই ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক জীবনালোকের সহায়ে নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনে নবপ্রাণ-সঞ্চারলাভের জন্যই আসিয়াছিলেন এবং তল্লাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া ঐ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু সাধকসকলকে সেই সেই পথ দিয়া কেমন করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে হইবে, তাহাই দেখাইবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিখিতেই আসিয়াছিলেন এবং শিক্ষা পূর্ণ করিয়া যে যাঁহার স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং তোতাপুরী প্রভৃতিও বহুভাগ্যে ঠাকুরের ধর্ম্মজীবনের সহায়ক-স্বরূপে আগমন করিলেও এতকাল ধরিয়া সাধনা করিয়াও নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনে যে সকল নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না, ঠাকুরের অলৌকিক জীবন ও শক্তিবলে সে সকল প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিলেন।

আবার এই সকল সাধু ও সাধকদিগের দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আগমনের ক্রম বা পারম্পর্য্য আলোচনা করিলে আর

---

১ সাধকভাব (১০ম সংস্করণ) ৩৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

৬

একটি বিশেষ সত্যের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না। তাঁহাদের ঐরূপ আগমনক্রমের কথা আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঠাকুরের শ্রীমুখে যেমন শুনিয়াছিলাম, সেই ভাবে যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় তিনি যেমন করিয়া ঐ সকল কথা আমাদের বলিয়াছিলেন, সেই প্রকারে ঐ সকল কথা পাঠককে বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি এক এক ভাবের উপাসনা ও সাধনায় লাগিয়া ঈশ্বরের ঐ ঐ ভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যেমন যেমন করিতেন, অমনি সেই সেই সম্প্রদায়ের যথার্থ সাধকেরা সেই সেই সময়ে দলে দলে তাঁহার নিকট কিছুকাল ধরিয়া আগমন করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের ঐ ঐ ভাবের আলোচনায় তখন দিবা-রাত্রি কাটিয়া যাইত। রামমন্ত্রের উপাসনায় যেমন সিদ্ধি-লাভ করিলেন, অমনি দলে দলে রামাইৎ সাধুরা তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত শান্ত দাস্যাদি এক-একটি ভাবে যেমন যেমন সিদ্ধিলাভ করিলেন, অমনি সেই সেই ভাবের সাধকদিগের আগমন হইতে লাগিল। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়ে চৌষট্টিখানা তন্ত্রোক্ত সকল সাধন যখন সাঙ্গ করিয়া ফেলিলেন বা শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন, অমনি সে সময়ের এ প্রদেশের যাবতীয় বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকসকল তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। পুরী গোস্বামীর সহায়ে অদ্বৈতমতের ব্রহ্মোপাসনা ও উপলব্ধিতে যেমন সিদ্ধিলাভ করিলেন, অমনি

ঠাকুর যে ধর্ম্মমতে যখন সিদ্ধিলাভ করিতেন তখন ঐ সম্প্রদায়ের সাধুরাই তাঁহার নিকট আসিত

পরমহংস সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সাধকেরা তাঁহার সমীপে দলে দলে আগমন করিতে লাগিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধককুলের ঐ ভাবে ঐ ঐ সময়ে ঠাকুরের দেবসঙ্গ-লাভ করিবার যে একটা বিশেষ গূঢ় অর্থ আছে তাহা বালকেরও বুঝিতে দেরি লাগিবে না। যুগাবতারের শুভাগমনে জগতে সর্ব্বকালেই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইবে। তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় নিয়মানুসারে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য বা নির্ব্বাপিতপ্রায় ধর্ম্মালোককে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সর্ব্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের জীবনালোচনায় তাঁহাদের ভিতরে অল্পাধিক পরিমাণে শক্তিপ্রকাশের তারতম্য দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কেহ বা কোন প্রদেশ-বিশেষের বা দুই চারিটি সম্প্রদায়-বিশেষের অভাব-মোচনের জন্য আগমন করিয়াছেন; আবার কেহ বা সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মাভাব মোচনের জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষি, আচার্য্য ও অবতারকুলের দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত আধ্যাত্মিক মত সকলের মর্য্যাদা সম্যক রক্ষা করিয়া সে সকলকে বজায় রাখিয়া নিজ নিজ আবিষ্কৃত উপলব্ধি ও মতের প্রচার করিয়াছেন, দেখা গিয়া থাকে। কারণ তাঁহারা তাহাদের দিব্যযোগশক্তিবলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের আধ্যাত্মিক মতসকলের ভিতর একটা পারম্পর্য্য ও সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়া

সকল অবতার-পুরুষে সমান শক্তি-প্রকাশ দেখা যায় না। কারণ তাঁহাদের কেহ বা জাতিবিশেষকে ও কেহ বা সমগ্র মানবজাতিকে ধর্ম্মদান করিতে আসেন

থাকেন। আমাদের বিষয়-মলিন দৃষ্টির সম্মুখে ভাবরাজ্যের সে ইতিহাস, সে সম্বন্ধ সর্ব্বথা অপ্রকাশিতই থাকে। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মমত-সকলকে 'সূত্রে মণিগণা ইব' এক সূত্রে গাঁথা দেখিতে পান এবং নিজ ধর্ম্মোপলব্ধি-সহায়ে সেই মালার অঙ্গই সম্পূর্ণ করিয়া যান।

বৈদেশিক ধর্ম্মমতসকলের আলোচনায় এ বিষয়টি আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। দেখ, য়াহুদি আচার্য্যেরা যে সকল ধর্ম্মবিষয়ক সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, ঈশা আসিয়া সে সকল বজায় রাখিয়া নিজোপলব্ধ সত্যসকল প্রচার করিলেন। আবার কয়েক শতাব্দী পরে মহম্মদ আসিয়া ঈশা-প্রচারিত মতসকল বজায় রাখিয়া নিজ মত প্রচার করিলেন। ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে য়াহুদি আচার্য্যগণ বা ঈশা-প্রচারিত মত অসম্পূর্ণ; বা ঐ ঐ মতাবলম্বনে চলিয়া তাঁহারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের যে ভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা করা যায় না; তাহা নিশ্চয়ই করা যায়, আবার মহম্মদ-প্রচারিত মতাবলম্বনে চলিয়া তিনি যে ভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাও করা যায়। আধ্যাত্মিক জগতের সর্ব্বত্র ইহাই নিয়ম। ভারতীয় ধর্ম্মমতসকলের মধ্যেও ঐরূপ ভাব বুঝিতে হইবে। ভারতের বৈদিক ঋষি, পুরাণকার এবং তন্ত্রকার আচার্য্য মহাপুরুষেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের যেটি যেটি ঠিক ঠিক অবলম্বন করিয়া তুমি চলিবে, সেই সেই পথ দিয়াই

হিন্দু, য়াহুদি, ক্রীশ্চান ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অবতার-পুরুষদিগের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশের সহিত ঠাকুরের ঐ বিষয়ে তুলনা

ঈশ্বরের তত্তদ্ভাবের উপলব্ধি করিতে পারিবে। ঠাকুর একাদিক্রমে সকল সম্প্রদায়োক্ত মতে সাধনায় লাগিয়া উহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহাই আমাদের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ফুল ফুটিলে ভ্রমর আসিয়া জুটে—আধ্যাত্মিক জগতে যে ইহাই নিয়ম, ঠাকুর সে কথা আমাদের বারংবার বলিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুরের নিকট সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সাধকদিগের আগমন-কারণ

ঐ নিয়মেই, অবতার-মহাপুরুষদিগের জীবনে যখনই সিদ্ধিলাভ বা আধ্যাত্মিক জগতের সত্যোপলব্ধি, অমনি উহা জানিবার শিখিবার জন্য ধর্ম্মপিপাসুগণের তাঁহাদিগের নিকট আকৃষ্ট হওয়া—ইহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের নিকটে একই সম্প্রদায়ের সাধককূল না আসিয়া যে, সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরাই দলে দলে আসিয়াছিলেন তাহার কারণ—তিনি তত্তৎ সকল পথ দিয়াই অগ্রসর হইয়া তত্তৎ ঈশ্বরীয় ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ঐ ঐ পথের সংবাদ বিশেষরূপে বলিতে পারিতেন। তবে ঐ সকল সাধকদিগের সকলেই যে নিজ নিজ মতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহাদের ভিতর যাঁহারা বিশিষ্ট তাঁহারাই উহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই ঠাকুরের দিব্যসঙ্গগুণে নিজ নিজ পথে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ঐ পথ দিয়া চলিলে যে কালে ঈশ্বরকে লাভ করিবেন নিশ্চয়, ইহা ধ্রুবসত্যরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিজ নিজ পথের উপর ঐরূপ বিশ্বাসের হানি হওয়াতেই যে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত

হয় এবং সাধক নিজ জীবনে ধর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারে না, ইহা আর বলিতে হইবে না।

দক্ষিণেশ্বরাগত সাধুদিগের সঙ্গ-লাভেই ঠাকুরের ভিতর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে—একথা সত্য নহে

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে যে, ঠাকুর ঐ সকল সাধুদের নিকট হইতেই ঈশ্বর-সাধনার উপায়সকল জানিয়া লইয়া স্বয়ং উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং তপস্যার কঠোরতায় এক সময়ে সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল এবং কোনরূপ ভাবের আতিশয্যে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া-রূপ একটা শারীরিক রোগও চিরকালের মত তাঁহার শরীরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। হে ভগবান, এমন পণ্ডিত-মূর্খের দলও আমরা! পূর্ণ চিত্তৈকাগ্রতা সহায়ে সমাধি-ভূমিতে আরোহণ করিলেই যে সাধারণ বাহ্যচৈতন্যের লোপ হয়, একথা ভারতের ঋষিকুল বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদিসহায়ে আমাদের যুগে যুগে বুঝাইয়া আসিলেন ও নিজ নিজ জীবনে উহা দেখাইয়া যাইলেন, সমাধি-শাস্ত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা—যাহা পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতির ভিতরেই বিদ্যমান নাই—আমাদের জন্য রাখিয়া যাইলেন; সংসারে এ পর্য্যন্ত অবতার বলিয়া সর্ব্বদেশে মানব-হৃদয়ের শ্রদ্ধা পাইতেছেন যত মহাপুরুষ তাঁহারাও নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া ঐরূপ বাহ্যজ্ঞানলোপটা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত অবশ্যম্ভাবী, সে কথা আমাদের ভূয়োভূয়ঃ বুঝাইয়া যাইলেন, তথাপি যদি আমরা ঐ কথা বলি এবং ঐরূপ কথা শুনি, তবে আর আমাদের দশা কি হইবে? হে পাঠক, ভাল বুঝ তো তুমি ঐ সকল অন্তঃসারশূন্য কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর; তোমার

এবং যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহাদের মঙ্গল হউক ! আমাদের কিন্তু এ অদ্ভুত দিব্য পাগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিবার স্বাধীনতাটুকু কৃপা করিয়া প্রদান করিও, ইহাই তোমার নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বা ভিক্ষা ! কিন্তু যাহা হয় একটা স্থিরনিশ্চয় করিবার অগ্রে ভাল করিয়া আর একবার বুঝিয়া দেখিও ; প্রাচীন উপনিষৎকার যেমন বলিয়াছেন, সেরূপ অবস্থা তোমার না আসিয়া উপস্থিত হয় !—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্যমানাঃ ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥

ঠাকুরের ভাবসমাধিসমূহকে যোগবিশেষ বলাটা আজ কিছু নূতন কথা নহে। তাঁহার বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত অনেকে ওকথা বলিতেন। পরে যত দিন যাইতে লাগিল এবং এ দিব্য পাগলের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে উচ্চারিত পাগলামিগুলি যতই পূর্ণ হইতে লাগিল এবং তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবগুলি পৃথিবীময় সাধারণে যতই সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল, ততই ও কথাটার আর জোর থাকিল না। চন্দ্রে ধূলিনিক্ষেপের যে ফল হয় তাহাই হইল এবং লোকে ঐ সকল ভ্রান্ত উক্তির সম্যক্ পরিচয় পাইয়া ঠাকুরের কথাই সত্য জানিয়া স্থির হইয়া রহিল। এখনও তাহাই হইবে। কারণ সত্য কখনও অগ্নির ন্যায় বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা যায় না। অতএব ঐ বিষয়ে আর আমাদের বুঝাইবার প্রয়াসের আবশ্যক নাই। ঠাকুর নিজেই ঐ সম্বন্ধে যে দু' একটি কথা বলিতেন, তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগের মধ্যে অন্যতম, শ্রদ্ধাস্পদ

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের ভাবসমাধিটা স্নায়ুবিকার-প্রসূত রোগবিশেষ (hysteria or epileptic fits) বলিয়া তখন হইতেই আমাদের কাহারও কাহারও নিকট নির্দ্দেশ করিতেন এবং ঐ সঙ্গে এরূপ মতও প্রকাশ করিতেন যে, ঐ সময়ে ঠাকুর ইতর সাধারণে ঐ রোগগ্রস্ত হইয়া যেমন অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ হইয়া যান! ঠাকুরের কর্ণে ক্রমে সে কথা উঠে। শাস্ত্রীমহাশয় বহুপূর্ব্ব হইতে ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। একদিন তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত আছেন, তখন ঠাকুর ঐ কথা উত্থাপিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেন, "হ্যাঁ শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বল যে ঐ সময়ে অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকাকড়ি এই সব জড় জিনিসগুলোতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ সংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে, তাঁকে দিনরাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম! এ কোন্‌দিশি বুদ্ধি তোমার?" শিবনাথ বাবু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

ঠাকুরের সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান লোপ হওয়াটা ব্যাধি নহে। প্রমাণ—ঠাকুর ও শিবনাথ-সংবাদ

ঠাকুর 'দিব্যোন্মাদ', 'জ্ঞানোন্মাদ' প্রভৃতি কথার আমাদের নিকট নিত্য প্রয়োগ করিতেন এবং মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট বলিতেন যে, তাঁহার জীবনে বার বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। বলিতেন, "ঝড়ে ধূলো উড়ে যেমন সব একাকার দেখায়—এটা আমগাছ, ওটা কাঁটালগাছ বলে বুঝা দূরে থাক্, দেখাও যায় না, সেই রকমটা হয়েছিল রে; ভালমন্দ, নিন্দা-স্তুতি,

সাধনকালে ঠাকুরের উন্মত্তবৎ আচরণের কারণ

শৌচ-অশৌচ এ সকলের কোনটাই বুঝতে দেয় নি! কেবল এক চিন্তা, এক ভাব—কেমন করে তাঁকে পাব, এইটেই মনে সদা-সর্ব্বক্ষণ থাকত! লোকে বলতো—পাগল হয়েছে!" যাক্ এখন সে কথা, আমরা পূর্ব্বানুসরণ করি।

দক্ষিণেশ্বরে তখন তখন যে সকল সাধক পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতর কেহ কেহ আবার ভক্তির আতিশয্যে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস পর্য্যন্ত লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী উঁহাদেরই অন্যতম। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, নারায়ণ শাস্ত্রী প্রাচীন যুগের নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর স্বাধ্যায় বা নানাশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ষড় দর্শনের সকলগুলির উপরই সমান অভিজ্ঞতা ও আধিপত্য লাভ করিবার প্রবল বাসনা বরাবর তাঁহার প্রাণে ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে নানা গুরুগৃহে বাস করিয়া পাঁচটি দর্শন তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের অধীনে ন্যায়-দর্শনের পাঠ সাঙ্গ না করিলে ন্যায়দর্শনে পূর্ণাধিপত্য লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকমধ্যে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব, এজন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিবার প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আগমন করেন এবং সাত বৎসর কাল নবদ্বীপে থাকিয়া ন্যায়ের পাঠ সাঙ্গ করেন। এইবার দেশে ফিরিয়া যাইবেন। আবার এদিকে কখনও আসিবেন কি না সন্দেহ, এইজন্যই

দক্ষিণেশ্বরাগত সাধকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের নিকট দীক্ষাও গ্রহণ করেন, যথা—নারায়ণ শাস্ত্রী

বোধ হয় কলিকাতা এবং তৎসন্নিকট দক্ষিণেশ্বরদর্শনে আসিয়া ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন।

শাস্ত্রীজীর পূর্ব্বকথা

বঙ্গদেশে ন্যায় পড়িতে আসিবার পূর্ব্বেই শাস্ত্রীজীর দেশে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছি, এক সময়ে জয়পুরের মহারাজ শাস্ত্রীজীর নাম শুনিয়া সভাপণ্ডিত করিয়া রাখিবেন বলিয়া উচ্চহারে বেতন নিরূপিত করিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীজীর তখনও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা কমে নাই এবং ষড়্দর্শন আয়ত্ত করিবার প্রবল আগ্রহও মিটে নাই। কাজেই তিনি মহারাজের সাদরাহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাস্ত্রীর পূর্ব্বাবাস রাজপুতানা অঞ্চলের নিকটে বলিয়াই আমাদের অনুমান।

ঐ পাঠ সাঙ্গ ও ঠাকুরের দর্শনলাভ

এদিকে আবার নারায়ণ শাস্ত্রী সাধারণ পণ্ডিতদিগের মত ছিলেন না। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে অল্পে অল্পে বৈরাগ্যের উদয় হইতেছিল। কেবল পাঠ করিয়াই যে বেদান্তাদি শাস্ত্রে কাহারও দখল জন্মিতে পারে না, উহা যে সাধনার জিনিস তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেজন্য পাঠ সাঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার এক একবার মনে উঠিত—এরূপে ত ঠিক ঠিক জ্ঞানলাভ হইতেছে না, কিছুদিন সাধনাদি করিয়া শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিব। আবার একটা বিষয় আয়ত্ত করিতে বসিয়াছেন, সেটাকে অর্দ্ধপথে ছাড়িয়া সাধনাদি করিতে যাইলে পাছে এদিক

ওদিক দুই দিক যায়, সেজন্য সাধনায় লাগিবার বাসনাটা চাপিয়া আবার পাঠেই মনোনিবেশ করিতেন। এইবার তাঁহার এতকালের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, ষড়দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; এখন দেশে ফিরিবার বাসনা। সেখানে ফিরিয়া যাহা হয় একটা করিবেন, এই কথা মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এমন সময়ে তাঁহার ঠাকুরের সহিত দেখা এবং দেখিয়াই কি জানি কেন তাঁহাকে ভাল লাগা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তখন তখন অতিথি, ফকির, সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতদের থাকিবার এবং খাইবার বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। শাস্ত্রীজী একে বিদেশী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার সুপণ্ডিত, কাজেই তাঁহাকে যে ওখানে সসম্মানে তাঁহার যতদিন ইচ্ছা থাকিতে দেওয়া হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আহারাদি সকল বিষয়ের অনুকূল এমন রমণীয় স্থানে এমন দেবমানবের সঙ্গ! শাস্ত্রীজী কিছুকাল এখানে কাটাইয়া যাইবেন স্থির করিলেন। আর না করিয়াই বা করেন কি? ঠাকুরের সহিত যতই পরিচয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রতি কেমন একটা ভক্তি-ভালবাসার উদয় হইয়া তাঁহাকে আরও বিশেষভাবে দেখিতে জানিতে ইচ্ছা দিন দিন শাস্ত্রীর প্রবল হইতে লাগিল। ঠাকুরও সরলহৃদয় উন্নতচেতা শাস্ত্রীকে পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় কথায় কাটাইতে লাগিলেন।

শাস্ত্রীজী বেদান্তোক্ত সপ্তভূমিকার কথা পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্র-দৃষ্টে জানিতেন, একটির পর একটি করিয়া নিম্ন হইতে উচ্চ

উচ্চতর ভূমিকায় যেমন যেমন মন উঠিতে থাকে অমনি বিচিত্র বিচিত্র উপলব্ধি ও দর্শন হইতে হইতে শেষে নির্ব্বিকল্পসমাধি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঐ অবস্থায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে তন্ময় হইয়া মানবের যুগযুগান্তরাগত সংসারভ্রম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। শাস্ত্রী দেখিলেন, তিনি যে সকল কথা শাস্ত্রে পড়িয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন মাত্র, ঠাকুর সেই সকল জীবনে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেখিলেন—'সমাধি', 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রভৃতি যে সকল কথা তিনি উচ্চারণমাত্রই করিয়া থাকেন, ঠাকুরের সেই সমাধি দিবারাত্রি যখন তখন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে হইতেছে। শাস্ত্রী ভাবিলেন, 'এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ জানাইবার বুঝাইবার এমন লোক আর কোথায় পাইব? এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। যেরূপে হউক ইঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভের উপায় করিতে হইবে। মরণের তো নিশ্চয়তা নাই—কে জানে কবে এ শরীর যাইবে। ঠিক ঠিক জ্ঞানলাভ না করিয়া মরিব? তাহা হইবে না। একবার তল্লাভে চেষ্টাও অন্ততঃ করিতে হইবে। রহিল এখন দেশে ফেরা।'

ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে শাস্ত্রীর সঙ্কল্প

দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, শাস্ত্রীর বৈরাগ্যব্যাকুলতাও ততই ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পাণ্ডিত্যে সকলকে চমৎকার করিব, মহামহোপাধ্যায় হইয়া সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নাম যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিব—এ সকল বাসনা তুচ্ছ হেয় জ্ঞান হইয়া মন হইতে

শাস্ত্রীর বৈরাগ্যোদয়

একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শাস্ত্রী যথার্থ দীনভাবে শিষ্যের ন্যায় ঠাকুরের নিকট থাকেন এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাক্যাবলী একচিত্তে শ্রবণ করিয়া ভাবেন--আর অন্য কোন বিষয়ে মন দেওয়া হইবে না; কবে কখন শরীরটা যাইবে তাহার স্থিরতা নাই; এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দেখিয়া ভাবেন—'আহা, ইনি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহা জানিবার বুঝিবার, তাহা বুঝিয়া কেমন নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন! মৃত্যুও ইঁহার নিকট পরাজিত; 'মহারাত্রির' করাল ছায়া সম্মুখে ধরিয়া ইতরসাধারণের ন্যায় ইঁহাকে আর অকূল পাথার দেখাইতে পারে না। আচ্ছা, উপনিষৎকার তো বলিয়াছেন এরূপ মহাপুরুষ সিদ্ধ-সংকল্প হন; ইঁহাদের ঠিক ঠিক কৃপা লাভ করিতে পারিলে মানবের সংসার-বাসনা মিটিয়া যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। তবে ইঁহাকে কেন ধরি না; ইঁহারই কেন শরণ গ্রহণ করি না?' শাস্ত্রী মনে মনে এইরূপ জল্পনা করেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে থাকেন। কিন্তু পাছে ঠাকুর অযোগ্য ভাবিয়া আশ্রয় না দেন এজন্য সহসা তাঁহাকে কিছু বলিতে পারেন না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

শাস্ত্রীর মাইকেল মধুসূদনের সহিত আলাপে বিরক্তি

শাস্ত্রীর মনে দিন দিন যে সংসার-বৈরাগ্য তীব্রভাব ধারণ করিতেছিল, ইহার পরিচয় আমরা নিম্নের ঘটনাটি হইতে বেশ পাইয়া থাকি। এই সময়ে রাসমণির তরফ হইতে কি একটি মকদ্দমা চালাইবার ভার বঙ্গের কবিকুলগৌরব শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মকদ্দমার সকল বিষয় যথাযথ জানিবার জন্য তাঁহাকে রাণীর কোন বংশধরের সহিত একদিন

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিতে হইয়াছিল। মকদ্দমাসংক্রান্ত সকল বিষয় জানিবার পর এ কথা সে কথায় তিনি ঠাকুর এখানে আছেন জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া হইলে ঠাকুর মধুসূদনের সহিত আলাপ করিতে প্রথম শাস্ত্রীকেই পাঠান এবং পরে আপনিও তথায় উপস্থিত হন। শাস্ত্রীজী মধুসূদনের সহিত আলাপ করিতে করিতে তাঁহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঈশার ধর্ম্মাবলম্বনের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। মাইকেল তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পেটের দায়েই ঐরূপ করিয়াছেন। মধুসূদন অপরিচিত পুরুষের নিকট আত্মকথা খুলিয়া বলিতে অনিচ্ছুক হইয়া ঐ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ঠাকুর এবং উপস্থিত সকলেরই মনে হইয়াছিল তিনি আত্মগোপন করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে যে ঐরূপ বলিলেন তাহা নহে, যথার্থ প্রাণের ভাবই বলিতেছেন। যাহাই হউক, ঐরূপ উত্তর শুনিয়া শাস্ত্রীজী তাঁহার উপর বিষম বিরক্ত হন; বলেন—"কি! এই দুই দিনের সংসারে পেটের দায়ে নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা? এ কি হীন বুদ্ধি! মরিতে তো এক দিন হইবেই—না হয় মরিয়াই যাইতেন।" ইহাকেই আবার লোকে বড় লোক বলে এবং ইহার গ্রন্থ আদর করিয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া শাস্ত্রীজীর মনে বিষম ঘৃণার উদয় হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত আর অধিক বাক্যালাপে বিরত হন।

অতঃপর মধুসূদন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে কিছু ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুর আমাদের বলিতেন—

"(আমার) মুখ যেন কে চেপে ধর্‌লে, কিছু বল্‌তে দিলে না।"

ঠাকুর ও মাইকেল সংবাদ

হৃদয় প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ঐ ভাব চলিয়া গিয়াছিল এবং তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকদিগের কয়েকটি পদাবলী মধুর স্বরে গাহিয়া মধুসূদনের মন মোহিত করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যপদেশে তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তিই যে সংসারে একমাত্র সার পদার্থ তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মাইকেল বিদায় গ্রহণ করিবার পরেও শাস্ত্রীজী মাইকেলের ঐরূপে স্বধর্ম্মত্যাগের কথা আলোচনা করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন

শাস্ত্রীর নিজ মত দেয়ালে লিখিয়া রাখা

এবং পেটের দায়ে স্বধর্ম্মত্যাগ করা যে অতি হীন-বুদ্ধির কাজ, একথা ঠাকুরের ঘরে ঢুকিবার দরজার পূর্ব্বদিকের দালানের দেয়ালের গায়ে একখণ্ড কয়লা দিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখেন। দেয়ালের গায়ে সুস্পষ্ট বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা শাস্ত্রীর ঐ বিষয়ক মনোভাব আমাদের অনেকেরই নজরে পড়িয়া আমাদিগকে কৌতূহলাক্রান্ত করিত। পরে একদিন জিজ্ঞাসায় সকল কথা জানিতে পারিলাম। শাস্ত্রী অনেক দিন এদেশে থাকায় বাঙ্গালা ভাষা বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এইবার শাস্ত্রীর জীবনের শেষ কথা। সুযোগ বুঝিয়া শাস্ত্রীজী

শাস্ত্রীর সন্ন্যাসগ্রহণ ও তপস্যা

একদিন ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলেন এবং 'নাছোড়বান্দা' হইয়া ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতে হইবে। ঠাকুরও তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে সম্মত হইয়া শুভদিনে তাঁহাকে ঐ

দীক্ষাপ্রদান করিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রী আর কালী-বাটীতে রহিলেন না। বশিষ্ঠাশ্রমে বসিয়া সিদ্ধকাম না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপলব্ধির চেষ্টায় প্রাণপাত করিবেন বলিয়া ঠাকুরের নিকট মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন এবং সজলনয়নে তাঁহার আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা ও শ্রীচরণবন্দনান্তে চিরদিনের মত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; ইহার পর নারায়ণ শাস্ত্রীর কোনও নিশ্চিত সংবাদই আর পাওয়া গেল না। কেহ কেহ বলেন, বশিষ্ঠাশ্রমে অবস্থান করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে করিতে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত হয় এবং ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

আবার যথার্থ সাধু, সাধক বা ভগবদ্ভক্ত, যে কোনও সম্প্রদায়ের হউন না কেন, কোনও স্থানে বাস করিতেছেন শুনিলেই ঠাকুরের তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইত এবং ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হইলে অযাচিত হইয়াও তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে কিছুকাল কাটাইয়া আসিতেন। লোকে ভাল বা মন্দ বলিবে, অপরিচিত সাধক তাঁহার যাওয়ায় সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, আপনি তথায় যথাযথ সম্মানিত হইবেন কি না—এসকল চিন্তার একটিরও তখন আর তাঁহার মনে উদয় হইত না। কোনরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত সাধক কি ভাবের লোক ও নিজ গন্তব্য পথে কতদূরই বা অগ্রসর হইয়াছেন ইত্যাদি সকল কথা জানিয়া, বুঝিয়া, একটা স্থির মীমাংসায় উপনীত হইয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিতদিগের কথা শুনিলেও ঠাকুর অনেক সময় ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

সাধু ও সাধকদিগকে দেখিতে যাওয়া ঠাকুরের স্বভাব ছিল

প্রভৃতি অনেককে ঠাকুর ঐভাবে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কথা আমাদিগকে অনেক সময় গল্পচ্ছলে বলিতেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত পদ্মলোচনের কথাই আমরা এখন পাঠককে বলিতেছি।

বঙ্গে ন্যায়ের প্রবেশ-কারণ

ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বেদান্তশাস্ত্রের চর্চ্চা অতীব বিরল ছিল। আচার্য্য শঙ্কর বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের তান্ত্রিকদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিলেও সাধারণে নিজমত বড় একটা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফলে এদেশের তন্ত্র অদ্বৈতভাবরূপ বেদান্তের মূল তত্ত্বটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া নিজ উপাসনা-প্রণালীর ভিতর উহার কিছু কিছু প্রবিষ্ট করাইয়া জনসাধারণে পূর্ব্ববৎ পূজাদির প্রচার করিতেই থাকে এবং বাঙ্গালার পণ্ডিতগণ ন্যায়দর্শনের আলোচনাতেই নিজ উর্ব্বর মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে থাকিয়া কালে নব্য ন্যায়ের সৃজন করতঃ উক্ত দর্শনের রাজ্যে অদ্ভুত যুগবিপর্য্যয় আনয়ন করেন। আচার্য্য শঙ্করের নিকট তর্কে পরাজিত ও অপদস্থ হইয়াই কি বাঙ্গালী জাতির ভিতর তর্কশাস্ত্রের আলোচনা এত অধিক বাড়িয়া যায়—কে বলিবে? তবে জাতিবিশেষের নিকট কোন বিষয়ে পরাজিত হইয়া অভিমানে অপমানে পরাজিত জাতির ভিতর ঐ বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টার উদয় জগৎ অনেকবার দেখিয়াছে।

তন্ত্র ও ন্যায়ের রঙ্গভূমি বঙ্গে ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বেদান্তচর্চ্চা ঐরূপে বিরল থাকিলেও, কেহ কেহ যে উহার উদার

মীমাংসা-সকলের অনুশীলনে আকৃষ্ট হইতেন না, তাহা নহে।

বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচন

পণ্ডিত পদ্মলোচন ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। ন্যায়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবার পর পণ্ডিতজীর বেদান্ত-দর্শন-পাঠে ইচ্ছা হয় এবং তজ্জন্য ৺কাশীধামে গমন করিয়া গুরুগৃহে বাসকরতঃ তিনি দীর্ঘকাল ঐ দর্শনের চর্চ্চায় কালাতিপাত করেন। ফলে কয়েক বৎসর পরেই তিনি বৈদান্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং দেশে আগমন করিবার পর বর্দ্ধমানাধিপের দ্বারা আহূত হইয়া তদীয় সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। পণ্ডিতজীর অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বর্দ্ধমানরাজ তাঁহাকে ক্রমে প্রধান সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার সুযশ বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়।

পণ্ডিতজীর অদ্ভুত প্রতিভা সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ে একদেশী ভাব বুদ্ধি-

পণ্ডিতের অদ্ভুত প্রতিভার দৃষ্টান্ত

হীনতা হইতেই উপস্থিত হয়—এই প্রসঙ্গে ঠাকুর পণ্ডিতজীর ঐ কথা কখন কখন আমাদের নিকট উল্লেখ করিতেন। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ ঠাকুর কাহারও নিকট হইতে কখন কোন মনোমত উদারভাব-প্রকাশক কথা শুনিলে উহা স্মরণ করিয়া রাখিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে উহার উল্লেখকালে যাহার নিকটে তিনি উহা প্রথম শুনিয়াছিলেন তাহার নামটিও বলিতেন।

ঠাকুর বলিতেন, বর্দ্ধমান-রাজসভায় পণ্ডিতদিগের ভিতর 'শিব বড় কি বিষ্ণু বড়'—এই কথা লইয়া এক সময়ে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত পদ্মলোচন তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন

না। উপস্থিত পণ্ডিতসকল নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান, ও বোধ হয় অভিরুচির সহায়ে কেহ এক দেবতাকে আবার কেহ বা অন্য দেবতাকে বড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বিষম কোলাহল উপস্থিত করিলেন। এইরূপে শৈব ও বৈষ্ণব উভয়পক্ষে দ্বন্দ্বই চলিতে লাগিল, কিন্তু কথাটার একটা সুমীমাংসা আর পাওয়া গেল না। কাজেই প্রধান সভা-পণ্ডিতকে তখন উহার মীমাংসা করিবার জন্য ডাক পড়িল। পণ্ডিত পদ্মলোচন সভাতে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন শুনিয়াই বলিলেন, "আমার চৌদ্দপুরুষে কেহ শিবকেও কখন দেখে নি, বিষ্ণুকেও কখন দেখে নি; অতএব কে বড় কে ছোট, তা কেমন করে বলবো? তবে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাও তো এই বলতে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বাড়িয়াছে; অতএব যার যে ইষ্ট, তার কাছে সেই দেবতাই অন্য সকল দেবতা অপেক্ষা বড়।" এই বলিয়া পণ্ডিতজী শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই সর্ব্বদেবতাপেক্ষা প্রাধান্যসূচক শ্লোকগুলি প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া উভয়কেই সমান বড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। পণ্ডিজীর ঐরূপ সিদ্ধান্তে তখন বিবাদ মিটিয়া গেল এবং সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজীর ঐরূপ আড়ম্বরশূন্য সরল শাস্ত্রজ্ঞান ও স্পষ্টবাদিত্বেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আমরা বিলক্ষণ পাইয়া থাকি এবং তাঁহার এত সুনাম ও প্রসিদ্ধি যে কেন হইয়াছিল, তাহার কারণ বুঝিতে পারি।

'শিব বড় কি বিষ্ণু বড়'

শব্দজালরূপ মহারণ্যে বহুদূর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে পণ্ডিতজীর এত সুখ্যাতি-লাভ হইয়াছিল তাহা নহে। লোকে

দৈনন্দিন জীবনেও তাঁহাতে সদাচার, ইষ্টনিষ্ঠা, তপস্যা, উদারতা, নির্লিপ্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট সাধক বা ঈশ্বর-প্রেমিক বলিয়া স্থির করিয়াছিল। যথার্থ পাণ্ডিত্য ও গভীর ঈশ্বরভক্তির একত্র সমাবেশ সংসারে দুর্লভ; অতএব তদুভয় কোথাও একত্র পাইলে লোকে ঐ পাত্রের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। অতএব লোক-পরম্পরায় ঐ সকল কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুরের ঐ সুপুরুষকে যে দেখিতে ইচ্ছা হইবে, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ঠাকুরের মনে যখন ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয়, তখন পণ্ডিতজী প্রৌঢ়াবস্থা প্রায় অতিক্রম করিতে চলিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান-রাজসরকারে অনেককাল সসম্মানে নিযুক্ত আছেন।

পণ্ডিতের ঈশ্বরানুরাগ

ঠাকুরের মনে যখনি যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইত, তখনি তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বালকের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। 'জীবন ক্ষণস্থায়ী, যাহা করিবার শীঘ্র করিয়া লও'—বাল্যাবধি মনকে ঐ কথা বুঝাইয়া তীব্র অনুরাগে সকল কার্য্য করিবার ফলেই বোধ হয় ঠাকুরের মনের ঐরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। আবার একনিষ্ঠা ও একাগ্রতা-অভ্যাসের ফলেও যে মন ঐরূপ স্বভাবাপন্ন হয়, এ কথা অল্প চিন্তাতেই বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহাকে বর্দ্ধমানে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল পণ্ডিত পদ্মলোচনের শরীর দীর্ঘকাল অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে আরিয়াদহের নিকট গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি বাগানে

ঠাকুরের মনের স্বভাব ও পণ্ডিতের কলিকাতায় আগমন

বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং গঙ্গার নির্ম্মল বায়ু-সেবনে তাঁহার শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল আছে। সংবাদ যথার্থ কি না, জানিবার জন্য হৃদয় প্রেরিত হইল।

হৃদয় ফিরিয়া সংবাদ দিল—কথা যথার্থ, পণ্ডিতজী ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং হৃদয়কে তাঁহার আত্মীয় জানিয়া বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। তখন দিন স্থির হইল। ঠাকুর পণ্ডিতজীকে দেখিতে চলিলেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে চলিল।

হৃদয় বলেন, প্রথম মিলন হইতেই ঠাকুর ও পণ্ডিতজী পরস্পরের দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অমায়িক, উদার-স্বভাব, সুপণ্ডিত ও সাধক বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতজীও ঠাকুরকে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অবস্থায় উপনীত মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মার নামগান শুনিয়া পণ্ডিতজী অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং সমাধিতে মুহুর্মুহুঃ বাহ্য চৈতন্যের লোপ হইতে দেখিয়া এবং ঐ অবস্থায় ঠাকুরের কিরূপ উপলব্ধিসমূহ হয়, সে সকল কথা শুনিয়া পণ্ডিতজী নির্ব্বাক হইয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অবস্থা-সকলের সহিত ঠাকুরের অবস্থা মিলাইয়া লইতে যে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ঐরূপ করিতে যাইয়া তিনি যে সেদিন ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন এবং কোন একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ইহাও সুনিশ্চিত। কারণ ঠাকুরের চরম উপলব্ধিসকল শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে না

পণ্ডিতের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন

পাইয়া তিনি শাস্ত্রের কথা সত্য অথবা ঠাকুরের উপলব্ধিই সত্য, ইহা স্থির করিতে পারেন নাই। অতএব শাস্ত্রজ্ঞান ও নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসহায়ে আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত পণ্ডিতজীর বিচারশীল মন ঠাকুরের সহিত পরিচয়ে আলোকের ভিতর একটা অন্ধকারের ছায়ার মত অপূর্ব্ব আনন্দের ভিতরে একটা অশান্তির ভাব উপলব্ধি করিয়াছিল।

প্রথম পরিচয়ের এই প্রীতি ও আকর্ষণে ঠাকুর ও পণ্ডিতজী আরও কয়েকবার একত্র মিলিত হইয়াছিলেন এবং উহার ফলে পণ্ডিতজীর ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থাবিষয়ক ধারণা অপূর্ব্ব গভীর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতজীর ঐরূপ দৃঢ় ধারণা হইবার একটি বিশেষ কারণও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি।

পণ্ডিতের ভক্তি-শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির কারণ

পণ্ডিত পদ্মলোচন বেদান্তোক্ত জ্ঞানবিচারের সহিত তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর বহুকাল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিলেন এবং ঐরূপ অনুষ্ঠানের ফলও কিছু কিছু জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, জগদম্বা তাঁকে পণ্ডিতজীর সাধনলব্ধ-শক্তিসম্বন্ধে একটি গোপনীয় কথা ঐ সময়ে জানাইয়া দেন। তিনি জানিতে পারেন, সাধনায় প্রসন্না হইয়া পণ্ডিতজীর ইষ্টদেবী তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এতকাল ধরিয়া অগণ্য পণ্ডিতসভায় অপর সকলের অজেয় হইয়া আপন প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন! পণ্ডিতজীর নিকটে সর্ব্বদা একটি জলপূর্ণ গাড়ু ও একখানি গামছা থাকিত; এবং কোনও প্রশ্নের মীমাংসায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে উহা হস্তে লইয়া ইতস্ততঃ কয়েক পদ পরিভ্রমণ করিয়া

আসিয়া মুখপ্রক্ষালন ও মোক্ষণ করতঃ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবহমান কাল হইতে তাঁহার রীতি ছিল। তাঁহার ঐ রীতি বা অভ্যাসের কারণানুসন্ধানে কাহারও কখন কৌতূহল হয় নাই এবং উহার যে কোন নিগূঢ় কারণ আছে তাহাও কেহ কখন কল্পনা করে নাই। তাঁহার ইষ্টদেবীর নিয়োগানুসারেই যে তিনি ঐরূপ করিতেন এবং ঐরূপ করিলেই যে তাঁহাতে শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দৈববলে সম্যক্ জাগরিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অন্যের অজেয় করিয়া তুলিত, পণ্ডিতজী একথা কাহারও নিকটে এমন কি, নিজ সহধর্ম্মিণীর নিকটেও কখন প্রকাশ করেন নাই। পণ্ডিতজীর ইষ্টদেবী তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিভৃতে প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনিও তদবধি এতকাল ধরিয়া উহা অক্ষুণ্নভাবে পালন করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে উহার ফল প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন!

ঠাকুর বলিতেন—জগদম্বার কৃপায় ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি অবসর বুঝিয়া একদিন পণ্ডিতজীর গাড়ু, গামছা তাঁহার অজ্ঞাতসারে লুকাইয়া রাখেন এবং পণ্ডিতজীও তদভাবে উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া উহার অন্বেষণেই ব্যস্ত হন। পরে যখন জানিতে পারিলেন ঠাকুর ঐরূপ করিয়াছেন তখন আর পণ্ডিতজীর আশ্চর্য্যের সীমা থাকে নাই। আবার যখন বুঝিলেন ঠাকুর সকল কথা জানিয়া শুনিয়াই ঐরূপ করিয়াছেন, তখন পণ্ডিতজী আর থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিজ ইষ্টজ্ঞানে সজলনয়নে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন! তদবধি পণ্ডিতজী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া জ্ঞান ও তদ্রূপ ভক্তি

ঠাকুরের পণ্ডিতের সিদ্ধাই জানিতে পারা

করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, "পদ্মলোচন অত বড় পণ্ডিত হয়েও এখানে (আমাতে) এতটা বিশ্বাস ভক্তি করতো! বলেছিল—'আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে সভা করে সকলকে বলবো, তুমি ঈশ্বরাবতার; আমার কথা কে কাটতে পারে দেখবো।' মথুর (এক সময়ে অন্য কারণে) যত পণ্ডিতদের ডাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভার যোগাড় করেছিল। পদ্মলোচন নির্লোভ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ; সভায় আসবে না ভেবে আসবার জন্য অনুরোধ করতে বলেছিল। মথুরের কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'হ্যাঁগা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে না?' তাইতে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাটীতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি! কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা!'"

মথুর বাবুর আহূত সভায় কিন্তু পণ্ডিতজীকে যাইতে হয় নাই।

পণ্ডিতের কাশীধামে শরীরত্যাগ

সভা আহূত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সজলনয়নে ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে গমন করেন। শুনা যায়, সেখানে অল্পকাল পরেই তাঁহার শরীরত্যাগ হয়।

ইহার বহুকাল পরে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তেরা যখন তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে এবং ভক্তির উত্তেজনায় তাহাদের ভিতর কেহ কেহ ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রকাশ্যে নির্দ্দেশ করিতেছে, তখন ঐ সকল ভক্তের ঐরূপ ব্যবহার জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান এবং ভক্তির আতিশয্যে তাহারা ঐ কার্য্যে বিরত হয় নাই, কয়েকদিন

পরে এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হইয়া একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বল্লেন। ওরা মনে করে 'অবতার' বলে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় কল্লে! কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি? ওদের এখানে আসবার ও অবতার বলবার ঢের আগে পদ্মলোচনের মত লোক—যারা সারাজীবন ঐ বিষয়ের চর্চ্চায় কাল কাটিয়েছে, কেউ ছটা দর্শনে পণ্ডিত, কেউ তিনটে দর্শনে পণ্ডিত—কত সব এখানে এসে অবতার বলে গেছে। অবতার বলায় তুচ্ছজ্ঞান হয়ে গেছে। ওরা অবতার বলে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল?"

পদ্মলোচন ভিন্ন আরও অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতদিগের সহিত ঠাকুরের সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের ভিতর ঠাকুর যে সকল বিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন, কথাপ্রসঙ্গে তাহাও তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন। ঐরূপ কয়েকটির কথাও সংক্ষেপে এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

আর্য্যমত-প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এক সময়ে বঙ্গদেশে বেড়াইতে আসিয়া কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরের সিঁথি নামক পল্লীতে জনৈক ভদ্রলোকের উদ্যানে কিছুকাল বাস করেন। সুপণ্ডিত বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, তখনও তিনি নিজের মত প্রচার করিয়া দলগঠন করেন নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া ঠাকুর একদিন ঐ স্থানে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দয়ানন্দের কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "সিঁথির

দয়ানন্দের সম্বন্ধে ঠাকুর

বাগানে দেখতে গিয়েছিলাম; দেখলাম—একটু শক্তি হয়েছে; বুকটা সর্ব্বদা লাল হয়ে রয়েচে; বৈখরী অবস্থা—দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই কথা (শাস্ত্রকথা) কচ্চে, ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার (শাস্ত্রবাক্যের) মানে সব উল্‌টো-পাল্‌টা করতে লাগলো; নিজে একটা কিছু করবো, একটা মত চালাবো—এ অহঙ্কার ভেতরে রয়েচে!"

জয়নারায়ণ পণ্ডিত

জয়নারায়ণ পণ্ডিতের কথায় ঠাকুর বলিতেন, "অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু অহঙ্কার ছিল না; নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে বলেছিল, কাশী যাবে ও সেখানে দেহ রাখবে—তাই হয়েছিল।"

রামভক্ত কৃষ্ণকিশোর

আরিয়াদহ-নিবাসী কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্যের শ্রীরামচন্দ্রে পরম ভক্তির কথা ঠাকুর অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। কৃষ্ণকিশোরের বাটীতে ঠাকুরের গমনাগমন ছিল এবং তাঁহার পরম ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীও ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। রামনামে ভক্তির তো কথাই নাই, ঠাকুর বলিতেন—কৃষ্ণকিশোর 'মরা' 'মরা' শব্দটিকেও ঋষিপ্রদত্ত মহামন্ত্রজ্ঞানে বিশেষ ভক্তি করিতেন। কারণ পুরাণে লিখিত আছে, ঐ শব্দই মন্ত্ররূপে নারদ ঋষি দস্যু বাল্মীকিকে দিয়াছিলেন এবং উহার বারংবার ভক্তিপূর্ব্বক উচ্চারণের ফলেই বাল্মীকির মনে শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব লীলার স্ফূর্ত্তি হইয়া তাঁহাকে রামায়ণপ্রণেতা কবি করিয়াছিল। কৃষ্ণকিশোর সংসারে শোক-তাপও অনেক পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হয়। ঠাকুর বলিতেন, পুত্রশোকের এমনি প্রভাব, অত বড়

বিশ্বাসী ভক্ত কৃষ্ণকিশোরও তাহাতে প্রথম প্রথম সামলাইতে না পারিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন!

পূর্ব্বোক্ত সাধকগণ ভিন্ন ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকেও দেখিতে গিয়াছিলেন এবং মহর্ষির উদার ভক্তি ও ঈশ্বরচন্দ্রের কর্ম্মযোগপরায়ণতার কথা আমাদের নিকট সময়ে সময়ে উল্লেখ করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গুরুভাবে তীর্থ-ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

—গীতা, ১০।৪১

গুরুভাবের প্রেরণায় ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কত স্থানে কত লোকের সহিত কত প্রকারে যে লীলা করিয়াছিলেন তাহার সমুদয় লিপিবদ্ধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। উহার কিছু কিছু ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাঠককে উপহার দিয়াছি। ঠাকুরের তীর্থভ্রমণও ঐ ভাবেই হইয়াছিল। এখন আমরা পাঠককে উহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

অপরাপর আচার্য্য-পুরুষদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের জীবনের অদ্ভুত নূতনত্ব

আমরা যতদূর দেখিয়াছি ঠাকুরের কোন কার্য্যটিই উদ্দেশ্য-বিহীন বা নিরর্থক ছিল না। তাঁহার জীবনের অতি সামান্য সামান্য দৈনিক ব্যবহারগুলির পর্য্যালোচনা করিলেও গভীর ভাবপূর্ণ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—বিশেষ ঘটনাগুলির তো কথাই নাই। আবার এমন অঘটন-ঘটনাবলী-পরিপূর্ণ জীবন বর্ত্তমান যুগে আধ্যাত্মিক জগতে আর একটিও দেখা যায় নাই। আজীবন তপস্যা ও চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের অনন্তভাবের কোন একটি সম্যক্ উপলব্ধিই মানুষ করিয়া উঠিতে পারে না, তা নানাভাবে তাঁহার উপলব্ধি ও দর্শন করা—সকল

প্রকার ধর্ম্মমত সাধনসহায়ে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করা এবং সকল মতের সাধকদিগকেই নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করা! আধ্যাত্মিক জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা দূরে থাকুক, কখনও কি আর শুনা গিয়াছে? প্রাচীন যুগের ঋষি আচার্য্য বা অবতার মহাপুরুষেরা এক একটি বিশেষ বিশেষ ভাবরূপ পথাবলম্বনে স্বয়ং ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া তত্তৎ ভাবকেই ঈশ্বরদর্শনের একমাত্র পথ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; অপরাপর নানা ভাবাবলম্বনেও যে ঈশ্বরের উপলব্ধি করা যাইতে পারে, একথা উপলব্ধি করিবার অবসর পান নাই। অথবা নিজেরা ঐ সত্যের অল্প বিস্তর প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলেও তৎপ্রচারে জনসাধারণের ইষ্টনিষ্ঠার দৃঢ়তা কমিয়া যাইয়া তাহাদের ধর্ম্মোপলব্ধির অনিষ্ট সাধিত হইবে—এই ভাবিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঐ বিষয়টির ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু যাহা ভাবিয়াই তাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকুন, তাঁহারা যে তাঁহাদের গুরুভাব-সহায়ে একদেশী ধর্ম্মমতসমূহই প্রচার করিয়াছিলেন এবং কালে উহাই যে মানবমনে ঈর্ষাদ্বেষাদির বিপুল প্রসার আনয়ন করিয়া অনন্ত বিবাদ এবং অনেক সময়ে রক্তপাতেরও হেতু হইয়াছিল, ইতিহাস এ বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য দিতেছে।

শুধু তাহাই নহে, ঐরূপ একঘেয়ে একদেশী ধর্ম্মভাব-প্রচারে পরস্পরবিরোধী নানামতের উৎপত্তি হইয়া ঈশ্বরলাভের পথকে এতই জটিল করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে জটিলতা ভেদ করিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই সাধারণ বুদ্ধির প্রতীত হইতেছিল। ইহকালাবসায়ী ভোগৈক-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যের জড়বাদ আবার সময় বুঝিয়াই যেন দুর্দ্দমনীয় বেগে

শিক্ষার ভিতর দিয়া ঠাকুরের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া তরলমতি বালক ও যুবকদিগের মন কলুষিত করিয়া নাস্তিকতা ভোগানুরাগ প্রভৃতি নানা বৈদেশিক ভাবে দেশ প্লাবিত করিতেছিল। পবিত্রতা, ত্যাগ ও ঈশ্বরানুরাগের জলন্ত নিদর্শন-স্বরূপ এ অলৌকিক ঠাকুরের আবির্ভাবে ধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে দুর্দ্দশা কতদূর গড়াইত তাহা কে বলিতে পারে? ঠাকুর স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইলেন যে, ভারত এবং ভারতেতর দেশে প্রাচীন যুগে যত ঋষি, আচার্য্য, অবতার মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া যত প্রকার ভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম-জগতে ঈশ্বরলাভের যত প্রকার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার কোনটিই মিথ্যা নহে—প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ সত্য; বিশ্বাসী সাধক ঐ ঐ পথাবলম্বনে অগ্রসর হইয়া এখনও তাঁহাদের ন্যায় ঈশ্বরদর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারেন।—দেখাইলেন যে, পরস্পর-বিরুদ্ধ সামাজিক আচার রীতি নীতি প্রভৃতি লইয়া ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর পর্ব্বত-সদৃশ ব্যবধান বিদ্যমান থাকিলেও উভয়ের ধর্ম্মই সত্য; উভয়েই এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপাসনা করিয়া, বিভিন্ন পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া কালে সেই প্রেম-স্বরূপের সহিত প্রেমে এক হইয়া যায়। দেখাইলেন যে, ঐ সত্যের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই উহারা উভয়ে উভয়কে কালে সপ্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবে এবং বহু কালের বিবাদ ভুলিয়া শান্তিলাভ করিবে এবং

ঠাকুর নিজ জীবনে কি সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উদার মত ভবিষ্যতে কতদূর প্রসারিত হইবে

দেখাইলেন যে, কালে ভোগলোলুপ পাশ্চাত্যও 'ত্যাগেই শান্তি' একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈশাপ্রচারিত ধর্ম্মমতের সহিত ভারত এবং অন্যান্য প্রদেশের ঋষি এবং অবতারকুল-প্রচারিত ধর্ম্মমতসমূহের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া নিজ কর্ম্মজীবনের সহিত ধর্ম্ম-জীবনের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়া ধন্য হইবে! এ অদ্ভুত ঠাকুরের জীবনালোচনায় আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই দেখিতে পাইব, ইনি দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা ধর্ম্মবিশেষের সম্পত্তি নহেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই একদিন শান্তিলাভের জন্য ইঁহার উদার-মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর ভাবরূপে তাহাদের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সমুদয় সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাঁহার নবীন ছাঁচে ফেলিয়া তাহাদিগকে এক অপূর্ব্ব একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিবেন।

এ বিষয়ে প্রমাণ

ভারতের পরস্পর-বিরোধী চিরবিবদমান যাবতীয় প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের সাধককুল ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যে তাঁহাতে নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে নিজ নিজ গন্তব্য পথেরই পথিক বলিয়া স্থির ধারণা করিয়াছিলেন, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ভাবই সূচিত হইতেছে। ঠাকুরের গুরুভাবের যে কার্য্য এইরূপে ভারতে প্রথম প্রারব্ধ হইয়া ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের ভিতর একতা আনিয়া দিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছে, সে কার্য্য যে শুধু ভারতের ধর্ম্মবিবাদ ঘুচাইয়া নিরস্ত হইবে তাহা নহে—এশিয়ার ধর্ম্মবিবাদ, ইউরোপের ধর্ম্মহীনতা ও ধর্ম্মবিদ্বেষ সমস্তই ধীর স্থির পদসঞ্চারে শনৈঃ শনৈঃ তিরোহিত করিয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া

এক অদৃষ্টপূর্ব্ব শান্তির রাজ্য স্থাপন করিবে। দেখিতেছ না ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে ঐ কার্য্য কত দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে? দেখিতেছ না, কিরূপে গুরুগতপ্রাণ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে ঠাকুরের ভাব প্রবেশলাভ করিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই চিন্তাজগতে কি যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যতই চলিয়া যাইবে ততই এ অমোঘ ভাবরাশি সকল জাতির ভিতর, সকল ধর্ম্মের ভিতর, সকল সমাজের ভিতর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিবে। কাহার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে? অদৃষ্টপূর্ব্ব তপস্যা ও পবিত্রতার সাত্ত্বিক তেজোদীপ্ত এ ভাবরাশির সীমা কে উল্লঙ্ঘন করিবে? যে সকল যন্ত্রসহায়ে উহা বর্ত্তমানে প্রসারিত হইতেছে, সে সকল ভগ্ন হইবে, কোথা হইতে ইহা প্রথম উত্থিত হইল তাহাও হয়ত বহুকাল পরে অনেকে ধরিতে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু এ অনন্তমহিমোজ্জ্বল ভাবময় ঠাকুরের স্নিগ্ধোদ্দীপ্ত ভাবরাশি হৃদয়ে যত্নে পোষণ করিয়া তাঁহারই ছাঁচে জীবন গঠিত করিয়া পৃথিবীর সকলকেই একদিন ধন্য হইতে হইবে নিশ্চয়!

ঠাকুরের ভাবপ্রসার কিরূপে বুঝিতে হইবে

অতএব ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধককুলের ঠাকুরের নিকট আগমন ও যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিয়া ধন্য হইবার যে সকল কথা আমরা তোমাকে উপহার দিতেছি, হে পাঠক, কেবলমাত্র ভাসাভাসা ভাবে গল্পের মত ঐ সকল পাঠ করিয়াই নিরস্ত থাকিও না। ভাবমুখে অবস্থিত এ অলৌকিক ঠাকুরের দিব্য ভাবরাশি প্রথম

যথাসম্ভব ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা কর ; পরে ঐ সকল কথার ভিতর তলাইয়া দেখিতে থাক কিরূপে ঐ ভাবরাশির প্রসার আরম্ভ হইল, কিরূপেই বা উহা পরিপুষ্ট হইয়া প্রথম পুরাতন, পরে নবীন ভাবে শিক্ষিত জনসমূহের ভিতর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিল এবং কিরূপেই বা পরে উহা ভারত হইতে ভারতেতর দেশে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর ভাবজগতে যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধককুলকে লইয়াই ঠাকুরের ভাবরাশির প্রথম বিস্তার। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর যখন যে যে ভাবে সিদ্ধ হইয়াছিলেন তখন সেই সেই ভাবের ভাবুক সাধককুল তাঁহার নিকট স্বতঃপ্রেরিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক তত্তৎভাবের পূর্ণাদর্শ তাঁহাতে অবলোকন ও তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মথুর বাবু ও তৎপত্নী পরম ভক্তিমতী জগদম্বা দাসীর অনুরোধে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত তীর্থপর্য্যটনে গমন করিয়াছিলেন। কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থে সাধুভক্তের অভাব নাই।

ঠাকুরের ভাবের প্রথম প্রচার হয় দক্ষিণেশ্বরাগত এবং তীর্থে দৃষ্ট সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের ভিতরে

অতএব তত্তৎস্থানেও যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধকেরা ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গুরুভাব-সহায়ে ধন্য হইয়াছিলেন একথা শুধু যে আমরা অনুমান করিতে পারি তাহাই নহে, কিন্তু উহার কিছু কিছু আভাস তাঁহার শ্রীমুখেও শুনিতে পাইয়াছি। তাহারও কিছু কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

ঠাকুর বলিতেন, "ঘুঁটি সব ঘর ঘুরে তবে চিকে ওঠে ; মেথর

থেকে রাজা অবধি সংসারে যত রকম অবস্থা আছে সে সমুদয় দেখে শুনে, ভোগ করে, তুচ্ছ বলে ঠিক ঠিক ধারণা হলে তবে পরমহংস অবস্থা হয়, যথার্থ জ্ঞানী হয়!" এ ত গেল সাধকের নিজের চরমজ্ঞানে উপনীত হইবার কথা। আবার লোকশিক্ষা বা জনসাধারণের যথার্থ শিক্ষক হইতে হইলে কিরূপ হওয়া আবশ্যক তৎসম্বন্ধে বলিতেন, "আত্মহত্যা একটা নরুন দিয়ে করা যায়; কিন্তু পরকে মার্‌তে হলে (শত্রুজয়ের জন্য) ঢাল খাঁড়ার দরকার হয়।"

জীবনে উচ্চাবচ নানা অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়া নানা শিক্ষা পাইয়াই ঠাকুরের ভিতর অপূর্ব্ব আচার্য্যত্ব ফুটিয়া উঠে

ঠিক ঠিক আচার্য্য হইতে গেলে তাঁহাকে সব রকম সংস্কারের ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে শিক্ষালাভ করিয়া অপর সাধারণাপেক্ষা সমধিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়। "অবতার, সিদ্ধপুরুষ এবং জীবে শক্তি লইয়াই প্রভেদ"—ঠাকুর একথা বারংবার আমাদের বলিয়াছেন। দেখনা, ব্যবহারিক রাজনৈতিকাদি জগতে বিশমার্ক, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে দেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমস্ত ইতিহাস ও ঘটনাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইতরসাধারণাপেক্ষা কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়; ঐরূপে শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই ত তাঁহারা পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর পরে বর্ত্তমানকালে প্রচলিত কোন্ ভাবটি কিরূপ আকার ধারণ করিয়া দেশের জনসাধারণের অহিত করিবে তাহা ধরিতে বুঝিতে পারেন এবং সেজন্য এখন হইতে তদ্বিপরীত ভাবের এমন সকল কার্য্যের সূচনা করিয়া যান যাহাতে দীর্ঘকাল পরে ঐ ভাব প্রবল হইয়া দেশে ঐরূপ অমঙ্গল আর আনিতে পারে না! আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক তদ্রূপ বুঝিতে

হইবে। অবতার বা যথার্থ আচার্য্যপুরুষদিগকে প্রাচীন যুগের ঋষিরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কি কি আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছিলেন, এতদিন পরে ঐ সকল ভাব কিরূপ আকার ধারণ করিয়া জনসাধারণের কতটা ইষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে এবং বিকৃত হইয়া কতটা অনিষ্টই বা করিতেছে ও করিবে, ঐ সকল ভাবের ঐরূপে বিকৃত হইবার কারণই বা কি, বর্ত্তমানে দেশে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে সে সকলও কালে বিকৃত হইতে হইতে দুই-এক শতাব্দী পরে কিরূপ আকার ধারণ করিয়া কিভাবে জনসাধারণের অধিকতর অহিতকর হইবে—এ সমস্ত কথা ঠিক ঠিক ধরিয়া বুঝিয়া নবীন ভাবের কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়া যাইতে হয়। কারণ ঐ সকল বিষয় যথার্থভাবে ধরিতে বুঝিতে না পারিলে সকলের বর্ত্তমান অবস্থা ধরিবেন, বুঝিবেন কিরূপে এবং রোগ ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিলে তাহার ঔষধ প্রয়োগই বা কিরূপে করিবেন? সে জন্য তীব্র তপস্যাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধদানে আপনাকে শক্তিসম্পন্ন করা ভিন্ন আচার্য্যদিগকে সংসারে নানা অবস্থায় পড়িয়া যতটা শিক্ষালাভ করিতে হয়—ইতরসাধারণ সাধককে ততটা করিতে হয় না! দেখনা, ঠাকুরকে কত প্রকার অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল। দরিদ্রের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত, কালীবাটীর পূজকের পদগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া যৌবনে পরের দাসত্বকরা-রূপ হীনাবস্থার সহিত, সাধকাবস্থায় ভগবানের জন্য আত্মহারা হইয়া আত্মীয় কুটম্বদিগের তীব্র তিরস্কার লাঞ্ছনা অথবা গভীর মনস্তাপ এবং সাংসারিক অপর সাধারণের পাগল বলিয়া নিতান্ত উপেক্ষা

বা করুণার সহিত, মথুর বাবুর তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয়ে রাজতুল্য ভোগ ও সম্মানের সহিত, নানা সাধককুলের ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি ঢালিয়া দেওয়ায় দেবতুল্য পরম ঐশ্বর্য্যের সহিত—এইরূপ কতই না অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া ঐ সকল অবস্থাতে সর্ব্বতোভাবে অবিচলিত থাকা-রূপ বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল! অনন্য অনুরাগ এক-দিকে যেমন তাঁহাকে ঈশ্বরলাভের অদৃষ্টপূর্ব্ব তীব্র তপস্যায় লাগাইয়া তাঁহার যোগপ্রসূত অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিল, সংসারের এই সকল নানা অবস্থার সহিত পরিচয়ও আবার তেমনি অপর দিকে তাঁহাকে বাহ্য বর্ত্তমান জগতের সকল প্রকার অবস্থাপন্ন লোকের ভিতরের ভাব ঠিক ঠিক ধরিয়া বুঝিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহারে কুশলী এবং তাহাদের সকল প্রকার সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ ভিতরের ও বাহিরের ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই ঠাকুরের গুরুভাব বা আচার্য্যভাব দিন দিন অধিকতর বিকশিত ও পরিস্ফুট হইতে দেখা গিয়াছিল।

তীর্থ-ভ্রমণে ঠাকুর কি শিখিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভিতর দেব ও মানব উভয় ভাব ছিল

তীর্থভ্রমণও যে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ ফল উপস্থিত করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যুগাচার্য্য ঠাকুরের দেশের ইতরসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ছিল। মথুরের সহিত তীর্থভ্রমণে যাইয়া উহা যে অনেকটা সংসিদ্ধ হইয়াছিল এ বিষয় নিঃসন্দেহ। কারণ অন্তর্জগতে ঠাকুরের যে প্রজ্ঞাচক্ষু মায়ার সমগ্র আবরণ ভেদ করিয়া সকলের অন্তর্নিহিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অখণ্ড সচ্চিদানন্দের

দর্শন স্পর্শন সর্ব্বদা করিতে সমর্থ হইত, বহির্জগতে লৌকিক ব্যবহারের সম্পর্কে আসিয়া উহাই আবার এখন এক কথায় লোকের ভিতরের ভাব ধরিতে এবং দুই-চারিটি ঘটনা দেখিয়াই সমাজের ও দেশের অবস্থা বুঝিতে বিশেষ পটু হইয়াছিল। অবশ্য বুঝিতে হইবে, ঠাকুরের সাধারণ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই আমরা একথা বলিতেছি, নতুবা যোগবলে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া যখন তিনি দিব্যদৃষ্টি-সহায়ে ব্যক্তিগত, সমাজগত বা প্রদেশগত অবস্থার দর্শন ও উপলব্ধি করিতেন এবং কোন্ উপায়াবলম্বনে তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অবসান হইবে তাহা সম্যক্ নির্দ্ধারণ করিতেন তখন ইতরসাধারণের ন্যায় বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিয়া শুনিয়া তুলনায় আলোচনা করিয়া কোনও বিষয় জানিবার পারে তিনি চলিয়া যাইতেন এবং ঐরূপে ঐ বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণের তাঁহার আর প্রয়োজনই হইত না। দেব-মানব ঠাকুরকে আমরা সাধারণ বাহ্যদৃষ্টি এবং অসাধারণ যোগদৃষ্টি—উভয় দৃষ্টিসহায়েই সকল বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ করিতে দেখিয়াছি। সেজন্য দেবভাব ও মনুষ্যভাব উভয়বিধ ভাবের সম্যক্ বিকাশের পরিচয় পাঠককে না দিতে পারিলে এ অলৌকিক চরিত্রের একদেশী ছবিমাত্রই পাঠকের মনে অঙ্কিত হইবে। তজ্জন্য ঐ উভয়বিধ ভাবেই এই দেবমানবের জীবনালোচনা করিতে আমাদের প্রয়াস।

শাস্ত্রদৃষ্টিতে ঠাকুরের তীর্থভ্রমণের আর একটি কারণও পাওয়া যায়। শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম পুরুষেরা তীর্থে যাইয়া ঐসকল স্থানের তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ সকল স্থানে ঈশ্বরের বিশেষ দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে আগমন ও অবস্থান করেন বলিয়াই সেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ

আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা ঐ ভাবের পূর্ব্বপ্রকাশ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং মানব-সাধারণ সেখানে উপস্থিত হইলে অতি সহজেই ঈশ্বরের ঐ ভাবের কিছু না কিছু উপলব্ধি করে। সিদ্ধ পুরুষদের সম্বন্ধেই যখন শাস্ত্র এ কথা বলিয়াছেন তখন তদপেক্ষা সমধিক শক্তিমান ঠাকুরের ন্যায় অবতারপুরুষদিগের তো কথাই নাই! তীর্থসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাটি ঠাকুর অনেক সময় আমাদিগকে তাঁহার সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেন। বলিতেন —"ওরে, যেখানে অনেক লোকে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে, সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জান্‌বি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাক্‌লেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ; যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাত্‌কো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না— যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।

ঠাকুরের ন্যায় দিব্যপুরুষদিগের তীর্থপর্য্যটনের কারণ-সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন

আবার ঈশ্বরের বিশেষপ্রকাশযুক্ত ঐ সকল স্থান দর্শনাদির পর ঠাকুর আমাদিগকে 'জাবর কাটিতে' শিক্ষা দিতেন! বলিতেন —"গরু যেমন পেটভরে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায়

বসে সেই সব খাবার উগ্‌রে ভাল করে চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে জেগে ওঠে সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়; দেখে এসেই সে সব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপ-রসে মন দিতে নাই; তা হলে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না!"

তীর্থ ও দেবস্থান দেখিয়া 'জাবর কাটিবার' উপদেশ

কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিতে ঠাকুরের সঙ্গে একবার আমাদের কেহ কেহ গমন করিয়াছিলেন। পীঠস্থানে বিশেষ প্রকাশ এবং ঠাকুরের শরীর-মনে শ্রীশ্রীজগন্মাতার জীবন্ত প্রকাশ উভয় মিলিত হইয়া ভক্তদিগের প্রাণে যে এক অপূর্ব্ব উল্লাস আনয়ন করিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। দর্শনাদি করিয়া প্রত্যাগমন-কালে পথিমধ্যে ভক্তদিগের একজনকে বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্বশুরালয়ে গমন এবং সে রাত্রি তথায় যাপন করিতে হইল। পরদিন তিনি যখন পুনরায় ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন তখন ঠাকুর তাঁহাকে পূর্ব্বরাত্রি কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপে শ্বশুরালয়ে থাকিবার কথা শুনিয়া বলিলেন, "সে কিরে? মাকে দর্শন করে এলি, কোথায় তাঁর দর্শন, তাঁর ভাব নিয়ে জাবর কাটবি, তা না করে রাতটা কিনা বিষয়ীর মত শ্বশুরবাড়ীতে কাটিয়ে এলি? দেবস্থান তীর্থস্থান দর্শনাদি করে এসে সেই সব ভাব নিয়ে থাকতে হয়, জাবর কাটতে হয়, তা নইলে ও সব ঈশ্বরীয় ভাব প্রাণে দাঁড়াবে কেন?"

আবার ঈশ্বরীয় ভাব ভক্তিভরে হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতে পোষণ না

করিয়া তীর্থাদিতে যাইলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, সে সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেকবার আমাদের বলিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান-কালে আমাদের অনেকে অনেক সময়ে তীর্থাদি-ভ্রমণে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন, "ওরে, যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই।"[১] আবার বলিতেন—"যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়; আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে? অনেক সময়ে শোনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে বা অন্য কোথায় পালিয়ে গিয়েছে; তারপর আবার শুনতে পাওয়া যায়, সে সেখানে চেষ্টা-বেষ্টা করে একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখেছে ও টাকা পাঠিয়েছে! তীর্থে বাস করতে গিয়ে কত লোকে সেখানে আবার দোকান-পাট-ব্যবসা ফেঁদে বসে। মথুরের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে দেখি, এখানেও যা সেখানেও তাই; এখানকার আমগাছ তেঁতুলগাছ বাঁশঝাড়টি যেমন, সেখানকার সেগুলিও তেমনি! তাই দেখে হৃদুকে বলেছিলাম, 'ওরে হৃদু, এখানে আর তবে কি দেখতে এলুম রে? সেখানেও যা এখানেও

ভক্তিভাব পূর্ব্বে হৃদয়ে আনিয়া তবে তীর্থে যাইতে হয়

১ অবতারপুরুষেরা অনেক সময় একইভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মহামহিম ঈশা এক সময়ে তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন—'To him who hath more, more shall be given and from him who hath little, that little shall be taken away!' অর্থাৎ যাহার অধিক ভক্তি-বিশ্বাস আছে তাহাকে আরও ঐ ভাব দেওয়া হইবে। আর যাহার ভক্তি-বিশ্বাস অল্প তাহার নিকট হইতে সেই অল্পটুকুও কাড়িয়া লওয়া যাইবে।

তাই! কেবল, মাঠে-ঘাটের বিষ্ঠাগুলো দেখে মনে হয় এখানকার লোকের হজমশক্তিটা ওদেশের লোকের চেয়ে অধিক!' "[১]

স্বামী বিবেকানন্দের বুদ্ধগয়াগমনে তথায় গমনোৎসুক জনৈক ভক্তকে ঠাকুর যাহা বলেন

পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, গলরোগের চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা ঠাকুরকে প্রথম কলিকাতায় শ্যামপুকুর নামক পল্লীস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে এবং পরে কলিকাতার কিছু উত্তরে অবস্থিত কাশীপুর নামক স্থানে একটি বাগানবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। কাশীপুরের বাগানে আসিবার কয়েকদিন পরেই স্বামী বিবেকানন্দ একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া অপর দুইটি গুরুভ্রাতার সহিত বুদ্ধগয়ায় গমন করেন। সে সময় আমাদের ভিতর ভগবান বুদ্ধদেবের অদ্ভুত জীবন এবং সংসারবৈরাগ্য, ত্যাগ ও তপস্যার আলোচনা দিবারাত্র চলিতেছিল। বাগানবাটীর নিম্নতলের দক্ষিণ দিক্‌কার যে ছোট ঘরটিতে আমরা সর্ব্বদা উঠা বসা করিতাম, তাহার দেওয়ালের গায়ে—যতদিন সত্যলাভ না হয় ততদিন একাসনে বসিয়া ধ্যানধারণাদি করিব, ইহাতে শরীর যায় যাক্—বুদ্ধদেবের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক 'ললিতবিস্তরের' একটি শ্লোক লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। দিবারাত্র ঐ কথাগুলি চক্ষের সামনে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিত আমাদেরও সত্যস্বরূপ ঈশ্বরলাভের জন্য ঐরূপে প্রাণপাত করিতে হইবে। আমাদেরও—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥[২]

---

১ ঠাকুর এ কথাগুলি অন্য ভাবে বলিয়াছিলেন।

২ ললিতবিস্তর

—করিতে হইবে। দিবারাত্র ঐরূপ বৈরাগ্যালোচনা করিতে করিতে স্বামিজী সহসা বুদ্ধগয়ায় চলিয়া যাইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কবে ফিরিবেন সে কথা কাহাকেও জানাইলেন না; কাজেই আমাদের কাহারও কাহারও মনে হইল তিনি বুঝি আর সংসারে ফিরিবেন না, আর বুঝি তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইব না! পরে সংবাদ পাওয়া গেল তিনি গৈরিক ধারণ করিয়া বুদ্ধগয়ায় গিয়াছেন। আমাদের সকলের মন তখন হইতে স্বামিজীর প্রতি এমন বিশেষ আকৃষ্ট যে একদণ্ড তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকা বিষম যন্ত্রণাদায়ক; কাজেই মন চঞ্চল হইয়া অনেকের অনুক্ষণ পশ্চিমে স্বামিজীর নিকট যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের কানেও সে কথা উঠিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন একজনের ঐ বিষয়ে সংকল্প জানিতে পারিয়া ঠাকুরকে তাহার কথা বলিয়াই দিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন—"কেন ভাবছিস? কোথায় যাবে সে (স্বামিজী)? কদিন বাহিরে থাকতে পারবে? দেখ্‌না এল বলে।" তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু (যথার্থ ধর্ম্ম) নেই; যা কিছু আছে সব (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই খানে!" "এই খানে"—কথাটি ঠাকুর বোধ হয় দুই ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যথা—তাঁহার নিজের ভিতরে ধর্ম্মভাবের, ঈশ্বরীয় ভাবের বর্ত্তমানে যেরূপ বিশেষ প্রকাশ রহিয়াছে সেরূপ আর কোথাও নাই, অথবা প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই ঈশ্বর রহিয়াছেন; নিজের ভিতর তাঁহার প্রতি ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি ভাব উদ্দীপিত না করিতে পারিলে বাহিরে

নানাস্থানে ঘুরিয়াও কিছুই লাভ হয় না। ঠাকুরের অনেক কথারই এইরূপ দুই বা ততোধিক ভাবের অর্থ পাওয়া যায়। শুধু ঠাকুরের কেন?—জগতে যত অবতারপুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কথাতেই ঐরূপ বহু ভাব পাওয়া যায় এবং মানবসাধারণ যাহার যেরূপ অভিরুচি, যাহার যেরূপ সংস্কার ঐ সকল কথার সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন, তিনি কিন্তু এক্ষেত্রে ঐগুলির প্রথম অর্থই বুঝিলেন এবং ঠাকুরের ভিতরে ঈশ্বরীয় ভাবের যেরূপ প্রকাশ, এমন আর কুত্রাপি নাই এ কথা দৃঢ় ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও বাস্তবিক কয়েকদিন পরেই পুনরায় কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

যার হেথা আছে তার সেথায় আছে

পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রী-ভক্তও এক সময়ে ঠাকুরের শরীর-রক্ষা করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া কিছুকাল তপস্যাদি করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুর সে সময় তাঁহাকে হাত নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "কেন যাবি গো? কি করতে যাবি? যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে—যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই।" স্ত্রী-ভক্তটি মনের অনুরাগে তখন ঠাকুরের সে কথা গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেবার তীর্থে যাইয়া তিনি কোন বিশেষ ফল যে লাভ করিতে পারেন নাই এ কথা আমরা তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অধিকন্তু ঠাকুরের সহিতও তাঁহার আর

সাক্ষাৎ হইল না, কারণ উহার অল্পকাল পরেই ঠাকুর শরীর-রক্ষা করিলেন।

ভাবময় ঠাকুরের তীর্থে গমন বিশেষ ভাব লইয়া যে হইয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার নিকট বহুবার শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, "ভেবেছিলাম, কাশীতে সকলে চব্বিশ ঘণ্টা শিবের ধ্যানে সমাধিতে আছে দেখতে পাব; বৃন্দাবনে সকলে গোবিন্দকে নিয়ে ভাবে প্রেমে বিহ্বল হয়ে রয়েছে দেখ্‌ব! গিয়ে দেখি সবই বিপরীত!" ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব সরল মন সকল কথা পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় সরলভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করিত। আমরা সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেই বাল্যাবধি সংসারে শিক্ষালাভ করিয়াছি; আমাদের ক্রূর মনে সেরূপ বিশ্বাসের উদয় কিরূপে হইবে? কোন কথা সরলভাবে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে দেখিলে আমরা তাহাকে বোকা, নির্ব্বোধ বলিয়াই ধারণা করিয়া থাকি। ঠাকুরের নিকটেই প্রথম শুনিলাম, "ওরে, অনেক তপস্যা, অনেক সাধনার ফলে লোকে সরল উদার হয়, সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না; সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।" আবার সরল, বিশ্বাসী হইতে হইবে শুনিয়া কেহ পাছে বোকা বাঁদর হইতে হইবে ভাবিয়া বসে, এজন্য ঠাকুর বলিতেন, "ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন? আবার বলিতেন, "সর্ব্বদা মনে মনে বিচার করবি— কোন্‌টা সৎ কোন্‌টা অসৎ, কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য, আর অনিত্য জিনিসগুলো ত্যাগ করে নিত্য পদার্থে মন রাখবি।"

ঠাকুরের সরল মন তীর্থে যাইয়া কি দেখিবে ভাবিয়াছিল

ঐ দুই প্রকার কথার সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আমাদের অনেকে অনেক সময় তাঁহার নিকট তিরস্কৃতও হইয়াছে। স্বামী যোগানন্দ তখন গৃহত্যাগ করেন নাই। বাটীতে একখানি কড়ার আবশ্যক থাকায় বড়বাজারে একদিন একখানি কড়া কিনিয়া আনিতে যাইলেন। দোকানীকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া বলিলেন, "দেখো বাপু, ঠিক ঠিক দাম নিয়ে ভাল জিনিস দিও, ফাটা ফুটো না হয়।" দোকানীও 'আজ্ঞা মশায় তা দেব বৈ কি' ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকে একখানি কড়া দিল; তিনি দোকানীর কথায় বিশ্বাস করিয়া উহা আর পরীক্ষা না করিয়াই লইয়া আসিলেন; কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন, কড়াখানি ফাটা। ঠাকুর সে কথা শুনিয়াই বলিলেন, "সে কি রে? জিনিসটা আনলি, তা দেখে আনলি নি? দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে—সে ত আর ধর্ম্ম করতে বসে নি? তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি? ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিস দিলে কি না দেখে তবে দাম দিবি; ওজনে কম দিলে কি না তা দেখে নিবি; আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্য্যন্ত ছেড়ে আসবি নি।" ঐরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা তাহার স্থান নহে। এখানে আমরা ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব সরলতার সহিত অদ্ভুত বিচারশীলতার কথাটির উল্লেখমাত্র করিয়াই পূর্ব্বানুসরণ করি।

'ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন?' ঠাকুরের যোগানন্দ স্বামীকে ঐ বিষয়ে উপদেশ

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি এই তীর্থভ্রমণোপলক্ষে মথুর লক্ষ

মুদ্রারও অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। মথুর কাশীতে আসিয়াই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রথমে মাধুকরী দেন; পরে একদিন তাঁহাদিগকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন, প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র ও এক এক টাকা দক্ষিণা দেন; আবার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া এখানে পুনরাগমন করিয়া ঠাকুরের আজ্ঞায় একদিন 'কল্পতরু' হইয়া তৈজস, বস্ত্র, কম্বল, পাদুকা প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় ব্যবহার্য্য পদার্থসকলের মধ্যে যে যাহা চাহিয়াছিল তাহাকে তাহাই দান করেন। মাধুকরী দিবার দিনেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিবাদ গণ্ডগোল, এমন কি পরস্পর মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে দেখিয়া ঠাকুরের মনে বিষম বিরাগ উপস্থিত হয় এবং বারাণসীতেও ইতর-সাধারণকে অপর সকল স্থানের ন্যায় এইরূপে কামকাঞ্চনে রত থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে একপ্রকার হতাশ ভাব আসিয়াছিল। তিনি সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বলিয়াছিলেন, "মা, তুই আমাকে এখানে কেন আন্‌লি? এর চেয়ে দক্ষিণেশ্বরে যে আমি ছিলাম ভাল!"

কাশীবাসীদিগের বিষয়ানুরাগ-দর্শনে ঠাকুর—'মা, তুই আমাকে এখানে কেন আন্‌লি?'

এইরূপে সাধারণের ভিতর বিষয়ানুরাগ প্রবল দেখিয়া ব্যথিত হইলেও এখানে অদ্ভুত দর্শনাদি হইয়া ঠাকুরের শিব-মহিমা এবং কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। নৌকাযোগে বারাণসী-প্রবেশকাল হইতেই ঠাকুর ভাব-নয়নে দেখিতে থাকেন শিবপুরী বাস্তবিকই স্বর্ণে নির্ম্মিত—বাস্তবিকই ইহাতে মৃত্তিকা প্রস্তরাদির একান্ত

ঠাকুরের 'স্বর্ণময়ী কাশী' দর্শন

অভাব—বাস্তবিকই যুগযুগান্তর ধরিয়া সাধু-ভক্তগণের কাঞ্চনতুল্য সমুজ্জ্বল, অমূল্য হৃদয়ের ভাবরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হইয়া ইহার বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ! সেই জ্যোতির্ম্ময় ভাবঘন মূর্ত্তিই ইহার নিত্য সত্যরূপ—আর বাহিরে যাহা দেখা যায় সেটা তাহারই ছায়ামাত্র!

কাশীকে 'স্বর্ণ নিম্মিত' কেন বলে?

স্থূল দৃষ্টিসহায়েও 'স্বর্ণ-নিম্মিত বারাণসী' কথাটির একটা মোটামুটি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হয় না। কাশীর অসংখ্য মন্দির ও সৌধাবলী, কাশীর প্রস্তর-বাঁধান ক্রোশাধিকব্যাপী গঙ্গাতট ও বিস্তীর্ণ-সোপানাবলী-সমন্বিত অগণিত স্নানের ঘাট, কাশীর প্রস্তর-মণ্ডিত তোরণভূষিত অসংখ্য পথ, পয়ঃ-প্রণালী, বাপী, তড়াগ, কূপ, মঠ ও উদ্যানবাটিকা এবং সর্ব্বোপরি কাশীর ব্রাহ্মণ, বিদ্যার্থী, সাধু ও দরিদ্রগণের পোষণার্থ অসংখ্য অন্নসত্রসকল দেখিয়া কে না বলিবে বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশ মিলিত হইয়া অজস্র স্বর্ণ-বর্ষণেই এ বিচিত্র শিবপুরী নিম্মাণ করিয়াছে? ভারতের প্রায় ত্রিশ কোটী হৃদয়ের ভক্তিভাব এতকাল ধরিয়া এইরূপে এই নগরীতে যে সমভাবে মিলিত থাকিয়া ইহার এইরূপ বহিঃপ্রকাশ আনয়ন করিতেছে, এ কথা ভাবিয়া কাহার মন না স্তম্ভিত হইবে? কে না এই বিপুল ভাবপ্রবাহের অদম্য বেগ দেখিয়া মোহিত এবং উহার উৎপত্তিনির্ণয় করিতে যাইয়া আত্মহারা হইবে? কে না বিস্মিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে বলিবে—এ সৃষ্টি বাস্তবিকই অতুলনীয়, বাস্তবিকই ইহা মনুষ্যকৃত নহে, বাস্তবিকই অসহায় জীবের প্রতি দীনশরণ আর্ত্তৈকত্রাণ শ্রীবিশ্বনাথের

অপার করুণাই ইহার জন্ম দিয়াছে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শক্তিই শ্রীঅন্নপূর্ণারূপে এখানে চিরাধিষ্ঠিতা থাকিয়া অন্নবিতরণে জীবের অন্নময় ও প্রাণময় শরীরের এবং আধ্যাত্মিক ভাববিতরণে তাহার মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় শরীরের পূর্ণ পুষ্টিবিধান করিতেছেন এবং দ্রুতপদে তাহাকে মুক্তি বা শ্রীবিশ্বনাথের সহিত ঐকাত্ম্যবোধে আনয়ন করিতেছেন! ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর এখানে আগমনমাত্রেই যে ঐ দিব্য হেমময় ভাবপ্রবাহ শিবপুরীর সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাইবেন এবং উহারই জমাট প্রকাশ-রূপে এ নগরীকে সুবর্ণময় বলিয়া উপলব্ধি করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

স্বর্ণময় কাশী দেখিয়া ঠাকুরের ঐ স্থান অপবিত্র করিতে ভয়

প্রকাশশীল পদার্থমাত্রই হিন্দুর নয়নে সত্ত্বগুণ-প্রসূত ও পবিত্র। আলোক হইতে পদার্থসকলের প্রকাশ, সে জন্য আলোক বা উজ্জ্বলতা আমাদের নিকট পবিত্র; দেবতার নিকটে জ্যোৎপ্রদীপ রাখা, দেবদেবীর সম্মুখে দীপ নির্ব্বাণ না করা, এই সকল শাস্ত্র-নিয়ম হইতেই আমরা এ কথা বুঝিতে পারি। এজন্যই বোধ হয় আবার উজ্জ্বলপ্রকাশযুক্ত সুবর্ণাদি পদার্থ-সকলকে পবিত্র বলিয়া দেখিবার, শরীরের অধোভাগে সুবর্ণালঙ্কার-ধারণ না করিবার বিধিসমূহের উৎপত্তি। বারাণসী সর্ব্বদা সুবর্ণময় দেখিতে পাইয়া শৌচাদি করিয়া সুবর্ণকে অপবিত্র করিতে হইবে বলিয়া বালকস্বভাব ঠাকুর প্রথম প্রথম ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এজন্য তিনি মথুরকে বলিয়া পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া কয়েকদিন অসীর পারে গমন ও তথায় (বারাণসীর

বাহিরে) শৌচাদি সারিয়া আসিতেন। পরে ঐ ভাবের বিরামে আর ঐরূপ করিতে হইত না।

কাশীতে মরিলেই জীবের মুক্তি হওয়া সম্বন্ধে ঠাকুরের মণিকর্ণিকায় দর্শন

কাশীতে আর একটি বিশেষ দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। বারাণসীর মণিকর্ণিকাদি পঞ্চতীর্থ দর্শন করিতে অনেকেই গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে যাইয়া থাকেন। মথুরও ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তদ্রূপে গমন করিয়াছিলেন। মণিকর্ণিকার পাশেই কাশীর প্রধান শ্মশান-ভূমি। মথুরের নৌকা যখন মণিকর্ণিকা ঘাটের সম্মুখে আসিল তখন দেখা গেল শ্মশান চিতাধূমে ব্যাপ্ত—শবদেহসকল সেখানে দাহ হইতেছে। ভাবময় ঠাকুর সহসা সেদিকে দেখিয়াই একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া নৌকার বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং একেবারে নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। মথুরের পাণ্ডা ও নৌকার মাঝি-মাল্লারা লোকটি জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইবে ভাবিয়া ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু কাহাকেও আর ধরিতে হইল না; দেখা গেল ঠাকুর ধীর-স্থির-নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান আছেন এবং এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ ও হাস্যে তাঁহার মুখ-মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া যেন সে স্থানটিকে শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছে। মথুর ও ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় সাবধানে ঠাকুরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাঝি-মাল্লারাও বিস্ময়পূর্ণনয়নে ঠাকুরের অদ্ভুত ভাব দূরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে দিব্য ভাবের বিরাম হইলে সকলে মণিকর্ণিকায় নামিয়া স্নানদানাদি যাহা করিবার করিয়া পুনরায় নৌকাযোগে অন্যত্র গমন করিলেন।

তখন ঠাকুর তাঁহার সেই অদ্ভুত দর্শনের কথা মথুর প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "দেখিলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এত শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে তারক-ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করিতেছেন!—সর্ব্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার-বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্ব্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপে বহুকল্পের যোগ-তপস্যায় যে অদ্বৈতানুভবের ভূমানন্দ জীবের আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা তাহাকে শ্রীবিশ্বনাথ সদ্য সদ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন।"

মথুরের সঙ্গে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"কাশীখণ্ডে মোটামুটি ভাবে লেখা আছে, এখানে মৃত্যু হইলে ৺বিশ্বনাথ জীবকে নির্ব্বাণ-পদবী দিয়া থাকেন; কিন্তু কি ভাবে যে উহা দেন তাহা সবিস্তার লেখা নাই। আপনার দর্শনেই বুঝা যাইতেছে উহা কিরূপে সম্পাদিত হয়। আপনার দর্শনাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কথারও পারে চলিয়া যায়।"

কাশীতে অবস্থানকালে ঠাকুর এখানকার খ্যাতনামা সাধুদেরও দর্শন করিতে যান। তন্মধ্যে ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীকে দেখিয়াই তাঁহার বিশেষ প্রীতি হইয়াছিল। স্বামিজীর অনেক কথা ঠাকুর অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন। বলিতেন, "দেখিলাম সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ

তাঁহার শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন! তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে! উঁচু জ্ঞানের অবস্থা! শরীরের কোন হুঁশই নেই; রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য—সেই বালির ওপরেই সুখে শুয়ে আছেন! পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম। তখন কথা কন না—মৌনী। ইশারায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ঈশ্বর এক না অনেক?' তাতে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন—'সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো এক; নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক।' তাঁকে দেখিয়ে হৃদেকে বলেছিলাম, 'একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে।'"

ঠাকুরের ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীকে দর্শন

কাশীতে কিছু কাল থাকিয়া ঠাকুর মথুর বাবুর সহিত বৃন্দাবনে গমন করেন। শুনিয়াছি বাঁকাবিহারী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তথায় তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবেশ হইয়াছিল—আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন! আবার সন্ধ্যাকালে রাখাল বালকগণ গরুর পাল লইয়া যমুনা পার হইয়া গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে দেখিতে দেখিতে তাহাদের ভিতর শিখিপুচ্ছধারী নবনীরদশ্যাম গোপালকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। ঠাকুর এখানে নিধুবন, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি ব্রজের কয়েকটি স্থানও দর্শন করিতে যান। ব্রজের এইসকল স্থান তাঁহার বৃন্দাবন অপেক্ষা অধিক ভাল লাগিয়াছিল এবং ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে দর্শন করিয়া এইসকল

শ্রীবৃন্দাবনে 'বাঁকাবিহারী' মূর্ত্তি ও ব্রজ-দর্শনে ঠাকুরের ভাব

স্থানেই তাঁহার বিশেষ প্রেমের উদয় হইয়াছিল। শুনিয়াছি গোবর্দ্ধনাদি দর্শন করিতে যাইবার কালে মথুর তাঁহাকে পাল্কীতে পাঠাইয়া দেন এবং দেবস্থানেও দরিদ্রদিগকে দান করিতে করিতে যাইবেন বলিয়া পাল্কীর এক পার্শ্বে একখানি বস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর টাকা আধুলি সিকি দু-আনি ইত্যাদি কাঁড়ি করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সকল স্থানে যাইতে যাইতেই ঠাকুর ভাবে প্রেমে এতদূর বিহ্বল হইয়া পড়েন যে ঐ সকল আর হাতে করিয়া তুলিয়া দান করিতে পারেন নাই! অগত্যা ঐ বস্ত্রের এক কোণ ধরিয়া টানিয়া স্থানে স্থানে দরিদ্রদিগের ভিতর ছড়াইতে ছড়াইতে গিয়াছিলেন।

ব্রজে ঠাকুরের বিশেষ প্রীতি

ব্রজের এই সকল স্থানে ঠাকুর সংসারবিরাগী অনেক সাধককে কূপের[১] ভিতর পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া বাহিরের সকল বিষয় হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া জপ-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছিলেন। ব্রজের প্রাকৃতিক শোভা, ফল-ফুলে শোভিত ক্ষুদ্র গিরি-গোবর্দ্ধন, মৃগ ও শিখি-কুলের বনমধ্যে যথা তথা নিঃশঙ্ক বিচরণ, সাধু-তপস্বীদের নিরন্তর ঈশ্বরের চিন্তায় দিনযাপন এবং সরল ব্রজবাসীদের কপটতাশূন্য সশ্রদ্ধ ব্যবহার ঠাকুরের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাহার উপর নিধুবনে সিদ্ধপ্রেমিকা বর্ষীয়সী তপস্বিনী গঙ্গামাতার দর্শন ও মধুর সঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুর এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে,

---

১ বাঁশ-খড়ে তৈয়ারী একজন মাত্র লোকের বাসোপযোগী ঘরকে এখানে কূপ বলে। একটি মোচার অগ্রভাগ কাটিয়া জমীর উপর বসাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখিতে হয় কূপও দেখিতে তদ্রূপ।

তাঁহার মনে হইয়াছিল ব্রজ ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইবেন না ; এখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবেন।

নিধুবনের গঙ্গামাতা। ঠাকুরের ঐ স্থানে থাকিবার ইচ্ছা ; পরে বুড়ো মার সেবা কে করিবে ভাবিয়া কলিকাতায় ফিরা

গঙ্গামাতার তখন প্রায় ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে। বহুকাল ধরিয়া ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রেমবিহ্বল ব্যবহার দেখিয়া এখানকার লোকে তাঁহাকে শ্রীরাধিকার প্রধানা সঙ্গিনী ললিতা সখী কোন কারণবশতঃ স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া জীবকে প্রেমশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অবতীর্ণা বলিয়া মনে করিত। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি ইনি দর্শন-মাত্রেই ধরিতে পারিয়াছিলেন, ঠাকুরের শরীরে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় মহাভাবের প্রকাশ এবং সেজন্য ইনি ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধিকাই স্বয়ং অবতীর্ণা ভাবিয়া 'দুলালি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। 'দুলালি'র এইরূপ অযত্নলভ্য দর্শন পাইয়া গঙ্গামাতা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহার এতকালের হৃদয়ের সেবা ও ভালবাসা আজ সফল হইল! ঠাকুরও তাঁহাকে পাইয়া চির-পরিচিতের ন্যায় তাঁহারই আশ্রয়ে সকল কথা ভুলিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রেমে এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, মথুর প্রভৃতির মনে ভয় হইয়াছিল ঠাকুর বুঝি আর তাঁহাদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন না! পরম অনুগত মথুরের মন এই ভাবনায় যে কিরূপ আকুল হইয়াছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। যাহা হউক, ঠাকুরের মাতৃভক্তিই পরিশেষে জয়লাভ করিল এবং তাঁহার

ব্রজে থাকিবার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। ঠাকুর এ সম্বন্ধে আমাদের বলিয়াছিলেন, "ব্রজে গিয়ে সব ভুল হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল আর ফিরব না কিন্তু কিছুদিন বাদে মার কথা মনে পড়ল, মনে হল তাঁর কত কষ্ট হবে, কে তাঁকে বুড়ো বয়সে দেখবে, সেবা করবে। ঐ কথা মনে উঠায় আর সেখানে থাকতে পারলুম না।"

ঠাকুরের জীবনে পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ও গুণসকলের অপূর্ব্ব সম্মিলন। সন্ন্যাসী হইয়াও ঠাকুরের মাতৃসেবা

বাস্তবিক যতই ভাবিয়া দেখা যায়, এ অলৌকিক পুরুষের সকল কথা ও চেষ্টা ততই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়, ততই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণসকলের ইঁহাতে অপূর্ব্বভাবে সম্মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়! দেখনা, শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে শরীর-মন-সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলেও ঠাকুর সত্যটি তাঁহাকে দিতে পারিলেন না, জগতের সকল ব্যক্তির সহিত লৌকিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াও নিজ জননীর প্রতি ভালবাসা ও কর্ত্তব্যটি ভুলিতে পারিলেন না, পত্নীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধের নামগন্ধ কোনকালে না রাখিলেও গুরুভাবে তাঁহার সহিত সর্ব্বকালে সপ্রেম সম্বন্ধ রাখিতে বিস্মৃত হইলেন না; ঠাকুরের এইরূপ অলৌকিক চেষ্টার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে! পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের কোন্ আচার্য্য বা অবতার-পুরুষের জীবনে এইরূপ অদ্ভুত বিপরীত চেষ্টার একত্র সমাবেশ ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়? কে না বলিবে এরূপ আর কখনও কোথায়ও দেখা যায় নাই? ঈশ্বরাবতার বলিয়া ইঁহাকে ধারণা করুক আর নাই করুক, কে না স্বীকার করিবে এরূপ দৃষ্টান্ত

আধ্যাত্মিক জগতে আর একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? ঠাকুরের বর্ষীয়সী মাতাঠাকুরাণী জীবনের শেষ কয়েক বৎসর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটেই বাস করিতেন এবং তাঁহার সকল প্রকার সেবা-শুশ্রূষা ঠাকুর নিজ হস্তে নিত্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন—এ কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে বহু বার শ্রবণ করিয়াছি। আবার সেই আরাধ্যা মাতার যখন দেহান্ত হইল তখন ঠাকুরকে শোকসন্তপ্ত হইয়া এতই কাতর ও অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা গিয়াছিল যে, সংসারে বিরল কাহাকেও কাহাকেও ঐরূপ করিতে দেখা যায়! মাতৃবিয়োগে ঐরূপ কাতর হইলেও কিন্তু তিনি যে সন্ন্যাসী, একথা ঠাকুর একক্ষণের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। সন্ন্যাসী হওয়ায় মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ও শ্রাদ্ধাদি করিবার নিজের অধিকার নাই বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দ্বারা উহা সম্পাদিত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিজনে বসিয়া মাতার নিমিত্ত রোদন করিয়াই মাতৃঋণের যথাসম্ভব পরিশোধ করিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদের কতদিন বলিয়াছিলেন, "ওরে, সংসারে বাপ মা পরম গুরু; যতদিন বেঁচে থাকেন যথাশক্তি উঁহাদের সেবা করতে হয়, আর মরে গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়; যে দরিদ্র, কিছু নেই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নেই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাঁদতে হয়; তবে তাঁদের ঋণশোধ হয়! কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য বাপ-মার আজ্ঞালঙ্ঘন করা চলে, তাতে দোষ হয় না; যেমন প্রহ্লাদ বাপ বললেও কৃষ্ণনাম নিতে ছাড়ে নি; এমন কি, ধ্রুব মা বারণ করলেও তপস্যা করতে বনে গিয়েছিল; তাতে তাদের দোষ হয় নি।" এইরূপে ঠাকুরের মাতৃভক্তির ভিতর

দিয়াও গুরুভাবের অদ্ভুত বিকাশ ও লোকশিক্ষা দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি!

গঙ্গামাতার নিকট হইতে কষ্টে বিদায়গ্রহণ করিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমন করেন। আমরা শুনিয়াছি কয়েক দিন সেখানে থাকিবার পরে দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর স্বুবর্ণ প্রতিমা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে প্রেমে মোহিত হইয়াছিলেন। কাশী হইতে গয়াধামে যাইবার মথুরের ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর সেখানে যাইতে অমত করায় মথুর সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি ঠাকুরের পিতা গয়াধামে আগমন করিয়াই ঠাকুর যে তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন একথা স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং এইজন্যই জন্মিবার পর তাঁহার নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গয়াধামে ৺গদাধরের পাদপদ্মদর্শনে প্রেমে বিহ্বল হইয়া তাঁহা হইতে পৃথক্‌ভাবে নিজ শরীরধারণের কথা পাছে একেবারে ভুলিয়া যান এবং তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত পুনরায় সম্মিলিত হন—এই ভয়েই ঠাকুর যে এখন মথুরের সহিত গয়ায় যাইতে অমত করিয়াছিলেন, একথাও তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিয়াছেন। ঠাকুরের ধ্রুব ধারণা ছিল, যিনিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই এখন তাঁহার শরীর আশ্রয় করিয়া ধরায় আগমন করিয়াছেন। সেজন্য পূর্ব্বোক্ত পিতৃস্বপ্নে পরিজ্ঞাত নিজ

সমাধিস্থ হইয়া শরীরত্যাগ হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের গয়াধামে যাইতে অস্বীকার। ঐরূপ ভাবের কারণ কি?

বর্ত্তমান শরীর-মনের উৎপত্তিস্থল গয়াধাম এবং যে যে স্থলে অন্য অবতারপুরুষেরা লীলাসম্বরণ করিয়াছিলেন সেই সেই স্থান দর্শন করিতে যাইবার কথায় তাঁহার মনে কেমন একটা অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হইতে দেখিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল স্থানে যাইলে তাঁহার শরীর থাকিবে না, এমন গভীর সমাধিস্থ হইবেন যে তাহা হইতে তাঁহার মন আর নিম্নে মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসিবে না! কারণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাসম্বরণ-স্থল নীলাচল বা ৺পুরীধামে যাইবার কথাতেও ঠাকুর ঐরূপ ভাব অন্য সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুধু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কেন, ভক্তদের কাহাকেও যদি তিনি ভাব-নয়নে কোন দেববিশেষের অংশ বা বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন তবে ঐ দেবতার বিশেষ লীলাস্থলে যাইবার বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধেও ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিতেন। ঠাকুরের ঐ ভাবটি পাঠককে বুঝান দুরূহ। উহাকে 'ভয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করাটা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ সামান্য সমাধিবান পুরুষেরাই যখন দেহী কিরূপে মৃত্যুকালে শরীরটা ছাড়িয়া যায় জীবৎকালেই তাহার অনুভব করিয়া মৃত্যুকে কৌমার যৌবনাদি দেহের পরিবর্ত্তন-সকলের ন্যায় একটা পরিবর্ত্তনবিশেষ বলিয়া দেখিতে পাইয়া নির্ভয় হইয়া থাকেন, তখন ইচ্ছামাত্রেই গভীরসমাধিবান অবতারপুরুষেরা যে একেবারে অভীঃ মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? উহাকে ইতরসাধারণের ন্যায় শরীরটা রক্ষা করিবার বা বাঁচিবার আগ্রহও বলিতে পারি না। কারণ ইতরসাধারণে যে ঐরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে সেটা স্বার্থসুখ বা ভোগের জন্য। কিন্তু

যাঁহাদের মন হইতে স্বার্থপরতা চিরকালের মত ধুইয়া-পুঁছিয়া গিয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে আর ও কথা খাটে না। তবে ঠাকুরের মনের পূর্ব্বোক্ত ভাব আমরা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের অভিধানে, আমাদের মনে যে সকল ভাব উঠে তাহাই বুঝাইবার, প্রকাশ করিবার উপযোগী শব্দসমূহ পাওয়া যায়। ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষদিগের মনের অত্যুচ্চ দিব্য ভাবসকল প্রকাশ করিবার সে সকল শব্দের সামর্থ্য কোথায়! অতএব হে পাঠক, এখানে তর্ক-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া ঠাকুর ঐ সকল বিষয় যে ভাবে বলিয়া যাইতেন তাহা বিশ্বাসের সহিত শুনিয়া যাওয়া এবং কল্পনাসহায়ে ঐ উচ্চ-ভাবের যথাসম্ভব ছবি মনে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর আর নাই।

কার্য্য-পদার্থের কারণ-পদার্থে লয় হওয়াই নিয়ম

ঠাকুর বলিতেন এবং শাস্ত্রেও ইহার নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, যে প্রকাশ যেখান হইতে বা যে বস্তু বা ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকাশ পুনরায় সেই স্থলে বা সেই বস্তু বা ব্যক্তির বিশেষ সমীপাগত হইলে তাহাতেই লয় হইয়া যায়। ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি বা প্রকাশ; সেই জীব আবার জ্ঞানলাভ দ্বারা তাঁহার সমীপাগত হইলেই তাঁহাতে লীন হইয়া যায়! অনন্ত মন হইতে তোমার আমার ও সকলের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত মনের উৎপত্তি বা প্রকাশ; আমাদের ভিতর কাহারও সেই ক্ষুদ্র মন নির্লিপ্ততা, করুণা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের বৃদ্ধি করিতে করিতে সেই অনন্ত মনের সমীপাগত বা সদৃশ হইলেই তাহাতে লীন হইয়া যায়। স্থূল জগতেও ইহাই নিয়ম। সূর্য্য হইতে

পৃথিবীর বিকাশ, সেই পৃথিবী আবার কোনরূপে সূর্য্যের সমীপাগত হইলেই তাহাতে লীন হইয়া যাইবে। অতএব বুঝিতে হইবে ঠাকুরের ঐরূপ ধারণার নিম্নে আমাদের অজ্ঞাত কি একটা ভাববিশেষ আছে এবং বাস্তবিক যদি ৺গদাধর বলিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষ থাকেন এবং ঠাকুরের শরীর-মনটার উৎপত্তি ও বিকাশ তাঁহা হইতে কোন কারণে হইয়া থাকে, তবে ঐ উভয় পদার্থ পুনরায় সমীপাগত হইলে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া একত্র মিলিত হইবে, একথায় যুক্তিবিরুদ্ধতাই বা কি আছে?

অবতারপুরুষেরা যে ইতরসাধারণ জীবের ন্যায় নহেন, এ কথা আর যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইতে হয় না। তাঁহাদের ভিতর অচিন্ত্য কল্পনাতীত শক্তি-প্রকাশ দেখিয়াই জীব অবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের পূজাদান ও তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকে। মহর্ষি কপিলাদি ভারতের তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকগণ ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিমান পুরুষদিগের জীবনরহস্য ভেদ করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কি কারণে তাঁহাদের ভিতর দিয়া ইতরসাধারণাপেক্ষা সমধিক শক্তিপ্রকাশ হয়, এ বিষয়ের নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা প্রথমেই দেখিলেন সাধারণ কর্ম্মবাদ ইহার মীমাংসায় সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ ইতরসাধারণ পুরুষের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্ম স্বার্থসুখান্বেষণেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহাদের কৃত কার্য্যের আলোচনায় দেখা যায়, সে উদ্দেশ্যের একান্ত অভাব। পরের দুঃখমোচনের বাসনাই ইঁহাদের ভিতর

অবতার-পুরুষদিগের জীবনরহস্যের মীমাংসা করিতে কর্ম্মবাদ সক্ষম নহে। উহার কারণ

অদম্য উৎসাহ আনয়ন করিয়া ইঁহাদিগকে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকে এবং সে বাসনার সম্মুখে ইঁহারা নিজের সমস্ত ভোগসুখ এককালে বলি প্রদান করিয়া থাকেন। আবার পার্থিব মান-যশলাভ যে ঐ বাসনার মূলে বর্ত্তমান তাহাও দেখা যায় না। কারণ লোকৈষণা, পার্থিব মান-যশ ইঁহারা কাকবিষ্ঠার ন্যায় সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়াই থাকেন। দেখনা, নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় বহুকাল বদরিকাশ্রমে তপস্যায় কাটাইলেন, জগতের কল্যাণোপায়-নির্দ্ধারণের জন্য। শ্রীরামচন্দ্র প্রাণের প্রতিমা সীতাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন প্রজাদিগের কল্যাণের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। বুদ্ধদেব রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিলেন জন্ম-জরা-মরণাদি-দুঃখের হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া। ঈশা প্রাণপাত করিলেন দুঃখশোকাকুল পৃথিবীতে প্রেম-স্বরূপ পরমপিতার প্রেমের রাজ্য-স্থাপনার জন্য। মহম্মদ অধর্ম্মের বিরুদ্ধেই তরবারি ধারণ করিলেন। শঙ্কর অদ্বৈতানুভবেই যথার্থ শান্তি জীবকে একথা বুঝাইতেই আপন শক্তি নিয়োগ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্য একমাত্র শ্রীহরির নামেই জীবের কল্যাণকারী সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে জানিয়া সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া উদ্দাম তাণ্ডবে হরিনাম-প্রচারেই জীবনোৎসর্গ করিলেন। কোন্ স্বার্থ ইঁহাদিগকে ঐ সকল কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিল? কোন্ আত্মসুখ-লাভের জন্য ইঁহারা জীবনে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন?

দার্শনিকগণ আরও দেখিলেন, অসাধারণ মানসিক অনুভবে মুক্ত-পুরুষদিগের শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়

বলিয়া তাঁহারা শাস্ত্র-দৃষ্টে স্বীকার করিয়া থাকেন, সে সমস্ত ইঁহাদের জীবনে বিশেষভাবে বিকশিত। কাজেই ঐ সকল পুরুষদিগকে বাধ্য হইয়াই এক নূতন শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে হইল। সাংখ্যকার কপিল বলিলেন, ইঁহাদের ভিতর এক প্রকার মহদুদার লোকৈষণা বা লোককল্যাণ-বাসনা থাকে। সে জন্য ইঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যাপ্রভাবে মুক্ত হইয়াও নির্ব্বাণ-পদবীতে অবস্থান করেন না—প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকেন, বা প্রকৃতিগত সমস্ত শক্তিই তাঁহাদের শক্তি, এই প্রকার বোধে এক কল্পকাল অবস্থান করিয়া থাকেন এবং এজন্যই ইঁহাদের মধ্যে যিনি যে কল্পে ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন তিনিই সে কল্পে অপর সাধারণ মানবের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন। কারণ প্রকৃতির ভিতর যত কিছু শক্তি আছে সে সমস্তই আমার বলিয়া যাঁহার বোধ হইবে তিনি সে সমস্ত শক্তিই ইচ্ছামত প্রয়োগ ও সংহার করিতে পারিবেন। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র শরীর-মনে প্রকৃতির যে সকল শক্তি রহিয়াছে সে সকলকে আমার বলিয়া বোধ করিতেছি বলিয়াই আমরা যেমন উহাদের ব্যবহার করিতে পারিতেছি, তাঁহারাও এরূপ প্রকৃতির সমস্ত শক্তিসমূহ তাঁহাদের আপনার বলিয়া বোধ করায় সে সমস্তই ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিবেন। সাংখ্যকার কপিল এইরূপে সর্ব্বকালব্যাপী এক নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও এককল্পব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান

মুক্তাত্মার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণসকল অবতার-পুরুষে বাল্যকালাবধি প্রকাশ দেখিয়া দার্শনিকগণের মীমাংসা। সাংখ্য-মতে তাঁহারা 'প্রকৃতি-লীন'-শ্রেণী

পুরুষসকলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের 'প্রকৃতিলীন' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

বেদান্তকার আবার একমাত্র ঈশ্বর পুরুষের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং তিনিই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন বলিয়া ঐ সকল বিশেষ শক্তিমান পুরুষদিগকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ অংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ পুরুষেরা লোককল্যাণকর এক একটি বিশেষ কার্য্যের জন্যই আবশ্যকমত জন্মগ্রহণ করেন এবং তদুপযোগী শক্তিসম্পন্নও হইয়া আসেন দেখিয়া ইঁহাদিগের 'আধিকারিক' নাম প্রদান করিয়াছেন। 'আধিকারিক' অর্থাৎ কোন একটি কার্য্যবিশেষের অধিকার বা সেই কার্য্যটি সম্পন্ন করিবার ভার ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এইরূপ পুরুষসকলেও আবার উচ্চাবচ শক্তির প্রকাশ দেখিয়া এবং ইঁহাদের কাহারও কার্য্য সমগ্র পৃথিবীর সকল লোকের সর্ব্বকাল কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত ও কাহারও কার্য্য একটি প্রদেশের বা তদন্তর্গত একটি দেশের লোকসমূহের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত দেখিয়া বেদান্তকার আবার এই সকল পুরুষের ভিতর কতকগুলিকে ঈশ্বরাবতার এবং কতকগুলিকে সমান্য-অধিকারপ্রাপ্ত নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটী পুরুষশ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকারের ঐ মতকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াই পুরাণকারেরা পরে কল্পনাসহায়ে অবতার-পুরুষদিগের প্রত্যেকে কে কতটা ঈশ্বরের অংশসম্ভূত ইহা নির্দ্ধারণ করিতে

বেদান্ত বলেন, তাঁহারা 'আধিকারিক' এবং ঐ শ্রেণীর পুরুষদিগের ঈশ্বরাবতার ও নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটীরূপ দুই বিভাগ আছে

অগ্রসর হইয়া ঐ চেষ্টার একটু বাড়াবাড়ি করিয়া বসিয়াছেন এবং ভাগবৎকার—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।

ইত্যাদি বচন প্রয়োগ করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে এক স্থলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, গুরুভাবটি স্বয়ং ঈশ্বরেরই ভাব। অজ্ঞানমোহে পতিত জীবকে উহার পারে স্বয়ং যাইতে অক্ষম দেখিয়া তিনিই অপার করুণায় তাহাকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে আগ্রহবান হন। ঈশ্বরের সেই করুণাপূর্ণ আগ্রহ এবং তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া চেষ্টাদিই শ্রীগুরু ও গুরুভাব। ইতরসাধারণ মানবের ধরিবার বুঝিবার স্থবিধার জন্য সেই গুরুভাব কখন কখন বিশেষ নরাকারে আমাদের নিকট আবহমানকাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সে সকল পুরুষকেই জগৎ অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। অতএব বুঝা যাইতেছে, অবতারপুরুষেরাই মানবসাধারণের যথার্থ গুরু।

আধিকারিক পুরুষদিগের শরীর-মন সেজন্য এমন উপাদানে গঠিত দেখা যায় যে, তাহাতে ঐশ্বরিক ভাব-প্রেম ও উচ্চাঙ্গের শক্তিপ্রকাশ ধারণ ও হজম করিবার সামর্থ্য থাকে। জীব এতটুকু আধ্যাত্মিক শক্তি ও লোকমান্য পাইলেই অহঙ্কৃত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; আধিকারিক পুরুষেরা ঐ সকল শক্তি তদপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে অধিক পরিমাণে পাইলেও কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বুদ্ধিভ্রষ্ট ও অহঙ্কৃত হন না। জীব সকলপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমাধিতে আত্মানুভবের পরম আনন্দ একবার কোনরূপে পাইলে আর সংসারে কোন কারণেই ফিরিতে চাহে না;

আধিকারিক পুরুষদিগের জীবনে সে আনন্দের যেমনি অনুভব হয়, অমনি মনে হয় অপর সকলকে কি উপায়ে এ আনন্দের ভাগী করিতে পারি। জীবের ঈশ্বর-দর্শনের পরে আর কোন কার্য্যই থাকে না; আধিকারিক পুরুষদিগের সেই দর্শনলাভের পরেই যে বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য তাঁহারা আসিয়াছেন তাহা ধরিতে বুঝিতে পারেন এবং সেই কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্য আধিকারিক পুরুষদিগের সম্বন্ধে নিয়মই এই যে, যতদিন না তাঁহারা যে কার্য্যবিশেষ করিতে আসিয়াছেন তাহা সমাপ্ত করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে সাধারণ মুক্তপুরুষদিগের মত 'শরীরটা এখনি যায় যাক্, ক্ষতি নাই,' এরূপ ভাবের উদয় কখনও হয় না—মনুষ্যলোকে বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ঐ আগ্রহে ও জীবের বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কার্য্যশেষ হইলেই আধিকারিক পুরুষ উহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন এবং আর তিলার্দ্ধও সংসারে না থাকিয়া পরম আনন্দে সমাধিতে দেহত্যাগ করেন। জীবের ইচ্ছামাত্রই সমাধিতে শরীরত্যাগ তো দূরের কথা—জীবনের কার্য্য যে শেষ হইয়াছে এরূপ উপলব্ধিই হয় না; এ জীবনে অনেক বাসনা পূর্ণ হইল না এইরূপ উপলব্ধিই হইয়া থাকে। অন্য সকল বিষয়েও তদ্রূপ প্রভেদ থাকে। সেজন্যই আমাদের মাপকাঠিতে অবতার বা আধিকারিক পুরুষদিগের জীবন ও কার্য্যের উদ্দেশ্য মাপিতে যাইয়া আমাদিগকে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

আধিকারিক পুরুষদিগের শরীর-মন সাধারণ মানবাপেক্ষা ভিন্ন উপাদানে গঠিত। সেজন্য তাঁহাদের সঙ্কল্প ও কার্য্য সাধারণাপেক্ষা বিভিন্ন ও বিচিত্র

'গয়ায় যাইলে শরীর থাকিবে না,' 'জগন্নাথে যাইলে চিরসমাধিস্থ হইবেন'—ঠাকুরের এই সকল কথাগুলির ভাব কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পাঠকের কিছু কিছু জানা আবশ্যক। এজন্যই আমরা যত সহজে পারি সংক্ষেপে উহার আলোচনা এখানে করিলাম। ঠাকুরের কোন ভাবটিই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় পাঠক ইহাও বুঝিতে পারিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুর মথুরের সহিত ৺গয়াধামে যাইতে অস্বীকার করেন। কাজেই সে যাত্রায় কাহারও আর গয়াদর্শন হইল না। বৈদ্যনাথ হইয়া কলিকাতায় সকলে প্রত্যাগমন করিলেন। বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের লোকসকলের দারিদ্র্য দেখিয়াই ঠাকুরের হৃদয় করুণাপূর্ণ হয় এবং মথুরকে বলিয়া তাহাদের পরিতোষপূর্ব্বক একদিন খাওয়াইয়া প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র প্রদান করেন। একথার বিস্তারিত উল্লেখ আমরা লীলাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই একস্থলে করিয়াছি।[১]

কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থ ভিন্ন ঠাকুর একবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থল নবদ্বীপ দর্শন করিতেও গমন করিয়াছিলেন; সেবারেও মথুর বাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদের এক সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, অবতারপুরুষদিগের মনের সম্মুখেও সকল সময় সকল সত্য প্রকাশিত থাকে না, তবে আধ্যাত্মিক জগতের যে বিষয়ের তত্ত্ব

ঠাকুরের নবদ্বীপ-দর্শন

১ গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, সপ্তম অধ্যায়ের শেষভাগ দেখ।

তাঁহারা জানিতে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, অতি সহজেই তাহা তাঁহাদের মন-বুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব সম্বন্ধে আমাদের ভিতর অনেকেই তখন সন্দিহান ছিলেন, এমন কি 'বৈষ্ণব'-অর্থে 'ছোটলোক' এই কথাই বুঝিতেন এবং সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত ঠাকুরকে অনেক সময় ঐ বিষয় জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। ঠাকুর তদুত্তরে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, "আমারও তখন তখন ঐ রকম মনে হোত রে; ভাবতুম, পুরাণ ভাগবত কোথায়ও কোন নামগন্ধ নেই—চৈতন্য আবার অবতার! ন্যাড়া-নেড়ীরা টেনে বুনে একটা বানিয়েচে আর কি!—কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হোত না। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ (দেবভাবের) দেখবার জন্য এখানে ওখানে বড় গোঁসাইয়ের বাড়ী, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না—সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম! দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল; ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠচি এমন সময়ে দেখতে পেলুম অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখন দেখি নি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ-পথ দিয়ে ছুটে

ঠাকুরের চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে পূর্ব্বমত এবং নবদ্বীপে দর্শনলাভে ঐ মতের পরিবর্ত্তন

আসচে! অমনি 'ঐ এলোরে, এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভেতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম! জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল ধরে ফেললে। এই রকম, এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে—বাস্তবিকই অবতার, ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ!" ঠাকুর 'ঢের সব দেখিয়ে' কথাগুলি এখানে ব্যবহার করিলেন, কারণ পূর্ব্বেই একদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নগর-সঙ্কীর্ত্তন-দর্শনের কথা আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। সে দর্শনের কথা আমরা লীলাপ্রসঙ্গে অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া এখানে আর করিলাম না।[১]

পূর্ব্বোক্ত তীর্থসকল ভিন্ন ঠাকুর আর একবার মথুর বাবুর সহিত কালনা গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পাদস্পর্শে বাঙ্গালার গঙ্গাতীরবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রাম যে তীর্থবিশেষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। কালনা তাহাদেরই ভিতর অন্যতম। আবার বর্দ্ধমানরাজবংশের অষ্টাধিকশত শিব-মন্দির প্রভৃতি নানা কীর্ত্তি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া কালনাকে একটি বেশ জম-জমাট স্থান যে করিয়া তুলিয়াছে একথা দর্শনকারীমাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। ঠাকুরের কিন্তু এবার কালনা দর্শন করিতে যাওয়ার ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। এখানকার খ্যাতনামা সাধু ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল।

ঠাকুরের কালনায় গমন

ভগবানদাস বাবাজীর তখন অশীতি বৎসরেরও অধিক বয়ঃক্রম

১ সপ্তম অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগ দেখ।

হইবে। তিনি কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির কথা বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ অনেকেরই তখন শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। শুনিয়াছি একস্থানে একভাবে বসিয়া দিবারাত্র জপ-তপ-ধ্যান-ধারণাদি করায় শেষদশায় তাঁহার পদদ্বয় অসাড় ও অবশ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অশীতিবর্ষেরও অধিকবয়স্ক হইয়া শরীর অপটু ও প্রায় উত্থান-শক্তিরহিত হইলেও বৃদ্ধ বাবাজীর হরিনামে উদ্দাম উৎসাহ, ভগবৎ-প্রেমে অজস্র অশ্রুবর্ষণ ও আনন্দ কিছুমাত্র না কমিয়া বরং দিন-দিন বর্দ্ধিতই হইয়াছিল। এখানকার বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে পাইয়া তখন বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছিল এবং ত্যাগী বৈষ্ণব-সাধুগণের অনেকে তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শ ও উপদেশে নিজ নিজ জীবন গঠিত করিয়া ধন্য হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি বাবাজীর দর্শনে যিনিই তখন যাইতেন, তিনিই তাঁহার বহুকালানুষ্ঠিত ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা ও ভক্তির সঞ্চিত প্রভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দের উপলব্ধি করিয়া আসিতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে বাবাজী যে মতামত প্রকাশ করিতেন তাহাই তখন লোকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত। কাজেই সিদ্ধ বাবাজী তখন কেবল নিজের সাধনাতেই ব্যস্ত থাকিতেন না কিন্তু বৈষ্ণবসমাজের কিসে কল্যাণ হইবে, কিসে ত্যাগী বৈষ্ণবগণ ঠিক ঠিক ত্যাগের অনুষ্ঠানে ধন্য হইবে, কিসে ইতরসাধারণ সংসারী জীব শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত প্রেমধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া শান্তিলাভ করিবে—এ সকলের

ভগবানদাস বাবাজীর ত্যাগ, ভক্তি ও প্রতিপত্তি

আলোচনা ও অনুষ্ঠানে অনেক কাল কাটাইতেন। বৈষ্ণবসমাজের কোথায় কি হইতেছে, কোথায় কোন্ সাধু ভাল বা মন্দ আচরণ করিতেছে—সকল কথাই লোকে বাবাজীর নিকট আনিয়া উপস্থিত করিত এবং তিনিও সে সকল শুনিয়া বুঝিয়া তত্তৎ বিষয়ে যাহা করা উচিত তাহার উপদেশ করিতেন। ত্যাগ, তপস্যা ও প্রেমের জগতে চিরকালই কি যে এক অদৃশ্য সুদৃঢ় বন্ধন! লোকে বাবাজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে স্বতঃপ্রেরিত হইয়া ছুটিত। এইরূপে গুপ্তচরাদি সহায় না থাকিলেও সিদ্ধ বাবাজীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বত্রানুষ্ঠিত কার্য্যেই পতিত হইত এবং ঐ সমাজগত প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার প্রভাব অনুভব করিত। আর সে দৃষ্টি ও প্রভাবের সম্মুখে সরল বিশ্বাসীর উৎসাহ যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত; কপটাচারী আবার তেমনি ভীত কুণ্ঠিত হইয়া আপন স্বভাব-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পাইত।

ঠাকুরের তপস্যাকালে ভারতে ধর্ম্মান্দোলন

অনুরাগের তীব্র প্রেরণায় ঠাকুর যখন ঈশ্বরলাভের জন্য দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় লাগিয়াছিলেন এবং তাহাতে গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিকাশ হইতেছিল, তখন উত্তর ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই ধর্ম্মের একটা বিশেষ আন্দোলন যে চলিয়াছিল একথার উল্লেখ আমরা লীলাপ্রসঙ্গের অন্য স্থলে করিয়াছি।[১] কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী নানাস্থানের হরিসভাসকল এবং ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন, উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব অঞ্চলে শ্রীযুত দয়ানন্দ স্বামীজীর বেদধর্ম্মের আন্দোলন—যাহা এখন আর্য্যসমাজে পরিণত হইয়াছে, বাঙ্গালায়

১ পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ভাবের, কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের ও রাধাস্বামী মতের, গুজরাতে নারায়ণ স্বামী মতের—এইরূপে নানাস্থলে নানা ধর্ম্মমতের উৎপত্তি ও আন্দোলন এই সময়েরই কিছু অগ্র-পশ্চাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ আন্দোলনের সবিস্তার আলোচনা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; কেবল কলিকাতার কলুটোলা নামক পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ একটি হরিসভায় ঠাকুরকে লইয়া যে ঘটনা হইয়াছিল তাহাই এখানে আমরা পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের কলুটোলার হরিসভায় গমন

ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া একদিন ঐ হরিসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; ভাগিনেয় হৃদয় তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ—যাঁহার কথা আমরা পূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি—সেদিন সেখানে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে ব্রতী ছিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে ভাগবত শুনিবার জন্যই ঠাকুর তথায় গমন করিয়াছিলেন; এ কথা কিন্তু আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে যাহাই হউক, ঠাকুর যখন সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন ভাগবতপাঠ হইতেছিল এবং উপস্থিত সকলে তন্ময় হইয়া সেই পাঠ শ্রবণ করিতেছিল। ঠাকুরও তদ্দর্শনে শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন।

ঐ সভায় ভাগবতপাঠ

কলুটোলার হরিসভার সভ্যগণ আপনাদিগকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একান্ত পদাশ্রিত মনে করিতেন এবং ঐ কথাটি অনুক্ষণ স্মরণ রাখিবার জন্য তাঁহারা একখানি আসন বিস্তৃত রাখিয়া উহাতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া পূজা, পাঠ প্রভৃতি সভার সমুদয় অনুষ্ঠান ঐ আসনের

সম্মুখেই করিতেন। ঐ আসন 'শ্রীচৈতন্যের আসন' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। সকলে ভক্তিভরে উহার সম্মুখে প্রণাম করিতেন এবং উহাতে কাহাকেও কখন বসিতে দিতেন না। অন্য সকল দিবসের ন্যায় আজও পুষ্পমাল্যাদি-ভূষিত ঐ আসনের সম্মুখেই ভাগবতপাঠ হইতেছিল। পাঠক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকেই হরিকথা শুনাইতেছেন ভাবিয়া ভক্তিভরে পাঠ করিতেছিলেন এবং শ্রোতৃবৃন্দও তাঁহারই দিব্যাবির্ভাবের সম্মুখে বসিয়া হরিকথামৃতপান করিয়া ধন্য হইতেছি ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছিলেন। ঠাকুরের আগমনে শ্রোতা ও পাঠকের সে উল্লাস ও ভক্তিভাব যে শতগুণে সজীব হইয়া উঠিল, ইহা আর বলিতে হইবে না।

ঠাকুরের চৈতন্যাসন-গ্রহণ

ভাগবতের অমৃতোপম কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং 'শ্রীচৈতন্যাসনের' অভিমুখে সহসা ছুটিয়া যাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া এমন গভীরসমাধিমগ্ন হইলেন যে তাঁহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত হইল না। কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখের সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তিসকলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় সেই প্রকার ঊর্দ্ধোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ দেখিয়া বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন ঠাকুর ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন! তাঁহার শরীর-মন এবং ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যের শরীর-মনের মধ্যে স্থূলদৃষ্টে দেশকাল এবং অন্য নানা বিষয়ের বিস্তর ব্যবধান যে রহিয়াছে, ভাবমুখে ঊর্দ্ধে উঠিয়া সে বিষয়ের কিছুমাত্র প্রত্যক্ষই তিনি আর তখন করিতেছেন না! পাঠক পাঠ ভুলিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া

স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; শ্রোতারাও ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ ধরিতে বুঝিতে না পারিলেও একটা অব্যক্ত দিব্য ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মুগ্ধ শান্ত হইয়া রহিলেন, ভাল-মন্দ কোন কথাই সে সময়ে কেহ আর বলিতে সমর্থ হইলেন না। ঠাকুরের প্রবল ভাবপ্রবাহে সকলেই তৎকালের নিমিত্ত অবশ হইয়া অনির্দ্দেশ্য কোন এক প্রদেশে যেন ভাসিয়া চলিয়াছে—এইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উপলব্ধি করিয়া প্রথম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরে ঐ অব্যক্তভাব-প্রেরিত হইয়া সকলে মিলিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সমাধিতত্ত্বের আলোচনায়[১] পূর্ব্বে একস্থলে আমরা বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের যে নামবিশেষের ভিতর অনন্ত দিব্য ভাবরাশির উপলব্ধি করিয়া মন সমাধিলীন হয়, সেই নামাবলম্বনেই আবার সে নিম্নে নামিয়া বহির্জগতের উপলব্ধি করিয়া থাকে—ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে আমরা প্রত্যহ বারংবার ইহা বিশেষভাবে দেখিয়াছি। এখনও তাহাই হইল; সঙ্কীর্ত্তনে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে ঠাকুরের নিজশরীরের কতকটা হুঁশ আসিল এবং ভাবে প্রেমে বিভোর অবস্থায় কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি কখনও উদ্দাম মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন, আবার কখনও বা ভাবের আতিশয্যে সমাধিমগ্ন হইয়া স্থির নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টায় উপস্থিত সাধারণের ভিতর উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়া সকলেই কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখন 'শ্রীচৈতন্যের আসন' ঠাকুরের ঐরূপে অধিকার করাটা ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় হইয়াছে, এ কথার বিচার আর

১ গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, সপ্তম অধ্যায় দেখ।

করে কে ? এইরূপে উদ্দাম তাণ্ডবে বহুক্ষণ শ্রীহরির ও শ্রীমহাপ্রভুর গুণাবলীকীর্ত্তনের পর সকলে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া সেদিনকার সে দিব্য অভিনয় সাঙ্গ করিলেন এবং ঠাকুরও অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐরূপ করায় বৈষ্ণবসমাজে আন্দোলন

ঠাকুরের দিব্যপ্রভাবে হরিনামতাণ্ডবে উচ্চভাবপ্রবাহে উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য মানবের দোষদৃষ্টি স্তব্ধীভূত হইয়া থাকিলেও তাঁহার সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পর আবার সকলে পূর্ব্বের ন্যায় 'পুনর্মূ‌ষিক'-ভাব প্রাপ্ত হইল। বাস্তবিক, জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ভক্তি-সহায়ে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইতে যে সকল ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, তাহাদের উহাই দোষ। ঐ সকল ধর্ম্মপথের পথিকগণ শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তনাদি-সহায়ে কিছুক্ষণের জন্য আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চ আনন্দাবস্থায় অতি সহজে উঠিলেও পরক্ষণেই আবার তেমনি নিম্নে নামিয়া পড়েন। উহাতে তাঁহাদের বিশেষ দোষ নাই; কারণ উত্তেজনার পর অবসাদ আসাটা প্রকৃতির অন্তর্গত শরীর ও মনের ধর্ম্ম। তরঙ্গের পরেই 'গোড়', উত্তেজনার পরেই অবসাদ আসাটাই প্রকৃতির নিয়ম। হরিসভার সভ্যগণও উচ্চ ভাব-প্রবাহের অবসাদে এখন নিজ নিজ পূর্ব্ব প্রকৃতি ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদল ঠাকুরের ভাবমুখে 'শ্রীচৈতন্যাসন' ঐরূপে গ্রহণ করার পক্ষসমর্থন করিতে এবং অন্যদল ঐ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত হইলেন। উভয় দলে ঘোরতর দ্বন্দ্ব ও বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হইল, কিন্তু কিছুরই মীমাংসা হইল না।

ক্রমে ঐ কথা লোকমুখে বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভগবানদাস বাবাজীও উহা শুনিতে পাইলেন। শুধু শুনাই নহে, ভবিষ্যতে আবার ঐরূপ হইতে পারে—ভগবদ্ভাবের ভান করিয়া নাম-যশঃপ্রার্থী ধূর্ত্ত ভণ্ডেরাও ঐ আসন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐরূপে অধিকার করিয়া বসিতে পারে ভাবিয়া হরিসভার সভ্যগণের কেহ কেহ তাঁহার নিকটে ঐ আসন ভবিষ্যতে কিভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

চৈতন্যাসন-গ্রহণের কথা শুনিয়া ভগবানদাসের বিরক্তি

শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত সিদ্ধ বাবাজী নিজ ইষ্টদেবতার আসন অজ্ঞাতনামা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে শুনা অবধি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার উদ্দেশে কটুকাটব্য বলিতে এবং তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হরিসভার সভ্যগণের দর্শনে বাবাজীর সেই বিরক্তি ও ক্রোধ যে এখন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল এবং ঐরূপ বিসদৃশ কার্য্য সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়ায় তাঁহাদিগকেও যে বাবাজী অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বিশেষ ভর্ৎসনা করিলেন, এ কথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পরে ক্রোধশান্তি হইলে ভবিষ্যতে আর যাহাতে কেহ ঐরূপ আচরণ না করিতে পারে, বাবাজী সে বিষয়ে সকল বন্দোবস্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু যাহাকে লইয়া হরিসভার এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল তিনি ঐ সকল কথা বিশেষ কিছু জানিতে পারিলেন না।

ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বতঃপ্রেরিত হইয়া ভাগিনেয় হৃদয় ও মথুর বাবুকে সঙ্গে লইয়া কালনায়

উপস্থিত হইলেন। প্রত্যূষে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিলে মথুর থাকিবার স্থান প্রভৃতির বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইত্যবসরে হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া শহর দেখিতে বহির্গত হইলেন এবং লোকমুখে ঠিকানা জানিয়া ক্রমে ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরের ভগবানদাসের আশ্রমে গমন

বালকস্বভাব ঠাকুর পূর্ব্বাপরিচিত কোনও ব্যক্তির সম্মুখীন হইতে হইলে সকল সময়েই একটা অব্যক্ত ভয়লজ্জাদি-ভাবে প্রথম অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ঠাকুরের এ ভাবটি আমরা অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ হইল। হৃদয়কে অগ্রে যাইতে বলিয়া আপনি প্রায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। হৃদয় ক্রমে বাবাজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, "আমার মামা ঈশ্বরের নামে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়েন; অনেক দিন হইতেই ঐরূপ অবস্থা; আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।"

হৃদয়ের বাবাজীকে ঠাকুরের কথা বলা

হৃদয় বলেন, বাবাজীর সাধনসম্ভূত একটি শক্তির পরিচয় নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি পাইয়াছিলেন। কারণ প্রণাম করিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বাবাজীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আশ্রমে যেন কোনও মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, বোধ হইতেছে।" কথাগুলি বলিয়া বাবাজী নাকি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়াও দেখিয়াছিলেন; কিন্তু হৃদয় ভিন্ন অপর কাহাকেও

বাবাজীর জনৈক সাধুর কার্য্যে বিরক্তি-প্রকাশ

সে সময়ে আগমন করিতে না দেখিয়া সম্মুখাবস্থিত ব্যক্তিসকলের সহিত উপস্থিত প্রসঙ্গেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। জনৈক বৈষ্ণব সাধু কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য —এই প্রসঙ্গই তখন চলিতেছিল; এবং বাবাজী সাধুর ঐরূপ বিসদৃশ কার্য্যে বিষম বিরক্ত হইয়া—তাঁহার কণ্ঠী (মালা) কাড়িয়া লইয়া সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া দিবেন, ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপস্থিত মণ্ডলীর এক পার্শ্বে দীনভাবে উপবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত থাকায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভাল করিয়া কাহারও নয়নগোচর হইল না। তিনি ঐরূপে আসিয়া বসিবামাত্র হৃদয় তাঁহার পরিচায়ক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বাবাজীকে নিবেদন করিলেন। হৃদয়ের কথায় বাবাজী উপস্থিত কথায় বিরত হইয়া ঠাকুরকে এবং তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের আগমন হইল, ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বাবাজী হৃদয়ের সহিত কথার অবসরে মালা ফিরাইতেছেন দেখিয়া হৃদয় বলিলেন, "আপনি এখনও মালা রাখিয়াছেন কেন? আপনি সিদ্ধ হইয়াছেন, আপনার উহা এখন আর রাখিবার প্রয়োজন তো নাই?" ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে হৃদয় বাবাজীকে ঐরূপ প্রশ্ন করেন বা স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া করেন, তাহা আমাদের জানা নাই। বোধ হয় শেষোক্ত ভাবেই ঐরূপ করিয়াছিলেন। কারণ ঠাকুরের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া এবং তাঁহার সহিত সমাজের উচ্চাবচ নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া হৃদয়েরও তখন তখন

বাবাজীর লোকশিক্ষা দিবার অহঙ্কার

উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এবং যখন যেমন তখন তেমন কথা কহিবার ও প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার ক্ষমতা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বাবাজী হৃদয়ের ঐরূপ প্রশ্নে প্রথম দীনতা প্রকাশ করিয়া পরে বলিলেন, "নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্য ও-সকল রাখা নিতান্ত প্রয়োজন; নতুবা আমার দেখাদেখি লোকে ঐরূপ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।"

বাবাজীর ঐরূপ বিরক্তি ও অহঙ্কার দেখিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশে প্রতিবাদ

চিরকাল শ্রীশ্রীজগন্মাতার উপর সকল বিষয়ে বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আসায় ঠাকুরের নির্ভরশীলতা এত সহজ স্বাভাবিক ও মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, নিজে অহঙ্কারের প্রেরণায় কোনও কাজ করা দূরে থাকুক, অপর কেহ ঐরূপ করিতেছে বা করিব বলিতেছে দেখিলে বা শুনিলে তাঁহার মনে একটা বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। সেজন্যই তিনি ঈশ্বরের দাসভাবে অতি বিরল সময়ে 'আমি' কথাটির প্রয়োগ করা ছাড়া অপর কোনও ভাবে আমাদের ন্যায় ঐ শব্দের উচ্চারণ করিতে পারিতেন না! অল্প সময়ের জন্যও যে ঠাকুরকে দেখিয়াছে সেও তাঁহার ঐরূপ স্বভাব দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছে, অথবা অন্য কেহ কোনও কর্ম্ম 'আমি করিব' বলায় তাঁহার বিষম বিরক্তিপ্রকাশ দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছে—ঐ লোকটা কি এমন কুকাজ করিয়াছে যাহাতে তিনি এতটা বিরক্ত হইতেছেন! ভগবানদাসের নিকটে আসিয়াই ঠাকুর প্রথম শুনিলেন তিনি কণ্ঠী ছিঁড়িয়া লইয়া একজনকে তাড়াইয়া দিব বলিতেছেন। আবার অল্পক্ষণ পরেই শুনিলেন তিনি লোকশিক্ষা

দিবার জন্যই এখনও মালা-তিলকাদি-ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। বাবাজীর ঐরূপে বারংবার 'আমি তাড়াইব, আমি লোকশিক্ষা দিব, আমি মালা-তিলকাদি ত্যাগ করি নাই' ইত্যাদি বলায় সরলস্বভাব ঠাকুর আর মনের বিরক্তি আমাদের ন্যায় চাপিয়া সভ্যভব্য হইয়া উপবিষ্ট থাকিতে পারিলেন না। একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি? তুমি এখনও এত অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে? তুমি তাড়াইবে? তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে? যাঁহার জগৎ তিনি না শিখাইলে তুমি শিখাইবে?"—ঠাকুরের তখন সে অঙ্গাবরণ পড়িয়া গিয়াছে; কটিদেশ হইতে বস্ত্রও শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে এবং মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! তিনি তখন একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, কাহাকে কি বলিতেছেন তাহার কিছুমাত্র যেন বোধ নাই! আবার ঐ কয়েকটি কথামাত্র বলিয়াই ভাবের আতিশয্যে তিনি একেবারে নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

সিদ্ধ বাবাজীকে এপর্য্যন্ত সকলে মান্য-ভক্তিই করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিতে বা তাঁহার দোষ দেখাইয়া দিতে এ পর্য্যন্ত কাহারও সামর্থ্যে ও সাহসে কুলায় নাই। ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টা দেখিয়া তিনি প্রথম বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ইতরসাধারণ মানব যেমন ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে ক্রোধপরবশ হইয়া প্রতিহিংসা লইতেই প্রবৃত্ত হয় বাবাজীর মনে সেরূপ ভাবের উদয় হইল না! তপস্যাপ্রসূত সরলতা তাঁহার সহায় হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

বাবাজীর ঠাকুরের কথা মানিয়া লওয়া

কথাগুলির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিল। তিনি বুঝিলেন, বাস্তবিকই এ জগতে ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কর্ত্তা নাই। অহঙ্কৃত মানব যতই কেন ভাবুক না সে সকল কার্য্য করিতেছে, বাস্তবিক কিন্তু সে অবস্থার দাসমাত্র; যতটুকু অধিকার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে ততটুকুমাত্রই সে বুঝিতে ও করিতে পারে। সংসারী মানব যাহা করে করুক, ভক্ত ও সাধকের তিলেকের জন্য ঐ কথা বিস্মৃত হইয়া থাকা উচিত নহে। উহাতে তাঁহার পথভ্রষ্ট হইয়া পতনের সম্ভাবনা। এইরূপে ঠাকুরের শক্তিপূর্ণ কথাগুলিতে বাবাজীর অন্তর্দৃষ্টি অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে নিজের দোষ দেখাইয়া বিনীত ও নম্র করিল। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীরে অপূর্ব্ব ভাববিকাশ দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল ইনি সামান্য পুরুষ নহেন।

পরে ভগবৎপ্রসঙ্গে সেখানে যে এক অপূর্ব্ব দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিল একথা আমাদের সহজেই অনুমিত হয়। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের মুহুর্মুহুঃ ভাবাবেশ ও উদ্দাম আনন্দে বাবাজী মোহিত হইয়া দেখিলেন যে, যে মহাভাবের শাস্ত্রীয় আলোচনা ও ধারণায় তিনি এতকাল কাটাইয়াছেন তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে নিত্য প্রকাশিত। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা গভীর হইয়া উঠিল। পরে যখন বাবাজী শুনিলেন ইনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস যিনি কলুটোলার হরিসভায় ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া শ্রীচৈতন্যাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন ইঁহাকেই আমি অযথা কটুকাটব্য

ঠাকুর ও ভগবানদাসের প্রেমালাপ ও মথুরের আশ্রমস্থ সাধুদের সেবা

বলিয়াছি—ভাবিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ ও পরিতাপের অবধি রহিল না। তিনি বিনীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। এইরূপে ঠাকুর ও বাবাজীর সেদিনকার প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হইল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কিছুক্ষণ পরে মথুরের সন্নিধানে আগমন করিয়া ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইয়া বাবাজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করিলেন। মথুর বাবুও উহা শুনিয়া বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং আশ্রমস্থ দেববিগ্রহের সেবা ও একদিন মহোৎসবাদির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুভাব সম্বন্ধে শেষ কথা

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—গীতা, ৪র্থ, ৬।৭।৮

বেদ-প্রমুখ শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ হন। সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহার মনে কোনরূপ মিথ্যা সঙ্কল্পের কখন উদয় হয় না। তাঁহারা যখনই যে বিষয় জানিতে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সে বিষয় তখন প্রকাশিত হয়, অথবা তদ্বিষয়ের তত্ত্ব তাঁহারা বুঝিতে পারেন। কথাগুলি শুনিয়া ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা পূর্ব্বে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া কতই না মিথ্যা তর্কের অবতারণা করিয়াছি! বলিয়াছি, ঐ কথা যদি সত্য হয় তবে ভারতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ব্রহ্মজ্ঞেরা জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলেন কেন? হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্র মিলিত হইয়া যে জল হয়, একথা ভারতের কোন্ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন? তড়িৎ-

বেদে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে সর্ব্বজ্ঞ বলায় আমাদের না বুঝিয়া বাদানুবাদ

শক্তির সহায়ে চার-পাঁচ ঘণ্টার ভিতরেই যে ছয় মাসের পথ আমেরিকা-প্রদেশের সংবাদ আমরা এখানে বসিয়া পাইতে পারি একথা তাঁহারা বলিয়া যান নাই কেন? অথবা যন্ত্রসাহায্যে মানুষ যে বিহঙ্গমের ন্যায় আকাশচারী হইতে পারে, একথাই বা জানিতে পারেন নাই কেন?

ঠাকুর উহা কি ভাবে সত্য বলিয়া বুঝাইতেন। "ভাতের হাঁড়ির একটি ভাত টিপে বোঝা, সিদ্ধ হয়েছে কি না"

ঠাকুরের নিকট আসিয়াই শুনিলাম, শাস্ত্রের ঐ কথা ঐভাবে বুঝিতে যাইলে তাহার কোনও অর্থই পাওয়া যাইবে না; অথচ শাস্ত্র যেভাবে ঐ কথা বলিয়াছেন, সেভাবে দেখিলে উহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হইবে। এইজন্য ঠাকুর শাস্ত্রের ঐকথা দুই-একটি গ্রাম্য দৃষ্টান্তসহায়ে বুঝাইয়া বলিতেন, "হাঁড়িতে ভাত ফুটছে; চালগুলি সুসিদ্ধ হয়েছে কিনা জান্‌তে তুই তার ভেতর থেকে একটা ভাত তুলে টিপে দেখ্‌লি যে হয়েছে—আর অমনি বুঝতে পারলি যে, সব চালগুলি সিদ্ধ হয়েছে। কেন? তুই তো ভাতগুলির সব এক একটি করে টিপে টিপে দেখ্‌লি না—তবে কি করে বুঝলি? ঐ কথা যেমন বোঝা যায়, তেমনি জগৎসংসারটা নিত্য কি অনিত্য, সৎ কি অসৎ—একথাও সংসারের দুটো-চারটে জিনিস পরখ (পরীক্ষা) করে দেখেই বোঝা যায়। মানুষটা জন্মাল, কিছুদিন বেঁচে রইল, তারপর মলো; গোরুটাও—তাই; গাছটাও—তাই; এইরূপে দেখে দেখে বুঝ্‌লি যে, যে জিনিসেরই নাম আছে, রূপ আছে, সেগুলোরই এই ধারা। পৃথিবী, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, সকলের নাম রূপ আছে, তাদেরও এই ধারা।

এইরূপে জান্‌তে পার্‌লি, সমস্ত জগৎসংসারটারই এই স্বভাব। তখন জগতের ভিতরের সব জিনিসেরই স্বভাবটা জান্‌লি—কি না? এইরূপে যখনি সংসারটাকে ঠিক ঠিক অনিত্য, অসৎ বলে বুঝ্‌বি, অমনি সেটাকে আর ভালবাসতে পারবি না—মন থেকে ত্যাগ করে নির্ব্বাসনা হবি। আর যখনি ত্যাগ করবি, তখনি জগৎকারণ ঈশ্বরের দেখা পাবি। ঐরূপে যার ঈশ্বরদর্শন হলো সে সর্ব্বজ্ঞ হলো না তো কি হলো তা বল্‌!"

ঠাকুরের এত কথার পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম—ঠিক কথাই তো, একভাবে সর্ব্বজ্ঞই তো সে হইল বটে! কোন একটা পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতে পাওয়া এবং ঐ পদার্থটার উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে তাহা দেখিতে বা জানিতে পারাকেই তো আমরা সেই পদার্থের জ্ঞান বলিয়া থাকি। তবে পূর্ব্বোক্তভাবে জগৎসংসারটাকে জানা বা বুঝাকেও জ্ঞান বলিতে হইবে। আবার ঐ জ্ঞান জগদন্তর্গত সকল পদার্থ সম্বন্ধেই সমভাবে সত্য। কাজেই উহাকে জগদন্তর্গত সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞান বলিতে হয় এবং যাঁহার ঐরূপ জ্ঞান হয়, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ তো বাস্তবিকই বলা যায়! শাস্ত্র তো তবে ঠিকই বলিয়াছে!

কোন বিষয়ের উৎপত্তির কারণ হইতে লয় অবধি জানাই তদ্বিষয়ের সর্ব্বজ্ঞতা। ঈশ্বর-লাভে জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ হয়

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সত্যসঙ্কল্প হন, সিদ্ধসঙ্কল্প হন—শাস্ত্রীয় ঐ বচনেরও তখন একটা মোটামুটি অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম। বুঝিতে পারিলাম যে, এক-একটা বিষয়ে মনের সমগ্র চিন্তাশক্তি একত্রিত করিয়া অনুসন্ধানেই আমাদের তত্তদ্বিষয়ে জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা

নিত্য-প্রত্যক্ষ। তবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, যিনি আপন মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত এবং আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি যখনই যে কোনও বিষয়ে জানিবার জন্য মনের সর্ব্বশক্তি একত্রিত করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই অতি সহজে যে তিনি ঐ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন, এ কথা তো বিচিত্র নহে। তবে উহার ভিতর একটা কথা আছে—যিনি সমগ্র জগৎসংসারটাকে অনিত্য বলিয়া ধ্রুব-ধারণা করিয়াছেন এবং সর্ব্বশক্তির আকরস্বরূপ জগৎকারণ ঈশ্বরকে প্রেমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহার রেলগাড়ী চালাইতে, মানুষমারা কলকারখানা নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প বা প্রবৃত্তি হইবে কি-না। যদি ঐরূপ সঙ্কল্প তাঁহাদের মনে উদয় হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলেই তো আর ঐরূপ কলকারখানা নির্ম্মিত হইল না। ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ-লাভে দেখিলাম বাস্তবিকই ঐরূপ হয়। বাস্তবিকই তাঁহাদের ভিতর ঐরূপ প্রবৃত্তির উদয় হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। ঠাকুর কাশীপুরে দারুণ ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, এমন সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত মনঃশক্তি-প্রয়োগে রোগমুক্ত হইতে সজলনয়নে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি ঐরূপ চেষ্টা বা সঙ্কল্প করিতে পারিলেন না! বলিলেন যে, ঐরূপ করিতে যাইয়া সঙ্কল্পের একটা দৃঢ়তা বা আঁট কিছুতেই মনে আনিতে পারিলেন না! বলিলেন, "এ হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর মনকে সচ্চিদানন্দ হতে ফিরিয়ে কিছুতেই আন্‌তে পার্‌লুম না!

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হন, একথাও সত্য। ঐকথার অর্থ। ঠাকুরের জীবন দেখিয়া ঐ সম্বন্ধে কি বুঝা যায়। 'হাড়-মাসের খাঁচায় মন আন্‌তে পারলুম না'

সর্ব্বদা শরীরটাকে তুচ্ছ হেয় জ্ঞান করে যে মনটা জগদম্বার পাদপদ্মে চিরকালের জন্য দিয়েছি, সেটাকে এখন তা-থেকে ফিরিয়ে শরীরটাতে আন্‌তে পারি কিরে ?"

আর একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে করিলে পাঠকের ঐ বিষয়টি বুঝা সহজ হইবে। বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে ঠাকুর একদিন আসিয়াছেন। বেলা তখন দশটা হইবে। ঠাকুরের এখানে সে দিন আসাটা পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল। কাজেই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ অনেকগুলি যুবক-ভক্ত তাঁহার দর্শনলাভের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কখন ঠাকুরের সহিত এবং কখনও তাঁহাদের পরস্পরের ভিতরে নানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় দেখার কথায় ক্রমে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের কথা আসিয়া পড়িল। স্থূল চক্ষে যাহা দেখা যায় না ঐরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থও উহার সহায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, একগাছি অতি ক্ষুদ্র রোমকে ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিলে এক-গাছি লাঠির মত দেখায় এবং দেহের প্রত্যেক রোমগাছটি পেঁপের ডালের মত ফাঁপা ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় ইত্যাদি নানা কথা শুনিয়া ঠাকুর ঐ যন্ত্রসহায়ে দুই-একটি পদার্থ দেখিতে বালকের ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাজেই ভক্তগণ স্থির করিলেন, সেদিন অপরাহ্ণেই কাহারও নিকট হইতে ঐ যন্ত্র চাহিয়া আনিয়া ঠাকুরকে দেখাইবেন।

ঐ বিষয় বুঝিতে ঠাকুরের জীবন হইতে আর একটি ঘটনার উল্লেখ। 'মন উঁচু বিষয়ে রয়েছে, নীচে নামাতে পারলুম না'

তখন অনুসন্ধানে জানা গেল, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ স্বামিজীর ভ্রাতা,

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ—তিনি অল্প-দিন মাত্রই ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—ঐরূপ একটি যন্ত্র মেডিকেল কলেজ হইতে পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ যন্ত্রটি আনয়ন করিয়া ঠাকুরকে দেখাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোক প্রেরিত হইল। তিনিও সংবাদ পাইয়া কয়েক ঘণ্টা পরে বেলা চারিটা আন্দাজ যন্ত্রটি লইয়া আসিলেন এবং উহা ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া খাটাইয়া ঠাকুরকে তন্মধ্য দিয়া দেখিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

ঠাকুর উঠিলেন, দেখিতে যাইলেন, কিন্তু না দেখিয়াই আবার ফিরিয়া আসিলেন! সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "মন এখন এত উঁচুতে উঠে রয়েছে যে, কিছুতেই এখন তাকে নামিয়ে নীচের দিকে দেখ্‌তে পারচি না।" আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম—ঠাকুরের মন যদি নামিয়া আসে তজ্জন্য। কিন্তু কিছুতেই সেদিন আর ঠাকুরের মন ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে নামিল না—কাজেই তাঁহার আর সেদিন অণুবীক্ষণসহায়ে কোন পদার্থই দেখা হইল না। বিপিন বাবু আমাদের কয়েক জনকে ঐ সকল দেখাইয়া অগত্যা যন্ত্রটি ফিরাইয়া লইয়া যাইলেন।

ঠাকুরের দুইদিক দিয়া দুইপ্রকারের সকল বস্তু ও বিষয় দেখা

দেহাদি-ভাব ছাড়াইয়া ঠাকুরের মন যখন যত উচ্চতর ভাব-ভূমিতে বিচরণ করিত, তখন তাঁহার তত্তৎ ভূমি হইতে লব্ধ তত অসাধারণ দিব্যদর্শনসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইত এবং দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইয়া যখন তিনি সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতভাবভূমিতে বিচরণ করিতেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দনাদি দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার

কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া দেহটা মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত এবং মনের চিন্তাকল্পনাদি সমস্ত ব্যাপারও সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া যাইয়া তিনি অখণ্ডসচ্চিদানন্দের সহিত এককালে অপৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেন। আবার ঐ সর্ব্বোচ্চ ভাবভূমি হইতে নিম্নে নিম্নতর ভূমিতে ক্রমে ক্রমে নামিতে নামিতে যখন ঠাকুরের মানবসাধারণের ন্যায় 'এই দেহটা আমার'—পুনরায় এইরূপ ভাবের উদয় হইত তখন তিনি আবার আমাদের ন্যায় চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ এবং মনের দ্বারা চিন্তা-সঙ্কল্পাদি করিতেন।

অদ্বৈত ভাবভূমি ও সাধারণ ভাবভূমি—১মটি হইতে ইন্দ্রিয়াতীত দর্শন; ২য়টি হইতে ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন

পাশ্চাত্যের একজন প্রধান দার্শনিক[১] মানব-মনের সমাধি-ভূমিতে ঐ প্রকারে আরোহণ-অবরোহণের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াই সাধারণ মানবের দেহান্তর্গত চৈতন্যও যে সকল সময় একাবস্থায় থাকে না, এইপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ মতই যে যুক্তিযুক্ত এবং ভারতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের অনুমোদিত, একথা আর বলিতে হইবে না। তবে সাধারণ মানব ঐ উচ্চতম অদ্বৈতভাব-ভূমিতে বহুকাল আরোহণ না করিয়া উহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়াদি-সহায়েই কেবলমাত্র জ্ঞানলাভ করা যায়, এই কথাটায় একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারে এক-প্রকার নোঙ্গর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। নিজ জীবনে

সাধারণ মানব ২য় প্রকারেই সকল বিষয় দেখে

১ Ralph Waldo Emerson—"Consciousness ever moves along a graded plane."

তদ্বিপরীত করিয়া দেখাইয়া তাহার ঐ ভ্রম দূর করিতেই যে ঠাকুরের ন্যায় অবতারপ্রথিত জগদ্গুরু আধিকারিক পুরুষসকলের কালে কালে উদয়—এ কথাই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দিতেছেন।

ঠাকুরের দুইপ্রকার দৃষ্টির দৃষ্টান্ত

সে যাহাই হউক, এখন বুঝা যাইতেছে যে, ঠাকুর সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আমাদের মত কেবল একভাবেই দেখিতেন না। উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিসকলে আরোহণ করিয়া ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে যেমন দেখায়, তাহাও সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। তজ্জন্যই তাঁহার সংসারে কোন বিষয়েই আমাদের ন্যায় একদেশী মত ও ভাবাবলম্বী হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেজন্যই তিনি আমাদের কথা ও ভাব ধরিতে বুঝিতে পারিলেও আমরা তাঁহার কথা ও ভাব বুঝিতে পারিতাম না। আমরা মানুষটাকে মানুষ বলিয়া, গরুটাকে গরু বলিয়া, পাহাড়টাকে পাহাড় বলিয়াই কেবল জানি। তিনি দেখিতেন মানুষটা, গরুটা, পাহাড়টা—মানুষ, গরু ও পাহাড় বটে ; অধিকন্তু আবার দেখিতেন সেই মানুষ, গরু ও পাহাড়ের ভিতর হইতে সেই জগৎকারণ অখণ্ডসচ্চিদানন্দ উঁকি মারিতেছেন! মানুষ গরু ও পাহাড়রূপ আবরণে আবৃত হওয়ায় কোথাও তাঁহার অঙ্গ (প্রকাশ) অধিক দেখা যাইতেছে এবং কোথাও বা কম দেখা যাইতেছে এইমাত্র প্রভেদ। সেজন্য ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি—

"দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিশের খোল যেমন হয়, দেখিস্ নি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য

কাপড়ের, কোনটা চারকোণা, কোনটা গোল—সেই রকম। আর বালিশের ঐ সবরকম খোলের ভেতরেই যেমন একই জিনিস তুলো ভরা থাকে—সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, দল, পাহাড়, পর্ব্বত সব খোলগুলোর ভেতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন! ঠিক ঠিক দেখতে পাই রে, মা যেন নানারকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারচেন! একটা অবস্থা হয়েছিল, যখন সদা-সর্ব্বক্ষণ ঐ রকম দেখতুম। ঐরকম অবস্থা দেখে বুঝতে না পেরে সকলে বোঝাতে, শান্ত করতে এল; রামলালের মা-টা সব কত কি বলে কাঁদতে লাগলো; তাদের দিকে চেয়ে দেখচি কি যে, (কালীমন্দির দেখাইয়া) ঐ মা-ই নানারকমে সেজে এসে ঐ রকম করচে! ঢং দেখে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম আর বলতে লাগলুম, 'বেশ সেজেচ!' একদিন কালীঘরে আসনে বসে মাকে চিন্তা করচি; কিছুতেই মার মূর্ত্তি মনে আনতে পারলুম না। পরে দেখি কি—রমণী বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান্ করতে আসত, তার মত হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারচে! দেখে হাসি আর বলি, 'ওমা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে—তা বেশ, ঐরূপেই আজ পূজো নে!' ঐ রকম করে বুঝিয়ে দিলে—'বেশ্যাও আমি—আমা ছাড়া কিছু নেই!' আর একদিন গাড়ী করে মেছোবাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে গুজে, খোপা বেঁধে, টিপ পরে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে, আর মোহিনী

ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজের কথা ও দর্শন—"ভিন্ন ভিন্ন খোল্‌গুলোর ভেতর থেকে মা উঁকি মারচে! রমণী বেশ্যাও মা হয়েছে।"

হয়ে লোকের মন ভুলুচ্চে! দেখে অবাক্ হয়ে বললুম, 'মা! তুই এখানে এইভাবে রয়েছিস?'—বলে প্রণাম করলুম!" উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া ঐরূপে সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। অতএব ঠাকুরের ঐ সকল উপলব্ধির কথা বুঝিব কিরূপে?

আবার দেহাদি-ভাব লইয়া ঠাকুর যখন আমাদের ন্যায় সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিতেন, তখনও স্বার্থ-ভোগসুখ-স্পৃহার বিন্দুমাত্রও মনেতে না থাকায় ঠাকুরের বুদ্ধি ও দৃষ্টি আমাদিগের অপেক্ষা কত বিষয় অধিক ধরিতে এবং তলাইয়া বুঝিতেই না সক্ষম হইত! যে ভোগসুখটা লাভ করিবার প্রবল কামনা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে, খাইতে শুইতে দেখিতে শুনিতে বেড়াইতে ঘুমাইতে বা অপরের সহিত আলাপাদি করিতে সকল সময়ে উহারই অনুকূল বিষয়সমূহ আমাদের নয়নে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাসিত হয় এবং তজ্জন্য আমাদের মন উহার প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তি-সকলকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকলের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐরূপে উপেক্ষিত প্রতিকূল ব্যক্তি ও বিষয়-সকলের স্বভাব জানিবার আর আমাদের অবসর হইয়া উঠে না। এইরূপে কতকগুলি বস্তু ও ব্যক্তিকেই আপনার করিয়া লইয়া বা নিজস্ব করিয়া লইবার চেষ্টাতেই আমরা জীবনটা কাটাইয়া দিয়া থাকি। এইজন্যই ইতরসাধারণ মানবের ভিতর জ্ঞানলাভ করিবার ক্ষমতার এত তারতম্য দেখা যায়। আমাদের সকলেরই চক্ষুকর্ণাদি

ঠাকুরের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাধারণাপেক্ষা তীক্ষ্ণতা। উহার কারণ ভোগ-সুখে অনাসক্তি। আসক্ত ও অনাসক্ত মনের কার্য্যতুলনা।

ইন্দ্রিয় থাকিলেও ঐ সকলের সমভাবে সকল বিষয়ে চালনা করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে আমরা সকলে পারি কৈ? এইজন্যই আমাদের ভিতরে যাহাদের স্বার্থপরতা এবং ভোগস্পৃহা অল্প, তাহারাই অন্য সকলের অপেক্ষা সহজে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়।

সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালেও ঠাকুরের দৃষ্টি যে কি তীক্ষ্ণ ছিল, তাহার দুটি-একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলে মন্দ হইবে না।

ঠাকুরের মনের তীক্ষ্ণতার দৃষ্টান্ত

আধ্যাত্মিক জটিল তত্ত্বসকল বুঝাইতে ঠাকুর সাধারণতঃ যে সকল দৃষ্টান্ত ও রূপকাদি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে ঐ তীক্ষ্ণদৃষ্টিমত্তার কতদূর পরিচয় যে পাওয়া যাইত, তাহা বলিবার নহে। উহার প্রত্যেকটির সহায়ে ঠাকুর যেন এক একটি জ্বলন্ত চিত্র দেখাইয়া ঐ জটিল বিষয় যে সম্ভবপর একথা শ্রোতার হৃদয়ে একেবারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেন!

ধর, জটিল সাংখ্যদর্শনের কথা চলিয়াছে। ঠাকুর আমাদিগকে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বলিতে বলিতে

সাংখ্য-দর্শন সহজে বুঝান—"বে-বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী"

বলিলেন, "ওতে বলে—পুরুষ অকর্ত্তা, কিছু করেন না। প্রকৃতিই সকল কাজ করেন; পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দেখেন, প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোনও কাজ করতে পারেন না।" শ্রোতারা তো সকলেই পণ্ডিত—আফিসের চাকুরে বাবু বা মুচ্ছুদী, না হয় বড় জোর ডাক্তার, উকিল বা ডেপুটি, আর স্কুল-কলেজের ছোঁড়া; কাজেই ঠাকুরের

হয়ে লোকের মন ভুলুচ্চে! দেখে অবাক্ হয়ে বললুম, 'মা! তুই এখানে এইভাবে রয়েছিস্?'—বলে প্রণাম করলুম!" উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া ঐরূপে সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। অতএব ঠাকুরের ঐ সকল উপলব্ধির কথা বুঝিব কিরূপে?

ঠাকুরের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাধারণাপেক্ষা তীক্ষ্ণতা। উহার কারণ ভোগ-সুখে অনাসক্তি। আসক্ত ও অনাসক্ত মনের কার্য্যতুলনা

আবার দেহাদি-ভাব লইয়া ঠাকুর যখন আমাদের ন্যায় সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিতেন, তখনও স্বার্থ-ভোগসুখ-স্পৃহার বিন্দুমাত্রও মনেতে না থাকায় ঠাকুরের বুদ্ধি ও দৃষ্টি আমাদিগের অপেক্ষা কত বিষয় অধিক ধরিতে এবং তলাইয়া বুঝিতেই না সক্ষম হইত! যে ভোগসুখটা লাভ করিবার প্রবল কামনা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে, খাইতে শুইতে দেখিতে শুনিতে বেড়াইতে ঘুমাইতে বা অপরের সহিত আলাপাদি করিতে সকল সময়ে উহারই অনুকূল বিষয়সমূহ আমাদের নয়নে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাসিত হয় এবং তজ্জন্য আমাদের মন উহার প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তি-সকলকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকলের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐরূপে উপেক্ষিত প্রতিকূল ব্যক্তি ও বিষয়-সকলের স্বভাব জানিবার আর আমাদের অবসর হইয়া উঠে না। এইরূপে কতকগুলি বস্তু ও ব্যক্তিকেই আপনার করিয়া লইয়া বা নিজস্ব করিয়া লইবার চেষ্টাতেই আমরা জীবনটা কাটাইয়া দিয়া থাকি। এইজন্যই ইতরসাধারণ মানবের ভিতর জ্ঞানলাভ করিবার ক্ষমতার এত তারতম্য দেখা যায়। আমাদের সকলেরই চক্ষুকর্ণাদি

ইন্দ্রিয় থাকিলেও ঐ সকলের সমভাবে সকল বিষয়ে চালনা করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে আমরা সকলে পারি কৈ? এইজন্যই আমাদের ভিতরে যাহাদের স্বার্থপরতা এবং ভোগস্পৃহা অল্প, তাহারাই অন্য সকলের অপেক্ষা সহজে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়।

সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালেও ঠাকুরের দৃষ্টি যে কি তীক্ষ্ণ ছিল, তাহার দুটি-একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলে মন্দ হইবে না।

ঠাকুরের মনের তীক্ষ্ণতার দৃষ্টান্ত

আধ্যাত্মিক জটিল তত্ত্বসকল বুঝাইতে ঠাকুর সাধারণতঃ যে সকল দৃষ্টান্ত ও রূপকাদি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে ঐ তীক্ষ্ণদৃষ্টিমত্তার কতদূর পরিচয় যে পাওয়া যাইত, তাহা বলিবার নহে। উহার প্রত্যেকটির সহায়ে ঠাকুর যেন এক একটি জ্বলন্ত চিত্র দেখাইয়া ঐ জটিল বিষয় যে সম্ভবপর একথা শ্রোতার হৃদয়ে একেবারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেন!

ধর, জটিল সাংখ্যদর্শনের কথা চলিয়াছে। ঠাকুর আমাদিগকে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বলিতে বলিতে

সাংখ্য-দর্শন সহজে বুঝান—"বে-বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী"

বলিলেন, "ওতে বলে—পুরুষ অকর্ত্তা, কিছু করেন না। প্রকৃতিই সকল কাজ করেন; পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দেখেন, প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোনও কাজ করতে পারেন না।" শ্রোতারা তো সকলেই পণ্ডিত—আফিসের চাকুরে বাবু বা মুচ্ছুদী, না হয় বড় জোর ডাক্তার, উকিল বা ডেপুটি, আর স্কুল-কলেজের ছোঁড়া; কাজেই ঠাকুরের

কথাগুলি শুনিয়া সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। ভাবগতিক দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওই যে গো দেখনি বে-বাড়ীতে? কর্ত্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আলবোলায় তামাক টানচে। গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে একবার ওখানে বাড়ীময় ছুটোছুটি করে এ কাজটা হল কি না, ও কাজটা করলে কি না সব দেখচেন, শুনচেন, বাড়ীতে যত মেয়েছেলে আসছে তাদের আদর-অভ্যর্থনা করচেন আর মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে এসে হাতমুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্চেন—'এটা এই রকম করা হল, ওটা এই রকম হল, এটা করতে হবে, ওটা করা হবে না' ইত্যাদি। কর্ত্তা তামাক টান্‌তে টান্‌তে সব শুনচেন আর 'হুঁ' 'হুঁ' করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছেন! সেই রকম আর কি।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল এবং সাংখ্যদর্শনের কথাও বুঝিতে পারিল!

পরে আবার হয়ত কথা উঠিল—"বেদান্তে বলে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক পদার্থ নহে; একই পদার্থ, কখন পুরুষভাবে এবং কখনও বা প্রকৃতিভাবে থাকে।" আমরা বুঝিতে পারিতেছি না দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "সেটা কি রকম জানিস্? যেমন সাপটা কখন চল্‌চে, আবার কখন বা স্থির হয়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হয়ে আছে তখন হল পুরুষভাব—প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। আর যখন সাপটা চল্‌চে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে কাজ করচে!" ঐ চিত্রটি হইতে কথাটি

ব্রহ্ম ও মায়া এক বুঝান—"সাপ চল্‌চে ও সাপ স্থির"

বুঝিয়া সকলে ভাবিতে লাগিল, এত সোজা কথাটা বুঝিতে পারি নাই।

আবার হয়ত পরে কথা উঠিল, মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেতেই রহিয়াছেন; তবে কি ঈশ্বরও আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ? ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "নারে, ঈশ্বরের মায়া হলেও এবং মায়া ঈশ্বরে সর্ব্বদা থাকলেও ঈশ্বর কখনও মায়াবদ্ধ হন না। এই দেখ্ না—সাপ যাকে কামড়ায় সেই মরে; সাপের মুখে বিষ সর্ব্বদা রয়েছে, সাপ সর্ব্বদা সেই মুখ দিয়ে খাচ্চে, ঢোক্ গিল্‌চে, কিন্তু সাপ নিজে তো মরে না—সেই রকম!" সকলে বুঝিল, উহা সম্ভবপর বটে।

ঈশ্বর মায়াবদ্ধ নন—'সাপের মুখে বিষ থাকে, কিন্তু সাপ মরে না'

ঐ সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বেশ বুঝা যায়, সাধারণ ভাবভূমিতে ঠাকুর যখন থাকিতেন তখন তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে কোনও পদার্থের কোনও প্রকার ভাবই লুক্কায়িত থাকিতে পারিত না। মানব-প্রকৃতির ত কথাই নাই, বাহ্য-প্রকৃতির অন্তর্গত যত কিছু পরিবর্ত্তনও তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে আপন রূপ অপ্রকাশিত রাখিতে পারিত না। অবশ্য যন্ত্রাদি-সহায়ে বাহ্য-প্রকৃতির যে সকল পরিবর্ত্তন ধরা বুঝা যায়, আমরা সে সকলের কথা এখানে বলিতেছি না।

আর এক আশ্চর্য্যের বিষয়, সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালে বাহ্যপ্রকৃতির অন্তর্গত পদার্থনিচয়ের যে সকল অসাধারণ পরিবর্ত্তন বা বিকাশ লোকনয়নে সচরাচর পতিত হয় না, সেই-গুলিই যেন অগ্রে ঠাকুরের নয়নে গোচরীভূত হইত! ঈশ্বরেচ্ছাতেই সৃষ্ট্যন্তর্গত সকল পদার্থের সকল প্রকার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত

হয়, অথবা তিনিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগদন্তর্গত বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ভাগ্যচক্রের নিয়ামক—এই ভাবটি ঠাকুরের প্রাণে প্রাণে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবার নিমিত্তই যেন জগদম্বা ঠাকুরের সম্মুখে সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ঐ অসাধারণ প্রাকৃতিক বিকাশগুলি (exceptions) যখন তখন আনিয়া ধরিতেন! "যাঁহার আইন (Law) অথবা যিনি আইন করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সে আইন পাল্টাইয়া আবার অন্যরূপ আইন করিতে পারেন"—ঠাকুরের ঐ কথাগুলির অর্থ আমরা তাঁহার বাল্যাবধি ঐরূপ দর্শন হইতেই স্পষ্ট পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ বিষয়ের কয়েকটি ঘটনা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

ঠাকুরের প্রকৃতিগত অসাধারণ পরিবর্ত্তনসকল দেখিতে পাইয়া ধারণা—ঈশ্বর আইন বা নিয়ম বদলাইয়া থাকেন

আমরা তখন কলেজে তড়িৎশক্তি সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞানের বর্ত্তমান যুগে আবিষ্কৃত বিষয়গুলির কিছু কিছু পড়িয়া মুগ্ধ হইতেছি। বালচপলতাবশে ঠাকুরের নিকটে একদিন ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া পরস্পর নানা কথা কহিতেছি। Electricity (তড়িৎ) কথাটির বারংবার উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা ও-কি বল্‌ছিস্? ইলেক্‌টিক্‌টিক্ মানে কি?" ইংরেজী কথাটির ঐরূপ বালকের ন্যায় উচ্চারণ ঠাকুরের মুখে শুনিয়া আমরা হাসিতে লাগিলাম। পরে তড়িৎশক্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি তাঁহাকে বলিয়া

বজ্রনিবারক দণ্ডের কথায় ঠাকুরের নিজ দর্শন বলা—তেতালা বাড়ীর কোলে কুঁড়ে ঘর, তাইতে বাজ পড়্‌লো

বজ্রনিবারকদণ্ডের (Lightning-Conductor) উপকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদার্থের উপরেই বজ্রপতন হয়, এজন্য ঐ দণ্ডের উচ্চতা বাটীর উচ্চতাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়া উচিত — ইত্যাদি নানা কথা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলাম। ঠাকুর আমাদের সকল কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি যে দেখেছি, তেতালা বাড়ীর পাশে ছোট চালা ঘর—শালার বাজ্ তেতালায় না পড়ে তাইতে এসে ঢুকলো! তার কি কর্‌লি বল! ওসব কি একেবারে ঠিক্‌ঠাক্ বলা যায় রে! তাঁর (ঈশ্বরের বা জগদম্বার) ইচ্ছাতেই আইন, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই উল্টে পাল্টে যায়!" আমরাও সেবার মথুর বাবুর ন্যায় ঠাকুরকে প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Laws) বুঝাইতে যাইয়া ঠাকুরের ঐ প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া কি বলিব কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। বাজ্‌টা তেতালার দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, কি একটা অপরিজ্ঞাত কারণে সহসা তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া চালায় গিয়া পড়িয়াছে, অথবা ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম একটি আধটিই হইতে দেখা যায়, অন্যত্র সহস্রস্থলে আমরা যেরূপ বলিতেছি সেইভাবে উচ্চ পদার্থেই বজ্রপতন হইয়া থাকে—ইত্যাদি নানা কথা আমরা ঠাকুরকে বলিলেও ঠাকুর প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মবশে ঘটিয়া থাকে একথা কিছুতেই বুঝিলেন না। বলিলেন, "হাজার জায়গায় তোরা যেমন বলচিস্ তেমনি না হয় হোলো, কিন্তু দুচার জায়গায় ঐ রকম না হওয়াতেই ঐ আইন যে পাল্টে যায় এটা বোঝা যাচ্চে!"

উদ্ভিদ্-প্রকৃতির আলোচকেরা সর্ব্বদা শ্বেত বা রক্ত বর্ণের পুষ্প-প্রসবকারী উদ্ভিদ্‌সমূহে কথন কথন তদ্ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে বলিয়া

গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন! কিন্তু ঐরূপ হওয়া এত অসাধারণ যে, সাধারণ মানব উহা কখনও দেখে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুরের জীবনে ঘটনা দেখ—মথুর বাবুর সহিত প্রাকৃতিক নিয়ম সব সময় ঠিক থাকে না, ঈশ্বরেচ্ছায় অন্যরূপ হইয়া থাকে—এই বিষয় লইয়া যখন ঠাকুরের বাদানুবাদ হইয়াছে, সেই সময়েই ঐরূপ একটি দৃষ্টান্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়া এবং মথুর বাবুকে উহা দেখাইয়া দেওয়া।

রক্ত জবার গাছে শ্বেত জবা দর্শন

ঐরূপ জীবন্ত প্রস্তর দেখা, মনুষ্য-শরীরের মেরুদণ্ডের শেষ-ভাগের অস্থি (Coccyx) পশুপুচ্ছের মত অল্প সল্প বাড়িয়া পরে আবার উহা কমিয়া যাইতে দেখা, স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে পুরুষশরীরকে স্ত্রীশরীরের ন্যায় যথাকালে সামান্য ভাবে পুষ্পিত হইতে এবং পরে ঐ ভাবের প্রবলতা কমিয়া যাইলে উহা রহিত হইয়া যাইতে দেখা, প্রেতযোনি এবং দেবযোনিগত পুরুষসকলের সন্দর্শন করা প্রভৃতি ঠাকুরের জীবনে অনেক ঘটনা শুনিয়াছি। জগৎপ্রসূতি প্রকৃতিকে (Nature) আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে একেবারে বুদ্ধিশক্তি-রহিত জড় বলিয়া ধারণা করিয়াছি বলিয়াই ঐ সকল অসাধারণ ঘটনাবলীকে প্রকৃতির অন্তর্গত কার্যকারণসম্বন্ধবিচ্যুত সহসোৎপন্ন ঘটনাবলী (Natural aberrations) নাম দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসি এবং মনে করি প্রকৃতি যে সকল নিয়মে পরিচালিত তাহার সকলগুলিই বুঝিতে পারিয়াছি। ঠাকুরের অন্যরূপ ধারণা ছিল। তিনি দেখিতেন—সমগ্র বাহ্যান্তঃ-প্রকৃতি জীবন্ত প্রত্যক্ষ জগদম্বার লীলাবিলাস ভিন্ন আর কিছুই

প্রকৃতিগত অসাধারণ দৃষ্টান্তগুলি হইতেই ঠাকুরের ধারণা—জগৎ-সংসারটা জগদম্বার লীলাবিলাস!

নহে। কাজেই ঐ সকল অসাধারণ ঘটনাবলীকে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা-সম্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। আর কিছু না হইলেও ঠাকুরের মনে যে ঐরূপ ধারণায় আমাদের অপেক্ষা শান্তি ও আনন্দ অনেক পরিমাণে অধিক থাকিত, একথা আর বুঝাইতে হইবে না। ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ দৃষ্টান্তের কিছু কিছু উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি এবং পরেও করিব। এখন যাহা করা হইল, তাহা হইতেই পাঠক আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা পূর্ব্বানুসরণ করি।

ঠাকুরের উচ্চ ভাবভূমি হইতে স্থান-বিশেষে প্রকাশিত ভাবের জমাটের পরিমাণ বুঝা

প্রত্যেক বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুই ভাবে দেখিয়া তবে তৎসম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিতেন। আমাদের ন্যায় কেবলমাত্র সাধারণ ভাবভূমি (ordinary plane of consciousness) হইতে দেখিয়াই যাহা হয় একটা মতামত স্থির করিতেন না। অতএব তীর্থভ্রমণ এবং সাধুসন্দর্শনও যে ঠাকুরের ঐ প্রকারে দুই ভাবে হইয়াছিল একথা আর বলিতে হইবে না। উচ্চ ভাবভূমি (higher plane of consciousness or super-consciousness) হইতে দেখিয়াই ঠাকুর কোন্ তীর্থে কতটা পরিমাণে উচ্চ ভাবের জমাট আছে, অথবা মানব-মনকে উচ্চ ভাবে আরোহণ করাইবার শক্তি কোন্ তীর্থের কতটা পরিমাণে আছে তদ্বিষয় অনুভব করিতেন। ঠাকুরের রূপরসাদি-বিষয়সম্পর্কশূন্য সর্ব্বদা দেবতুল্য পবিত্র মন ঐ সূক্ষ্ম বিষয় স্থির করিবার একটি অপূর্ব্ব পরিচায়ক ও পরিমাপক যন্ত্র (detector) স্বরূপ ছিল। তীর্থে বা দেবস্থানে গমন করিলেই উহা উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া সেই

সকল স্থানের দিব্য প্রকাশ ঠাকুরের সম্মুখে প্রকাশিত করিত। উচ্চ ভাবভূমি হইতেই ঠাকুর কাশী স্বর্ণময় দেখিয়াছিলেন, কাশীতে মৃত্যু হইলে কি প্রকারে জীব সর্ব্ববন্ধন-বিমুক্ত হয়—তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে দিব্যভাগের বিশেষ প্রকাশ অনুভব করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে যে আজ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সূক্ষ্মাবির্ভাব বর্ত্তমান তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি-সকল আবিষ্কার করা বিষয়ের প্রসিদ্ধি

কথিত আছে, বৃন্দাবনের দিব্যভাব প্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেবই প্রথম অনুভব করেন। ব্রজের তীর্থাস্পদ স্থানসকল তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে লুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছিল। ঐ সকল স্থানে ভ্রমণকালে উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া তাঁহার মন যেখানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রকাশসকল অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিত, সেইখানেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু-পূর্ব্ব যুগে বাস্তবিক সেইরূপ লীলা করিয়াছিলেন —একথায় রূপসনাতনাদি তাঁহার শিষ্যগণ প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং পরে তাঁহাদিগের মুখ হইতে শুনিয়া সমগ্র ভারতবাসী উহাতে বিশ্বাসী হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বোক্ত ভাবে বৃন্দাবনাবিষ্কারের কথা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ঐ প্রকার হওয়া যে সম্ভবপর, একথা একেবারেই মনে স্থান দিতাম না। উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে ঠাকুরের মনের ঐরূপে যথাযথ ধরিবার বুঝিবার ক্ষমতা দেখিয়াই এখন আমরা ঐ কথায় কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছি। ঠাকুরের জীবন হইতে ঐ বিষয়ের দুই-একটি দৃষ্টান্ত এখানে প্রদান করিলেই পাঠক আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় গ্রামে ছিল। ঠাকুর যে তথায় মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া সময়ে সময়ে কিছুকাল কাটাইয়া আসিতেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে জানাইয়াছি। একবার ঐ স্থানে ঠাকুর রহিয়াছেন, এমন সময়ে হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামের সহিত গ্রামের এক ব্যক্তির বিষয়কর্ম্ম লইয়া বচসা উপস্থিত হইল। বকাবকি ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হইল এবং রাজারাম হাতের নিকটেই একটি হুঁকা পাইয়া তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিল। আহত ব্যক্তি ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিল এবং ঠাকুরের সম্মুখেই ঐ ঘটনা হওয়ায় এবং তাঁহাকে সাধু সত্যবাদী বলিয়া পূর্ব্ব হইতে জানা থাকায় সে ব্যক্তি ঠাকুরকেই ঐ বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপে নির্ব্বাচিত করিল। কাজেই সাক্ষ্য দিবার জন্য ঠাকুরকে বন-বিষ্ণুপুরে আসিতে হইল। পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুর রাজারামকে ঐরূপে ক্রোধান্ধ হইবার জন্য বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন; এখানে আসিয়া আবার বলিলেন, "ওকে (বাদীকে) টাকাকড়ি দিয়ে যেমন করে পারিস মোকদ্দমা মিটিয়ে নে; নয়ত তোর ভাল হবে না; আমি তো আর মিথ্যা বল্‌তে পার্‌ব না। জিজ্ঞাসা করলেই যা জানি ও দেখেছি সব কথা বলে দেব।" কাজেই রাজারাম ভয় পাইয়া মামলা আপোসে মিটাইয়া ফেলিতে লাগিল।

ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ ঘটনা—বন-বিষ্ণুপুরে ৺মৃন্ময়ী দেবীর পূর্ব্বমূর্ত্তি ভাবে দর্শন

ঠাকুর সেই অবসরে বন-বিষ্ণুপুর সহরটি দেখিতে বাহির হইলেন।

এককালে ঐ স্থান বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল। লাল-বাঁধ, কৃষ্ণ-বাঁধ প্রভৃতি বড় বড় দীঘি, অসংখ্য দেবমন্দির, যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরিষ্কার প্রশস্ত বাঁধান পথসকল, বহুসংখ্যক বিপণি-পূর্ণ বাজার, অসংখ্য ভগ্নমন্দির-স্তূপ এবং বহুসংখ্যক লোকের বাস এবং ব্যবসায়াদি করিতে গমনাগমনেই ঐ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিষ্ণুপুরের রাজারা এককালে বেশ প্রতাপশালী ধর্ম্মপরায়ণ এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিষ্ণুপুর এককালে সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চাতেও প্রসিদ্ধ ছিল। রূপসনাতনাদি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গগণের তিরোভাবের কিছুকাল পর হইতে রাজবংশীয়েরা বৈষ্ণবমতাবলম্বী হন। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ৺মদনমোহন বিগ্রহ পূর্ব্বে এখানকার রাজাদেরই ঠাকুর ছিলেন। ৺গোকুলচন্দ্র মিত্র এখানকার রাজাদের এক সময়ে অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরটি দেখিয়া মোহিত হইয়া ঋণ পরিশোধ কালে টাকা না লইয়া ঠাকুরটি চাহিয়া লইয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি।

বিষ্ণুপুর সহরের অবস্থা

৺মদনমোহন

৺মদনমোহন ভিন্ন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ৺মৃন্ময়ী নাম্নী এক বহু প্রাচীন দেবীমূর্ত্তিও ছিলেন। লোকে বলিত ৺মৃন্ময়ী দেবী বড় জাগ্রতা। রাজবংশীয়দের ভগ্নদশায় ঐ মূর্ত্তি এক সময়ে এক পাগলিনী কর্ত্তৃক ভগ্ন হয়। রাজবংশীয়েরা সেজন্য পূর্ব্বমূর্ত্তির মত অন্য একটি নূতন মূর্ত্তির পুনঃস্থাপনা করেন।

৺মৃন্ময়ী

ঠাকুর এখানকার অপর দেবস্থানসকল দেখিয়া ৺মৃন্ময়ী দেবীকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে ভাবাবেশে

৺মৃন্ময়ীর মুখখানি দেখিতে পাইলেন। মন্দিরে যাইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিটি দেখিবার কালে দেখিলেন, ঐ মূর্ত্তিটি তাঁহার ভাবকালে দৃষ্ট মূর্ত্তিটির সদৃশ নহে। এইরূপ হইবার কারণ কিছুই বুঝিলেন না। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বাস্তবিকই নূতন মূর্ত্তিটি পুরাতন মূর্ত্তিটির মত হয় নাই। নূতন মূর্ত্তির কারিকর নিজ গুণপনা দেখাইবার জন্য উহার মুখখানি বাস্তবিক অন্য ভাবেই গড়িয়াছে এবং পুরাতন মূর্ত্তিটির ভগ্ন মুখখানি এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সযত্নে নিজালয়ে রক্ষিত হইতেছে। ইহার কিছুকাল পরে ঐ ভক্তিনিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ মুখখানি সংযোজিত করিয়া অন্য একটি মূর্ত্তি গড়াইয়া লালবাঁধ দীঘির পার্শ্বে এক রমণীয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং উহার নিত্যপূজাদি করিতে লাগিলেন।

সমীপাগত ব্যক্তিগণের আগমনের উদ্দেশ্য ও ভাব ধরিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তেরও এখানে উল্লেখ করা ভাল।

ঠাকুরের ঐরূপে ব্যক্তিগত ভাব ও উদ্দেশ্য ধরিবার ক্ষমতা—১ম দৃষ্টান্ত

পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর নিজের পুত্রের মত ভালবাসিতেন, একথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরের সহিত ঠাকুরের ঘরের পূর্ব্ব দিকের লম্বা বারাণ্ডার উত্তরাংশে দাঁড়াইয়া নানা কথা কহিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন বাগানের ফটকের দিক হইতে একখানি জুড়িগাড়ী তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। গাড়ীখানি ফিটন্; মধ্যে কয়েকটি বাবু বসিয়া আছেন। দেখিয়াই কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তির গাড়ী বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে সে সময় কলিকাতা

হইতে অনেকে আসিয়া থাকেন। ইঁহারাও সেইজন্যই আসিয়াছেন ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন না।

ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু গাড়ীর দিকে পড়িবামাত্র তিনি ভয়ে জড়সড় হইয়া শশব্যস্তে অন্তরালে আপন ঘরে যাইয়া বসিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে ঢুকিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "যা—যা, ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস্ এখন দেখা হবে না।" ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় বাহিরে আসিলেন। ইতিমধ্যে আগন্তুকেরাও নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে একজন সাধু থাকেন, না?" ব্রহ্মানন্দ স্বামী শুনিয়া ঠাকুরের নাম করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তিনি এখানে থাকেন। আপনারা তাঁহার নিকট কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন?" তাঁহাদের ভিতর এক ব্যক্তি বলিলেন, "আমাদের এক আত্মীয়ের বিষম পীড়া হইয়াছে; কিছুতেই সারিতেছে না। তাই তিনি (সাধু) যদি কোন ঔষধ দয়া করিয়া দেন, সেজন্য আসিয়াছি।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আপনারা ভুল শুনিয়াছেন। ইনি তো কখন কাহাকেও ঔষধ দেন না। বোধ হয় আপনারা দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়াছেন। তিনি ঔষধ দিয়া থাকেন বটে। তিনি ঐ পঞ্চবটীতে কুটিরে আছেন। যাইলেই দেখা হইবে।"

আগন্তুকেরা ঐ কথা শুনিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "ওদের ভেতর কি যে একটা তমোভাব দেখ্‌লুম!—দেখেই আর ওদের দিকে চাইতে পারলুম না, তা কথা কইব কি! ভয়ে পালিয়ে এলুম!"

এইরূপে উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া ঠাকুরকে প্রত্যেক স্থান, বস্তু বা ব্যক্তির অন্তর্গত উচ্চাবচ ভাবপ্রকাশ উপলব্ধি করিতে আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাম। ঠাকুর যেরূপ দেখিতেন, ঐ সকলের ভিতরে বাস্তবিকই সেইরূপ ভাব যে বিদ্যমান ইহা বারংবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াই আমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাসী হইয়াছি। তন্মধ্যে আরও দুই-একটি এখানে উল্লেখ করিয়া সাধারণ ভাবভূমি হইতে তিনি তীর্থাদিতে কি অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই পাঠককে বলিতে আরম্ভ করিব।

ঐ বিষয়ে ২য় দৃষ্টান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার দক্ষিণেশ্বরাগত সহপাঠিগণ

উদারচেতা স্বামী বিবেকানন্দের মন বাল্যকালাবধি পরদুঃখে কাতর হইত। সেজন্য তিনি যাহাতে বা যাঁহার সাহায্যে আপনাকে কোনও বিষয়ে উপকৃত বোধ করিতেন, তাহা করিতে বা তাঁহার নিকটে ঐরূপ সাহায্য পাইবার জন্য গমন করিতে আপন আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব সকলকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। লেখাপড়া ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বিষয়েই স্বামিজীর মনের ঐ প্রকার রীতি ছিল। কলেজে পড়িবার সময় সহপাঠীদিগকে লইয়া নানা স্থানে নিয়মিত দিনে প্রার্থনা ও ধ্যানাদি-অনুষ্ঠানের জন্য সভা-সমিতি গঠন করা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভক্তাচার্য্য কেশবের সহিত স্বয়ং পরিচিত হইবার পরেই সহপাঠীদিগের ভিতর অনেককে উঁহাদের দর্শনের জন্য লইয়া যাওয়া প্রভৃতি যৌবনে পদার্পণ করিয়াই স্বামিজীর জীবনে অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি দেখিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের পরিচয় পাইয়া থাকি।

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য

ও ঈশ্বরপ্রেমের পরিচয় পাওয়া অবধি নিজ সহপাঠী বন্ধুদিগকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া স্বামিজীর জীবনে একটা ব্রতবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা একথা বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন যে, বুদ্ধিমান স্বামিজী একদিনের আলাপে কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হইলেই তাহাকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইতেন। অনেক দিন পরিচয়ের ফলে যাহাদিগকে সৎস্বভাব-বিশিষ্ট এবং ধর্ম্মানুরাগী বলিয়া বুঝিতেন, তাহাদিগকেই সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন।

চেষ্টা করলেই যার যা ইচ্ছা হ'তে পারে না

স্বামিজী ঐরূপে অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবকেই তখন ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টি যে তাঁহাদের অন্তর দেখিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর ও স্বামিজী উভয়েরই মুখে সময়ে সময়ে শুনিয়াছি। স্বামিজী বলিতেন, "ঠাকুর আমাকে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদি-দানে আমার উপর যেরূপ কৃপা করিতেন, সেরূপ কৃপা তাহাদিগকে না করায় আমি তাঁহাকে ঐরূপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিতাম! বালস্বভাব-বশতঃ অনেক সময় তাঁহার সহিত কোমর বাঁধিয়া তর্ক করিতেও উদ্যত হইতাম! বলিতাম, 'কেন মহাশয়, ঈশ্বর তো আর পক্ষপাতী নন যে এক জনকে কৃপা করবেন এবং আর এক জনকে কৃপা করবেন না? তবে কেন আপনি উহাদের আমার ন্যায় গ্রহণ করবেন না? ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সকলেই যেমন বিদ্বান্ পণ্ডিত হতে পারে, ধর্ম্মলাভ ঈশ্বরলাভও যে তেমনি করতে পারে, এ কথা তো নিশ্চয়?' তাহাতে ঠাকুর বলিতেন, 'কি করবো রে—আমাকে মা যে

দেখিয়ে দিচ্চে, ওদের ভেতর ষাঁড়ের মত পশুভাব রয়েছে, ওদের এ জন্মে ধর্ম্মলাভ হবে না—তা আমি কি করবো? তোর ও কি কথা? ইচ্ছা ও চেষ্টা করলেই কি লোকে এ জন্মে যা ইচ্ছা তাই হতে পারে?' ঠাকুরের ও কথা তখন শোনে কে? আমি বলিতাম, 'সে কি মশায়, ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে যার যা ইচ্ছা তা হতে পারে না? নিশ্চয় পারে। আমি আপনার ও কথায় বিশ্বাস করতে পাচ্চি না।' ঠাকুরের তাহাতেও ঐ কথা—'তুই বিশ্বাস করিস্ আর নাই করিস্ মা যে আমায় দেখিয়ে দিচ্চে!' আমিও তখন তাঁর কথা কিছুতেই স্বীকার করতুম না। তারপর যত দিন যেতে লাগল, দেখে শুনে তত বুঝতে লাগলুম—ঠাকুর যা বলেছেন তাই সত্য, আমার ধারণাই মিথ্যা।"

স্বামিজী বলিতেন—এইরূপে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়া তবে তিনি ঠাকুরের সকল কথায় ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রত্যেক কথা ও ব্যবহার ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার কথা আমরা স্বামিজীর নিকট হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রথযাত্রার দিনে ঠাকুর স্বামিজীর নিকট হইতে শুনিয়া পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে দেখিতে গিয়াছিলেন।[১] শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে সাক্ষাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই যথার্থ ধর্ম্ম-প্রচারে সক্ষম, অপর সকল প্রচারক-নামধারীর বাগাড়ম্বর বৃথা—পণ্ডিতজীকে ঐরূপ নানা উপদেশদানের পর ঠাকুর পান করিবার

৩য় দৃষ্টান্ত—পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুরের জলপান করা

১ পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

জন্য এক গেলাস জল চাহিলেন। ঠাকুর যথার্থ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐরূপে জল চাহিলেন অথবা তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ ঠাকুর অন্য এক সময়ে আমাদের বলিয়াছিলেন যে সাধু, সন্ন্যাসী, অতিথি, ফকিরেরা কোন গৃহস্থের বাটীতে যাইয়া যাহা হয় কিছু খাইয়া না আসিলে তাহাতে গৃহস্থের অকল্যাণ হয় এবং সেজন্য তিনি যাহার বাটীতেই যান না কেন, তাহারা না বলিলে বা ভুলিয়া গেলেও স্বয়ং তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া কিছু না কিছু খাইয়া আসেন।

সে যাহা হউক, এখানে জল চাহিবামাত্র তিলক কণ্ঠি প্রভৃতি ধর্ম্মলিঙ্গধারী এক ব্যক্তি সসম্ভ্রমে ঠাকুরকে এক গেলাস জল আনিয়া দিলেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ জল পান করিতে যাইয়া উহা পান করিতে পারিলেন না। নিকটস্থ অপর ব্যক্তি উহা দেখিয়া গেলাসের জলটি ফেলিয়া দিয়া আর এক গেলাস জল আনিয়া দিল এবং ঠাকুরও উহার কিঞ্চিৎ পান করিয়া পণ্ডিতজীর নিকট হইতে সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলে বুঝিল, পূর্ব্বানীত জলে কিছু পড়িয়াছিল বলিয়াই ঠাকুর উহা পান করিলেন না।

স্বামিজী বলিতেন—তিনি তখন ঠাকুরের অতি নিকটেই বসিয়াছিলেন সেজন্য বিশেষ করিয়া দেখিয়াছিলেন গেলাসের জলে কুটোকাটা কিছুই পড়ে নাই, অথচ ঠাকুর উহা পান করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া স্বামিজী মনে মনে স্থির করিলেন, তবে বোধ হয় জল-গেলাসটি স্পর্শদোষদুষ্ট হইয়াছে! কারণ ইতিপূর্ব্বেই তিনি ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, যাহাদের ভিতর বিষয়-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, যাহারা জুয়াচুরি

বাটপাড়ি এবং অপরের অনিষ্টসাধন করিয়া অসদুপায়ে উপার্জ্জন করে এবং যাহারা কাম-কাঞ্চন-লাভের সহায় হইবে বলিয়া বাহিরে ধর্ম্মের ভেক ধারণ করিয়া লোককে প্রতারিত করে, তাহারা কোনরূপ খাদ্যপানীয় আনিয়া দিলে তাঁহার হস্ত উহা গ্রহণ করিতে যাইলেও কিছুদূর যাইয়া আর অগ্রসর হয় না, পশ্চাতে গুটাইয়া আসে এবং তিনি উহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন!

স্বামিজী বলিতেন—ঐ কথা মনে উদিত হইবামাত্র তিনি ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন এবং ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে সেদিন তাঁহার সহিত আসিতে অনুরোধ করিলেও 'বিশেষ কোনও আবশ্যক আছে, সেজন্য যাইতে পারিতেছি না' বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাইলে স্বামিজী পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মলিঙ্গধারী ব্যক্তির কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাহাকে একান্তে ডাকিয়া তাহার অগ্রজের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে সে ব্যক্তি বিশেষ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, 'জ্যেষ্ঠের দোষের কথা কেমন করিয়া বলি' ইত্যাদি। স্বামিজী বলিতেন, "আমি তাহাতেই বুঝিয়া লইলাম। পরে ঐ বাটীর অপর একজন পরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা জানিয়া ঐ বিষয়ে নিঃসংশয় হইলাম এবং অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ঠাকুর কেমন করিয়া লোকের অন্তরের কথা ঐরূপে জানিতে পারেন!"

সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালে ঠাকুর যেরূপে সকল পদার্থের অন্তর্নিহিত গুণাগুণ ধরিতেন ও বুঝিতেন, তাহার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে তাঁহার মানসিক গঠন কি

প্রকারের ছিল, তাহা বুঝিতে হইবে এবং পরে কোন্ পদার্থটিকে পরিমাপকস্বরূপে সর্ব্বদা স্থির রাখিয়া তিনি অপর বস্তু ও বিষয়-সকল পরিমাণ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহাও ধরিতে হইবে। লীলাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের কিছু কিছু আভাস আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। অতএব এখন উহার সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করিলেই চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, ঠাকুরের মন পার্থিব কোন পদার্থে আসক্ত না থাকায় তিনি যখনই যাহা গ্রহণ বা ত্যাগ করিবেন মনে করিয়াছেন, তখনই উহা ঐ বিষয়ে সম্যক্ যুক্ত বা উহা হইতে সম্যক্ পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথক হইবার পর আজীবন আর ঐ বিষয়ের প্রতি একবারও ফিরিয়া দেখেন নাই। আবার ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, অদ্ভুত বিচারশীলতা এবং ঐকান্তিক একাগ্রতা তাঁহার মনের হস্ত সর্ব্বদা ধারণ করিয়া উহাকে যাহাতে ইচ্ছা, যতদিন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা স্থিরভাবে রাখিয়াছে। এক ক্ষণের জন্যও উহাকে ঐ বিষয়ের বিপরীত চিন্তা বা কল্পনা করিতে দেয় নাই। কোনও বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে যাইবামাত্র এ মনের এক ভাগ বলিয়া উঠিত, 'কেন ঐরূপ করিতেছ তাহা বল।' আর যদি ঐ প্রশ্নের যথাযথ যুক্তিসহ মীমাংসা পাইত তবেই বলিত, 'বেশ কথা, ঐরূপ কর।' আবার ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র ঐ মনের অন্য এক ভাগ বলিয়া উঠিত, 'তবে পাকা করিয়া উহা ধর; শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, বিরামে কখন উহার বিপরীত অনুষ্ঠান আর করিতে

ঠাকুরের মানসিক গঠন কি ভাবের ছিল এবং কোন্ বিষয়টির দ্বারা তিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে পরিমাপ করিয়া তাহাদের মূল্য বুঝিতেন

পারিবে না।' তৎপরে তাঁহার সমগ্র মন একতানে ঐ বিষয় গ্রহণ করিয়া তদনুকূল অনুষ্ঠান করিতে থাকিত এবং নিষ্ঠা প্রহরীস্বরূপে এরূপ সতর্কভাবে উহার ঐ বিষয়ক কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা দেখিত যে, সহসা ভুলিয়া ঠাকুর তদ্বিপরীতানুষ্ঠান করিতে যাইলে স্পষ্ট বোধ করিতেন, ভিতর হইতে কে যেন তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে দিতেছে না। ঠাকুরের আজীবন সকল বস্তু ও ব্যক্তির সহিত ব্যবহারের আলোচনা করিলেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যায় আমার কাজ নেই

দেখনা—বালক গদাধর কয়েকদিন পাঠশালে যাইতে না যাইতে বলিয়া বসিলেন, "ও চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যাতে আমার কাজ নাই, ও বিদ্যা আমি শিখব না!" ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভ্রাতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া কিছুকাল পরে বুঝাইয়া সুঝাইয়া কলিকাতায় আপনার টোলে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ঐ বিদ্যা শিখাইবার প্রয়াস পাইলেও ঠাকুরের অর্থকরী বিদ্যা সম্বন্ধে বাল্যকালের ঐ মত ঘুরাইতে পারিলেন না। শুধু তাহাই নহে, নিষ্ঠাচারী পণ্ডিত হইয়া টোল খুলিয়া যথাসাধ্য শিক্ষাদান করিয়াও পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইতে পারিলেন না বলিয়াই যে অনন্যোপায় অগ্রজের রাণী রাসমণির দেবালয়ে পৌরোহিত্য-স্বীকার—এ কথাও ঠাকুরের নিকট লুক্কায়িত রহিল না এবং ধনীদিগের তোষামোদ করিয়া উপার্জ্জনাপেক্ষা অগ্রজের ঐরূপ করা অনেক ভাল বুঝিয়া উহা তিনি অনুমোদনও করিলেন।

দেখনা—সাধনকালে ঠাকুর ধ্যান করিতে বসিবামাত্র তাঁহার

অনুভব হইতে লাগিল, তাঁহার শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থলগুলিতে খট্ খট্ করিয়া আওয়াজ হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। তিনি যে ভাবে আসন করিয়া বসিয়াছেন সেই ভাবে অনেকক্ষণ তাঁহাকে বসাইয়া রাখিবার জন্য কে যেন ভিতর হইতে ঐ সকল স্থানে চাবি লাগাইয়া দিল। যতক্ষণ না আবার সে খুলিয়া দিল ততক্ষণ হাত পা গ্রীবা কোমর প্রভৃতি স্থানের সন্ধিগুলি তিনি আমাদের মত ফিরাইতে, ঘুরাইতে, যথা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলেও কিছুকাল আর করিতে পারিলেন না! অথবা দেখিলেন, শূলহস্তে এক ব্যক্তি নিকটে বসিয়া রহিয়াছে এবং বলিতেছে, 'যদি ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন অপর চিন্তা করবি, তো এই শূল তোর বুকে বসাইয়া দিব।'

২য় দৃষ্টান্ত—ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শরীরের সন্ধিস্থলগুলিতে কাহারও যেন চাবি লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া—এই অনুভব ও শূলধারী এক ব্যক্তিকে দেখা

দেখনা—পূজা করিতে বসিয়া আপনাকে জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞান করিতে বলিবামাত্র মন তাহাই করিতে লাগিল; জগদম্বার পাঁদপদ্মে বিল্বজবা দিতে যাইলেও ঠাকুরের হাত তখন কে যেন ঘুরাইয়া নিজ মস্তকের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিল!

অথবা দেখ—সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র মন সর্ব্বভূতে এক অদ্বৈত ব্রহ্মদর্শন করিতেই থাকিল। অভ্যাসবশতঃ ঠাকুর ঐ কালে পিতৃতর্পণ করিতে যাইলেও হাত আড়ষ্ট হইয়া গেল, অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া হাতে জল তুলিতেই পারিলেন না! অগত্যা বুঝিলেন, সন্ন্যাসগ্রহণে তাঁহার কর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে। ঐরূপ ভূরি ভূরি

৩য় দৃষ্টান্ত—জগদম্বার পাদপদ্মে ফুল দিতে যাইয়া নিজের

মাথায় দেওয়া ও পিতৃ-তর্পণ করিতে যাইয়া উহা করিতে না পারা। নিরক্ষর ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভবসকলের দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র সপ্রমাণিত হয়

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অনাসক্তি, বিচারশীলতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এ মনের কত সহজ, কত স্বাভাবিক ছিল। আর বুঝা যায় যে, ঠাকুরের ঐরূপ দর্শনগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কথার অনুরূপ হওয়ায় শাস্ত্র যাহা বলেন তাহা সত্য। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন — এবার ঠাকুরের নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ উহাই ; হিন্দুর বেদবেদান্ত হইতে অপরাপর জাতির যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকলের কথা যে সত্য এবং বাস্তবিকই যে মানুষ ঐসকল পথ দিয়া চলিয়া ঐরূপ অবস্থাসকল লাভ করিতে পারে, ইহাই প্রমাণিত করিবেন বলিয়া।

ঠাকুরের মনের স্বভাব আলোচনা করিতে যাইয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নির্ব্বিকল্প ভূমিতে উঠিয়া অদ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপলব্ধিই মানব-জীবনের চরমে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার ঐ ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, 'সব শেয়ালের এক রা'; অর্থাৎ সকল শিয়ালই যেমন একভাবে শব্দ করে তেমনি নির্ব্বিকল্পভূমিতে যাঁহারাই উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ ভূমি হইতে দর্শন করিয়া জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও ঠাকুর বলিতেন, "হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে মারবার জন্য এবং

অদ্বৈতভাব-লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ঐ ভাবে 'সব শিয়ালের এক রা'। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি বাহিরের দাঁত ও অদ্বৈতজ্ঞান ভিতরের দাঁত ছিল।

অদ্বৈতজ্ঞানের তারতম্য লইয়াই ঠাকুর ব্যক্তি ও সমাজের উচ্চাবচ অবস্থা স্থির করিতেন

ভিতরের দাঁত নিজের খাবার জন্য, সেইরকম মহাপ্রভুর দ্বৈতভাব বাহিরের ও অদ্বৈতভাব ভিতরের জিনিস ছিল।" অতএব সর্ব্বদা একরূপ অদ্বৈতভাবই যে ঠাকুরের সকলবিষয়ের পরিমাপকস্বরূপ ছিল, একথা আর বলিতে হইবে না। ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমষ্টি সমাজকে যে ভাব ও অনুষ্ঠান ঐ ভূমির দিক যত অগ্রসর করাইয়া দিত, ততই ঠাকুর ঐ ভাব ও অনুষ্ঠানকে অপর সকল ভাব ও অনুষ্ঠান হইতে উচ্চ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

স্বয়ংবেদ্য ও পরসংবেদ্য দর্শন

আবার ঠাকুরের আধ্যাত্মিকভাবপ্রসূত দর্শনগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের কতকগুলি স্বসংবেদ্য এবং কতকগুলি পরসংবেদ্য। অর্থাৎ উহাদের কতকগুলি ঠাকুরের নিজ শরীরাবদ্ধ মনের চিন্তাসকল নিষ্ঠা ও অভ্যাসসহায়ে ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তিধারণ করিয়া তাঁহার নিকট ঐরূপে প্রকাশিত হইত এবং ঠাকুর নিজেই দেখিতে পাইতেন এবং কতকগুলি তিনি উচ্চ-উচ্চতর ভাবভূমিতে উঠিয়া নির্ব্বিকল্প ভাবভূমির নিকটস্থ হইবার কালে বা ভাবমুখে অবস্থিত হইয়া দেখিয়া অপরের উহা অপরিজ্ঞাত হইলেও বর্ত্তমানে বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং অপরে ঐ সকলকে কালে বাস্তবিকই ঘটিতে দেখিত। ঠাকুরের প্রথম শ্রেণীর দর্শনগুলি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে অপরকে তাঁহার ন্যায় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাদিসম্পন্ন হইতে বা ঠাকুর যে ভূমিতে উঠিয়া ঐরূপ দর্শন করিয়াছেন সেই ভূমিতে উঠিতে হইত, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলিকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হইলে লোকের

বিশ্বাস বা কোনরূপ সাধনাদির আবশ্যক হইত না—ঐ সকল যে সত্য, তাহা ফল দেখিয়া লোককে বিশ্বাস করিতেই হইত।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এবং এখন যে সকল কথা উপরে বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালেও ঐরূপ মন নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে। যে সকল বস্তু ও ব্যক্তির সম্পর্কে উহা একক্ষণের জন্যও উপস্থিত হইত, তৎসকলের স্বভাব রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উহা কখন স্থির থাকিতে পারিত না। বাল্যকালে যেমন অর্থের জন্যই বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রালোচনা এ কথা ধরিয়া 'চালকলা-বাঁধা' বিদ্যা শিখিল না, ঠাকুরের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানের নানা লোকের সম্পর্কে আসিয়া ঐ মন তাহাদের সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, অতঃপর তাহাই আমাদের আলোচনীয়।

বস্তু ও ব্যক্তি-সকলের অবস্থা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে না আসিয়া ঠাকুরের মন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর হইতে আরব্ধ হইয়া বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের পরস্পর বিদ্বেষ যে সমভাবেই চলিয়া আসিতেছিল, একথা আর বলিতে হইবে না। শ্রীরামপ্রসাদাদি বিরল কতিপয় শক্তিসাধকেরা নিজ সাধনসহায়ে কালী ও কৃষ্ণকে এক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ বিদ্বেষ ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিলেও সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের কথা বড় একটা গ্রহণ না করিয়া

সাধারণ ভাবভূমি হইতে ঠাকুর যাহা দেখিয়াছিলেন—শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ

বিদ্বেষ-তরঙ্গেই যে গা ঢালিয়া রহিয়াছে, একথা উভয় পক্ষের পরস্পরের দেব-নিন্দাসূচক হাস্যকৌতুকাদিতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাল্যাবধি ঠাকুর ঐ বিষয়ের সহিত যে পরিচিত ছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। আবার উভয় পক্ষের শাস্ত্র-নিবদ্ধ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুর যখন উভয় পন্থাই সমান সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন শাক্ত-বৈষ্ণবের ঐ বিদ্বেষের কারণ যে ধর্ম্মহীনতাপ্রসূত অভিমান বা অহংকার, একথা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না।

ঠাকুরের পিতা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন এবং শ্রীশ্রীরঘুবীর-শিলাকে দৈবযোগে লাভ করিয়া বাটীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

নিজ পরিবারবর্গের ভিতর ঐ বিদ্বেষ দূর করিবার জন্য সকলকে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করান

ঠাকুর ঐরূপে বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিলেও কিন্তু বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিব ও বিষ্ণু উভয়ের উপর সমান অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইত। বাল্যকালে এক সময়ে শিব সাজিয়া তাঁহার ঐভাবে সমাধিস্থ হইয়া কয়েক ঘণ্টাকাল থাকার কথা প্রতিবেশিগণ এখনও বলিয়া ঐ স্থান দেখাইয়া দেয়। ঐ বিষয়ের পরিচায়কস্বরূপ আর একটি কথারও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে; ঠাকুর আপন পরিবারবর্গের প্রত্যেককে এক সময়ে বিষ্ণুমন্ত্র ও শক্তিমন্ত্র উভয় মন্ত্রেই দীক্ষাগ্রহণ করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন হইতে বিদ্বেষ-ভাব সম্যক্ দূরীভূত করিবার জন্যই ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ, এ কথাই আমাদের অনুমিত হয়।

বহু প্রাচীন যুগে মহারাজ ধর্ম্মাশোক মানব-সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম্ম ও বিদ্যা-বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এ কথা এখন

সকলেই জানেন। মানব এবং গ্রাম্য পশুসকলের শারীরিক রোগনিবারণের জন্য তিনি হাসপাতাল, পিঁজরাপোলাদি ভারতের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন, ভেষজসকলের সংগ্রহ ও চাষ করিয়া সাধারণের সহজ-প্রাপ্য করেন এবং বৌদ্ধ যতীদিগের সহায়ে ঔষধ ও ওষধিসকলের দেশদেশান্তরে প্রেরণ ও প্রচার করিয়াছিলেন। সাধুদিগের ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখা বোধ হয় ঐ কাল হইতেই অনুষ্ঠিত হয়। আবার তন্ত্রযুগে ঐ প্রথা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পরবর্ত্তী যুগের সংহিতাকারেরা সাধুদের উহাতে আধ্যাত্মিক অবনতি দেখিয়া ঐ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করিলেও রক্ষণশীল ভারতে ঐ প্রথার এখনও উচ্ছেদ হয় নাই।

সাধুদের ঔষধ-দেওয়া প্রথার উৎপত্তি ও ক্রমে উহাতে সাধুদের আধ্যাত্মিক অবনতি

দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে এবং তীর্থভ্রমণ করিবার সময় ঠাকুর অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে ঐ ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ভোগসুখে চিরকালের নিমিত্ত পতিত হইতে দেখিয়া সাধুদের ভিতরেও যে ধর্ম্মহীনতা অনুভব করেন, ইহা আমাদের স্পষ্ট বোধ হয়। কারণ ঠাকুর আমাদের অনেককে অনেক সময়ে বলিতেন, "যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতিতিলকের বিশেষ আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ট (sign-board) মেরে নিজেকে বড় সাধু বলে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস করবি নি।"

উপরোক্ত কথাটিতে কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, ঠাকুর ভণ্ড ও ভ্রষ্ট সাধুদিগকে দেখিয়া পাশ্চাত্যের জনসাধারণের মত সাধু-সম্প্রদায় সকল উঠাইয়া দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে করিতেন।

কারণ ঠাকুরকে আমরা ঐ কথা-প্রসঙ্গে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছি যে একটা ভেকধারী সাধারণ পেট-বৈরাগী ও একজন চরিত্রবান গৃহীর ভিতর তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্তকেই বড় বলিতে হয়। কারণ ঐ ব্যক্তি যোগ-যাগ কিছু না করিয়া কেবলমাত্র চরিত্রবান থাকিয়া যদি জন্মটা ভিক্ষা করিয়া কাটাইয়া যায়, তাহা হইলেও সাধারণ গৃহী ব্যক্তি অপেক্ষা এজন্মে কত অধিক ত্যাগের পথে অগ্রসর হইয়া রহিল। ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করাই যে ঠাকুরের নিকট ব্যক্তিগত চরিত্রের ও অনুষ্ঠানের পরিমাপক ছিল, এ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপরোক্ত কথাগুলিই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কেবলমাত্র ভেকধারী সাধুদের সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

যথার্থ নিষ্ঠাবান প্রেমিক বা জ্ঞানী সাধু, যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন, ঠাকুরের নিকট যে বিশেষ সম্মান পাইতেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা লীলাপ্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে ভূরি ভূরি দিয়াছি। ভারতে সনাতন ধর্ম্ম উঁহাদের উপলব্ধি-সহায়েই সজীব রহিয়াছে। উঁহাদের ভিতরে যাঁহারা ঈশ্বরদর্শনে সিদ্ধকাম হইয়া সর্ব্বপ্রকার মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের দ্বারাই বেদাদিশাস্ত্র সপ্রমাণিত হইয়া থাকে। কারণ আপ্তপুরুষেই যে বেদের প্রকাশ, একথা বৈশেষিকাদি ভারতের সকল দর্শনকারেরাই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। অতএব গভীর-অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ঠাকুরের তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ কথা বুঝিয়া তাঁহাদের ঐরূপে সম্মান দেওয়াটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে।

যথার্থ সাধুদের জীবন হইতেই শাস্ত্রসকল সজীব থাকে

নিজ নিজ পথে নিষ্ঠা-ভক্তির সহিত অগ্রসর সাধুদিগকে ঠাকুর

বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে স্বয়ং সর্ব্বদা বিশেষ আনন্দানুভব করিলেও এক বিষয়ের অভাব তিনি তাঁহাদের ভিতর সর্ব্বদা দেখিতে পাইয়া সময়ে সময়ে নিতান্ত দুঃখিত হইতেন। দেখিতেন যে, তিনি সমান অনুরাগে সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমভাবে যোগদান করিলেও তাঁহারা সেরূপ পারিতেন না। ভক্তি-মার্গের সাধকসকলের তো কথাই নাই, অদ্বৈতপন্থায় অগ্রসর সন্ন্যাসি-সাধকদিগের ভিতরেও তিনি ঐরূপ একদেশী ভাব দেখিতে পাইতেন। অদ্বৈতভূমির উদার সমভাব লাভ করিবার বহু পূর্ব্বেই তাঁহারা অন্য-সকল পন্থার লোকদিগকে হীনাধিকারী বলিয়া সমভাবে ঘৃণা বা বড় জোর একপ্রকার অহঙ্কৃত করুণার চক্ষে দেখিতে শিখিতেন। উদারবুদ্ধি ঠাকুরের একই লক্ষ্যে অগ্রসর ঐ সকল ব্যক্তিদিগের ঐ প্রকার পরস্পর-বিদ্বেষ দেখিয়া যে বিশেষ কষ্ট হইত, একথা আর বলিতে হইবে না এবং ঐ একদেশিতা যে ধর্ম্মহীনতা হইতে উৎপন্ন, এ কথা বুঝিতে বাকি থাকিত না।

যথার্থ সাধুদের ভিতরেও একদেশী ভাব দেখা

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বসিয়া ঠাকুর যে ধর্ম্মহীনতা ও এক-দেশিতার পরিচয় গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেরই ভিতর প্রতিদিন পাইতেছিলেন, তীর্থে দেবস্থানে গমন করিয়া উহার কিছুই কম না দেখিয়া বরং সমধিক প্রতাপই দেখিতে পাইলেন। মথুরের দানগ্রহণ করিবার সময় ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ, কাশীস্থ কতকগুলি তান্ত্রিক সাধকের পূজানুষ্ঠান দেখিতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জগদম্বার পূজা নামমাত্র সম্পন্ন করিয়া কেবল কারণ-পানে ঢলাঢলি, দণ্ডী স্বামীদের প্রতিষ্ঠা ও নামযশলাভের জন্য প্রাণপণ

প্রয়াস, বৃন্দাবনে বৈষ্ণব বাবাজীদের সাধনার ভানে যোষিৎসঙ্গে কালযাপন প্রভৃতি সকল ঘটনাই ঠাকুরের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সম্মুখে নিজ যথাযথ রূপ প্রকাশ করিয়া সমাজ এবং দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা বুঝাইতে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিল। অবশ্য নিজের ভিতর অতি গভীর নির্ব্বিকল্প অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি না থাকিলে শুদ্ধ ঐ সকল ঘটনা দেখাটা ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিত না। ঐ ভাবোপলব্ধি ইতিপূর্ব্বে করাতেই ঠাকুরের মনে ব্যক্তিগত ও সমাজগত মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা স্থির ছিল এবং উহার সহিত তুলনায় সকল বিষয় ধরা বুঝা সহজসাধ্য হইয়াছিল। অতএব যথার্থ উন্নতি, সভ্যতা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ঠা, যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি প্রেরক ভাব-সমূহ কোন্ লক্ষ্যে মানবকে অগ্রসর করাইতেছে; অথবা উহাদের পরিসমাপ্তিতে মানব কোথায় যাইয়া কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইবে, তদ্বিষয় নিঃসংশয়রূপে জানাতেই ঠাকুরের সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ঐরূপে দেখা ও আলোচনা তাঁহাকে সকল বিষয়ে সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণে সহায়তা করিয়াছিল। বুঝনা—যথার্থ সাধুতার জ্ঞান না থাকিলে তিনি কোন্ সাধু কতদূর অগ্রসর তাহা ধরিতেন কিরূপে? তীর্থে ও দেবমূর্ত্ত্যাদিতে বাস্তবিকই যে ধর্ম্মভাব বহুলোকের চিন্তাশক্তি-সহায়ে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, একথা পূর্ব্বে নিঃসংশয়রূপে না দেখিলে মহাসত্যনিষ্ঠ ঠাকুর জনসাধারণকে তীর্থাটন ও

তীর্থে ধর্ম্মহীনতার পরিচয় পাওয়া। আমাদের দেখা-শুনায় ও ঠাকুরের দেখা-শুনায় কত প্রভেদ

সাকারোপাসনায় অতি দৃঢ়তার সহিত প্রোৎসাহিত করিতেন কিরূপে? অথবা নানা ধর্ম্মসকলের কোন্ দিকে গতি এবং কোথায় পরিসমাপ্তি তাহা জানা না থাকিলে ঐ সকলের একদেশিতাটিই যে দূষণীয়, একথা ধরিতেন কিরূপে? আমরাও নিত্য সাধু, তীর্থ, দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রমতসকলের অনন্ত কোলাহল শুনিয়া বধির হই, বুদ্ধিকৌশল এবং বাক্‌বিতণ্ডায় কখন এ মতটি, কখন ও-মতটি সত্য বলিয়া মনে করি, জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া মানবের লক্ষ্য কখন এটা কখন ওটা হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি; অথচ কোনও বিষয়েই একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিরন্তর সন্দেহে দোলায়মান থাকি এবং কখন কখন নাস্তিক হইয়া ভোগসুখলাভটাই জীবনে সারকথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি! আমাদের ঐরূপ দেখাশুনায়, আমাদের ঐরূপ আজ একপ্রকার, কাল অন্য-প্রকার সিদ্ধান্তে আমাদিগকে কি এমন বিশেষ সহায়তা করে? ঠাকুরের পূর্ব্বোক্তরূপ অদ্ভুত গঠন ও স্বভাববিশিষ্ট মন ছিল বলিয়া তিনি যাহা একবারমাত্র দেখিয়া ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আমাদের পশুভাবাপন্ন মন শত জন্মেও তাহা জগদ্‌গুরু মহাপুরুষ-দিগের সহায়তা ব্যতীত বুঝিতে পারিবে কি না, বলিতে পারি না। জাতিগত সৌসাদৃশ্য উভয়ে সামান্যভাবে লক্ষিত হইলেও ঠাকুরের মনে ও আমাদের মনে যে কত প্রভেদ, তাহা প্রতি কার্য্যকলাপেই বেশ অনুমিত হয়। ভক্তিশাস্ত্র ঐ জন্যই অবতারপুরুষদিগের মন সাধারণাপেক্ষা ভিন্ন উপাদানে—রজস্তমোরহিত শুদ্ধ সত্ত্বগুণে গঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এইরূপে দিব্য ও সাধারণ উভয় ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়াই দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মহীনতা, প্রচলিত ধর্ম্মমতসকলের একদেশিতা প্রত্যেক ধর্ম্মমত সমভাবে সত্য হইলেও এবং বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবকে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চরমে একই লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিলেও পূর্ব্বপূর্ব্বাচার্য্যগণের তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বা দেশকাল-পাত্র-বিবেচনায় অপ্রচার ইত্যাদি অভিনব মহাসত্যসকলের ধারণা ঠাকুর তীর্থাদি-দর্শন হইতেই বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। আর অনুভব করিয়াছিলেন যে একদেশিত্বের গন্ধমাত্ররহিত বিদ্বেষসম্পর্কমাত্রশূন্য তাঁহার নিজভাব জগতের পক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার! উহা তাঁহারই নিজস্ব সম্পত্তি। তাঁহাকেই উহা জগৎকে দান করিতে হইবে।

ঠাকুরের নিজ উদার মতের অনুভব

"সর্ব্ব ধর্ম্মমতই সত্য—যত মত তত পথ"—এই মহদুদার কথা জগৎ ঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রথম শুনিয়া যে মোহিত হইয়াছে, একথা আমাদের অনেকে এখন জানিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ঋষি ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের কাহারও কাহারও ভিতরে ঐরূপ উদার ভাবের অন্ততঃ আংশিক বিকাশ দেখা গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, ঐ সকল আচার্য্য নিজ নিজ বুদ্ধি-সহায়ে প্রত্যেক মতের কতক কতক কাটিয়া ছাঁটিয়া ঐ সকলের ভিতর যতটুকু সারাংশ বলিয়া স্বয়ং বুঝিতেন তৎ-সকলের মধ্যেই একটা সমন্বয়ের ভাব টানাটানি করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। ঠাকুর যেমন প্রত্যেক মতের

'সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত তত পথ', একথা জগতে তিনিই যে প্রথমে অনুভব করিয়াছেন, ইহা ঠাকুরের ধরিতে পারা

কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া সমান অনুরাগে নিজ জীবনে উহাদের প্রত্যেকের সাধনা করিয়া তত্তৎমত-নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়া ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্ব্বের কোন আচার্য্যই ঐ সত্য উপলব্ধি করেন নাই। সে যাহাই হউক, ঐ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল এই কথাই পাঠককে এখানে বলিতে চাহি যে, ঐ উদার ভাবের পরিচয় ঠাকুরের জীবনে আমরা বাল্যাবধিই পাইয়া থাকি। তবে তীর্থদর্শন করিয়া আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঠাকুর এ কথাটি নিশ্চয় করিয়া ধরিতে পারেন নাই যে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে ঐরূপ উদারতা একমাত্র তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি আচার্য্য বা অবতারখ্যাত পুরুষ-সকলে এক একটি বিশেষ পথ দিয়া কেমন করিয়া লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে হয়, তদ্বিষয় জনসমাজে প্রচার করিয়া যাইলেও ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যে একই লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, এ সংবাদ তাঁহাদের কেহই এ পর্য্যন্ত প্রচার করেন নাই। ঠাকুর বুঝিলেন, সাধনকালে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সকল প্রকার বাসনা কামনা শ্রীশ্রীজগন্মাতার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সংসারে, মায়ার রাজ্যে আর কখন ফিরিবেন না বলিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া অদ্বৈতভাব-ভূমিতে অবস্থান করিলেও যে জগদম্বা তাঁহাকে তখন তাহা করিতে দেন নাই, নানা অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার শরীরটা এখনও রাখিয়া দিয়াছেন তাহা এই কার্য্যের জন্য—যতদূর সম্ভব একদেশী ভাব জগৎ হইতে দূর করিবার জন্য এবং জগৎও ঐ অশেষকল্যাণকর ভাব গ্রহণ করিবার জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কিরূপে আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহাই এখন পাঠককে বলিবার প্রয়াস পাইব।

ধর্ম্মবস্তুর উপলব্ধি যে বাক্যের বিষয় নহে, অনুষ্ঠানসাপেক্ষ—এ কথা ঠাকুরের বাল্যাবধিই ধারণা ছিল। আবার ঐ বস্তু যে বহুকালানুষ্ঠানে সঞ্চিত করিয়া অপরে সংক্রামিত করিতে বা অপরকে যথার্থ ই প্রদান করিতে পারা যায় ইহাও ঠাকুর সাধনকালে সময়ে সময়ে এবং সিদ্ধিলাভ করিবার পরে অনেক সময় অনুভব করিতেছিলেন। ঐ কথার আমরা ইতিপূর্ব্বেই[১] অনেক স্থলে আভাস দিয়া আসিয়াছি। জগদম্বা কৃপা করিয়া তাঁহাতে যে ঐ শক্তি বিশেষভাবে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং মথুরপ্রমুখ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃপায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ আত্মহারা করিয়া ঐ শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তদ্বিষয়ে প্রমাণও ঠাকুর এ পর্য্যন্ত অনেকবার আপন জীবনে পাইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার ইতিপূর্ব্বে এই ধারণামাত্রই হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহার শরীর ও মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি ভাগ্যবানকেই কৃপা করিবেন—কি ভাবে বা কখন ঐ কৃপা করিবেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং শিশুর ন্যায় মাতার উপর নিঃসঙ্কোচে নির্ভরশীল ঠাকুরের মন উহা বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই। কিন্তু ভারতকে ধর্ম্মদান করিতে হইবে, জগতে ধর্ম্ম-বন্যা খরস্রোতে প্রবাহিত করিতে হইবে, এ কথা তাঁহার মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। এখন হইতে জগদম্বা তাঁহার শরীর-মনকে আশ্রয় করিয়া ঐ নূতন লীলার আরম্ভ যে করিতেছেন, ঠাকুর

জগৎকে ধর্ম্মদান করিতে হইবে বলিয়াই জগদম্বা তাঁহাকে অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, ঠাকুরের ইহা অনুভব করা

১ গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায় দেখ।

এ কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু করিলেই বা উপায় কি? জগদম্বা কোন্ দিক দিয়া কি করাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছেন, তাহা না বুঝিতে দিলেই বা তিনি কি করিবেন? 'মা আমার, আমি মার'—একথা সত্যসত্যই সর্ব্বকালের জন্য বলিয়া তিনি যে বাস্তবিকই জগদম্বার বালক হইয়া গিয়াছেন! মার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহাতে যে বাস্তবিকই অপর কোনরূপ ইচ্ছার উদয় নাই! এক ইচ্ছা যাহা সময়ে সময়ে উদিত হইত—মাকে নানা ভাবে নানা পথ দিয়া জানিবেন, তাহাও যে ঐ মা-ই নানা সময়ে তাঁহার মনে তুলিয়া দিয়াছিলেন, এ কথাও মা তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে বিলক্ষণরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব এখনকার অভিনব অনুভবে জগদম্বার বালক সানন্দে মার মুখের প্রতিই চাহিয়া রহিল এবং জগন্মাতাই পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাঁহাকে লইয়া খেলিতে লাগিলেন।

তীর্থাদিদর্শনে পূর্ব্বোক্ত সত্যসকলের অনুভবে ঠাকুর যে আমাদের ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্যপদবী লয়েন নাই, একথা আমরা দিব্যপ্রেমিকা তপস্বিনী গঙ্গামাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবার ইচ্ছাতেই বেশ বুঝিতে পারি। 'মার কাজ মা করেন, আমি জগতের কাজ করিবার, লোক শিক্ষা দিবার কে?'—এই ভাবটি ঠাকুরের মনে আজীবন যে কি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা কল্পনাসহায়েও এতটুকু বুঝিতে পারি না! কিন্তু ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার জগদম্বার কার্য্যের যথার্থ যন্ত্রস্বরূপ

আমাদের ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঠাকুর আচার্য্যপদবী গ্রহণ করেন নাই

হওয়া, ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার ভাবমুখে নিরন্তর স্থিতি, ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহাতে শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ এবং ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার মনে ঐ গুরুভাব ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব অভিনবাকার ধারণ করিয়া এখন পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকাশ পাওয়া! এতদিন গুরু-ভাবের আবেশকালে ঠাকুর আত্মহারা হইয়া পড়িয়া তাঁহার শরীর-মনাশ্রয়ে যে কার্য্য হইত তাহা নিষ্পন্ন হইয়া যাইবার পর তবে ধরিতে বুঝিতে পারিতেন—এখন তাঁহার শরীর-মন ঐ ভাবের নিরন্তর ধারণ ও প্রকাশে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়া উহাই তাঁহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়া তিনি না চাহিলেও তাঁহাকে যথার্থ আচার্য্যপদবীতে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিল। পূর্ব্বে দীন সাধক বা বালক-ভাবই ঠাকুরের মনের সহজাবস্থা ছিল; ঐ ভাবাবলম্বনেই তিনি অনেককাল অবস্থিতি করিতেন এবং গুরুভাবের প্রকাশ তাঁহাতে স্বল্পকালই হইত। এখন তদ্বিপরীত হইয়া গুরুভাবেরই অধিক কাল অবস্থিতি এবং দীন সাধক বা বালক-ভাবের তাঁহাতে অল্পকাল স্থিতি হইতে লাগিল।

ঐ বিষয়ে প্রমাণ—ভাবমুখে ঠাকুরের জগদম্বার সহিত কলহ

অহঙ্কৃত হইয়া আচার্য্যপদবীগ্রহণ যে ঠাকুরের মনের নিকট এককালে অসম্ভব ছিল তাহার পরিচয় আমরা অনেক দিন ঠাকুরের ভাবাবেশে জগদম্বার সহিত বালকের ন্যায় কলহে পাইয়াছি। ফুল্ল শতদলের সৌরভে মধুকরপংক্তির ন্যায় ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যখন অশেষ জনতা হইতেছিল তখন একদিন আমরা যাইয়া দেখি ঠাকুর ভাবাবস্থায় মার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "কচ্ছিস্ কি? এত

লোকের ভিড় কি আনতে হয়? (আমার) নাইবার খাবার সময় নেই! [ঠাকুরের তখন গলদেশে ব্যথা হইয়াছে। নিজের শরীর লক্ষ্য করিয়া] এটা তো ভাঙ্গা ঢাক্! এত করে বাজালে কোন্ দিন ফুটো হয়ে যাবে যে! তখন কি করবি?"

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমরা তাঁহার নিকট বসিয়া আছি। সেটা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুত প্রতাপ হাজরার মাতার পীড়ার সংবাদ আসায় ঠাকুর তাহাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া মাতার সেবা করিতে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন—সে-দিনও আমরা উপস্থিত ছিলাম। অদ্য সংবাদ আসিয়াছে প্রতাপচন্দ্র দেশে না যাইয়া বৈদ্যনাথ দেওঘরে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ঐ সংবাদে একটু বিরক্তও হইয়াছেন। একথা সেকথার পর ঠাকুর আমাদিগকে একটি সঙ্গীত গাহিতে বলিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। সেদিনও ঠাকুর ঐ ভাবাবেশে জগদম্বার সহিত বালকের ন্যায় বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "অমন সব আদাড়ে লোককে এখানে আনিস্ কেন? (একটু চুপ করিয়া) আমি অত পারবো না। এক সের দুধে এক-আধপো জলই থাক—তা নয়, এক সের দুধে পাঁচ সের জল! জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে ধেঁায়ায় চোখ জ্বলে গেল! তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জ্বাল ঠেলতে পারবো না। অমন সব লোককে আর আনিস্ নি।" কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ঐ কথা মাকে বলিতেছেন, তাহার কি দুরদৃষ্ট—একথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম!

মার সহিত ঐরূপ বিবাদ ঠাকুরের নিত্য উপস্থিত হইত ; তাহাতে দেখা যাইত যে, যে আচার্য্যপদবীর সম্মানের জন্য অন্য সকলে লালায়িত, ঠাকুর তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে মাকে নিত্য তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে বলিতেন।

ঠাকুরের অনুভব : "সরকারী লোক—আমাকে জগদম্বার জমীদারীর যেখানে যখনই গোলমাল হইবে সেখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে"

এইরূপে ইচ্ছাময়ী জগদম্বা নিজ অচিন্ত্য লীলায় তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত উপলব্ধিসকল আজীবন করাইয়া তাঁহার ভিতর যে মহদুদার আধ্যাত্মিক ভাবের অবতারণা করাইয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে জগতে অন্য কোনও আচার্য্য মহাপুরুষই আর করেন নাই—একথাটি ঠাকুরকে বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে অপরকে কৃতার্থ করিবার জন্য তিনি ঠাকুরের ভিতরে ধর্ম্মশক্তি যে কতদূর সঞ্চিত রাখিয়াছেন এবং ঐ শক্তি অপরে সংক্রমণের জন্য তাঁহাকে যে কি অদ্ভুত যন্ত্রস্বরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ও জগন্মাতা ঠাকুরকে এই সময়ে দেখাইয়া দেন। ঠাকুর সবিস্ময়ে দেখিলেন—বাহিরে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মাভাব, আর ভিতরে মার লীলায় ঐ অভাবপূরণের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চয়! দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আবার মা এ যুগে অজ্ঞান-মোহরূপ দুর্দ্দান্তরক্তবীজ-বধে রণরঙ্গে অবতীর্ণা! আবার জগৎ মার অহেতুকী করুণার খেলা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবে এবং অনন্তগুণময়ী কোটী-ব্রহ্মাণ্ড-নায়িকার জয়স্তুতি করিতে যাইয়া বাক্য খুঁজিয়া পাইবে না! উত্তাপের আতিশয্যে মেঘের উদয়, হ্রাসের শেষে স্ফীতির উদয়, দুর্দ্দিনের অবসানে সুদিনের উদয় এবং বহুলোকের বহুকালসঞ্চিত

প্রাণের অভাবে জগদম্বার অহেতুকী করুণা ঘনীভূত হইয়া এইরূপেই গুরুভাবের জীবন্ত সচল বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হয়! জগদম্বা কৃপায় ঠাকুরকে ঐ কথা বুঝাইয়া আবার কৃপা করিয়া দেখাইলেন ঠাকুরকে লইয়া তাঁহার ঐরূপ লীলা বহুযুগে বহুবার হইয়াছে; পরেও আবার বহুবার হইবে। সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি নাই। 'সরকারী লোক—তাঁহাকে জগদম্বার জমীদারীর যেখানে যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে সেইখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে।'—ঠাকুরের ঐ সকল কথার অনুভব এখন হইতেই যে হইয়াছিল এ বিষয় আমরা ঐরূপে বেশ বুঝিতে পারি।

নিজ ভক্তগণকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের প্রাণ ব্যাকুল হওয়া

'যত মত তত পথ'-রূপ উদার মতের উদয় জগদম্বাই 'লোকহিতায়' কৃপায় তাঁহাতে করিয়াছেন একথা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের বিচারশীল মন আর একটি বিষয়-অনুসন্ধানে যে এখন হইতে অগ্রসর হইয়াছিল একথা স্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন্ ভাগ্যবানেরা তাঁহার শরীর-মনাশ্রয়ে অবস্থিত সাক্ষাৎ মার নিকট হইতে ঐ নবীনোদার ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ জীবন-গঠনে ধন্য হইবে, কাহারা মার নিকট হইতে শক্তিগ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান যুগের অভিনব লীলার সহায়ক হইয়া অপরকে ঐ ভাব গ্রহণ করাইয়া কৃতার্থ করিবে, কাহাদিগকে মা ঐ মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন—এই সকল কথা বুঝিবার, জানিবার ইচ্ছায় তাঁহার মন এ সময় ব্যাকুল হইয়া উঠে। মথুরের সহিত ঠাকুরের প্রেমসম্বন্ধ-বিচারকালে ঠাকুরের নিজ-

ভক্তগণকে দর্শনের কথা পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি।[১] জগদম্বার অচিন্ত্য লীলায় পৃথিবীর সকল বিষয়ে এতকাল সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে অবস্থিত ঠাকুরের মনে তাহাদের পূর্ব্বদৃষ্ট মুখগুলি এখন উজ্জ্বল জীবন্ত ভাব ধারণ করিল! তাহারা কতগুলি হইবে, কবে কতদিনে মা তাহাদের এখানে আনয়ন করিবেন, তাহাদের কাহার দ্বারা মা কোন্ কাজ করাইয়া লইবেন, মা তাঁহাদিগকে তাঁহার ন্যায় ত্যাগী করিবেন অথবা গৃহধর্ম্মে রাখিবেন—সংসারে এ পর্য্যন্ত দুই-চারি জনেই তাঁহাকে লইয়া মার এই অপূর্ব্ব লীলার কথা অল্প-স্বল্প মাত্র বুঝিয়াছে, আগত ব্যক্তিদিগের কেহও কি জগদম্বার ঐ লীলার কথা যথাযথ সম্যক্ বুঝিতে পারিবে অথবা আংশিক বুঝিয়াই চলিয়া যাইবে—এইরূপ নানা কথার তোলাপাড়া করিয়াই যে এ অদ্ভুত সন্ন্যাসি-মনের এখন দিন কাটিতে লাগিল, একথা তিনি পরে অনেক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছেন। বলিতেন, "তোদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠ্‌তো, এমনভাবে মোচর দিত যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম! ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হত। লোকের সাম্‌নে, কি মনে করবে ভেবে, কাঁদ্‌তে পারতুম না; কোনও রকমে সামলে-সুমলে থাকতুম। আর যখন দিন গিয়ে রাত আস্‌ত, মার ঘরে বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আরও একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলি নি ভেবে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির উপরে ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয়রে' বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাক ছেড়ে কাঁদতুম!"

১ গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৭ম অধ্যায় দেখ।

মনে হত পাগল হয়ে যাব! তারপর কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আস্‌তে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই! আর আগে দেখেছিলাম বলে, তোরা যেমন যেমন আস্‌তে লাগ্‌লি অম্‌নি চিনতে পারলুম! তারপর পূর্ণ যখন এল, তখন মা বল্লে, 'ঐ পূর্ণতে তুই যারা সব আসবে বলে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হল। ঐ থাকের (শ্রেণীর) লোকের কেউ আসতে আর বাকি রইল না।' মা দেখিয়ে বলে দিলে, 'এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ।'" অদ্ভুত দর্শন—অদ্ভুত তাহার সফলতা! আমরা ঠাকুরের ঐ সকল কথার অর্থ কতদূর কি বুঝিতে পারি? ঠাকুরের এখনকার অবস্থাসম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাসকল যে স্বকপোল-কল্পিত নহে, পাঠককে উহা বুঝাইবার জন্যই ঠাকুরের ঐ কথাগুলির এখানে উল্লেখ করিলাম।

ঠাকুরের ধারণা—'যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে; যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে'

এইরূপে নিজ উদার মতের অনুভব করিবার এবং গ্রহণের অধিকারী কাহারা, একথা নির্ণয় করিতে যাইয়া ঠাকুরের আর একটি কথারও ধারণা উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর উহা আমাদিগকে স্বয়ং অনেক সময় বলিতেন। বলিতেন, "যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে—যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।" কথাগুলি শুনিয়া কত লোক কত কি যে ভাবিয়াছে, তাহা বলিয়া উঠা দায়। কেহ উহা একেবারে অযুক্তিকর সিদ্ধান্ত করিয়াছে; কেহ ভাবিয়াছে, উহা ঠাকুরের ভক্তিবিশ্বাস-প্রসূত অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র; কেহ বা

ঐ সকলে ঠাকুরের মস্তিষ্কবিকৃতি অথবা অহঙ্কারের পরিচয় পাইয়াছে; কেহ বা আমরা বুঝিতে না পারিলেও ঠাকুর যখন বলিয়াছেন তখন উহা বাস্তবিকই সত্য, এইরূপ বুঝিয়া তৎসম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করাটা বিশ্বাসের হানিকর ভাবিয়া চক্ষুকর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছে; আবার কেহ বা ঠাকুর যদি উহা কখন বুঝান তো বুঝিব ভাবিয়া উহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই একটা পাকা না করিয়া উহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যে যাহা বলিতেছে, তাহা অবচলিত চিত্তে শুনিয়া যাইতেছে। কিন্তু অহঙ্কার-সম্পর্ক-মাত্রশূন্য স্বাভাবিক সহজ ভাবেই যে জগদম্বা ঠাকুরকে নিজ উদার মতের অনুভব ও যথার্থ আচার্য্য-পদবীতে আরূঢ় করাইয়াছিলেন, একথা যদি আমরা পাঠককে বুঝাইতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে তাঁহার ঐ কথাগুলির অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। শুধু তাহাই নহে, একটু তলাইয়া দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন যে ঐ কথাগুলিই ঠাকুরের সহজ স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থালাভ-বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণস্বরূপ।

জগদম্বার বালক ঠাকুর নিজ শরীর-মনের অন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া বর্ত্তমানে যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চয় ও শক্তি-সংক্রমণ-ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহা যে তাঁহার নিজ চেষ্টার ফলে, একথা তিলেকের জন্যও তাঁহার জননীগত-প্রাণ মনে উদিত হয় নাই। উহাতে তিনি অচিন্ত্যলীলাময়ী জগজ্জননীর খেলাই দেখিয়াছিলেন এবং দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। অঘটন-ঘটনপটীয়সী মা নিরক্ষর শরীর-মনটাকে

জগদম্বার প্রতি একান্ত নির্ভরেই ঠাকুরের ঐরূপ ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়

আশ্রয় করিয়া এ কি বিপুল খেলার আয়োজন করিয়াছেন! মূককে বাগ্মী করা, পঙ্গুর দ্বারা সুমেরু উল্লঙ্ঘন করান প্রভৃতি মার যে-সকল লীলা দেখিয়া লোকে মোহিত হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, বর্ত্তমান লীলা যে ঐ সকলকে শতগুণে সহস্রগুণে অতিক্রম করিতেছে! মার এ লীলায় বেদ বাইবেল পুরাণ কোরাণাদি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণিত, ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং জগতের যে অভাব পূর্ব্বে কোন যুগে কেহই দূর করিতে সমর্থ হয় নাই তাহাও চিরকালের মত বাস্তবিক অন্তর্হিত! ধন্য মা, ধন্য লীলাময়ী ব্রহ্মশক্তি! এইরূপ ভাবনার উদয়ই ঠাকুরের ঐ দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিল। মার কথায়, মার অনন্ত করুণায় ও অচিন্ত্য শক্তিতে একান্ত বিশ্বাসেই ঠাকুরের মন ঐ দর্শনকে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া ঐ লীলার প্রসার কতদূর, কাহারা উহার সহায়ক এবং ঐ শক্তিবীজ কিরূপ হৃদয়েই বা রোপিত হইবে—এই সকল প্রশ্ন পর পর জিজ্ঞাসা করিয়া উহার ফলস্বরূপ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে দেখা এবং যাহার শেষ জন্ম, যে ঈশ্বরকে পাইবার জন্য একবারও মনে প্রাণে ডাকিয়াছে সেই ব্যক্তিই মার এই অপূর্ব্বোদার নূতন ভাব-গ্রহণের অধিকারী, এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, উহা জগজ্জননীর উপর ঠাকুরের ঐকান্তিক বিশ্বাসের ফলেই আসিয়াছিল। মার উপর নির্ভরশীল বালকের ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন অন্যরূপ করিবার আর উপায়ই ছিল না এবং ঐরূপ করাতে ঠাকুরের অহঙ্কারের লেশমাত্রও মনে উদিত হয় নাই।

অতএব 'যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে, ঈশ্বরকে যে এ বারও ঠিক ঠিক ডেকেছে তাকে এখানে আসতে হবেই হবে'—

ঠাকুরের এই কথাগুলির ভিতর 'এখানে' কথাটির অর্থ যদি আমরা 'মার অভিনব উদার ভাবে' এইরূপ করি, তাহা হইলে বোধ হয় অযুক্তিকর হইবে না এবং কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু ঐ অর্থ স্বীকার করিলেই আবার অন্য প্রশ্ন উঠিবে—তাহারা কি জগদম্বার 'যত মত তত পথ-'রূপ উদারভাবে আপনা হইতে উপস্থিত হইবে অথবা জগদম্বা যাঁহাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া জগতে ঐ ভাব প্রথম প্রচার করিলেন, তাঁহার সহায়ে উপস্থিত হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের বোধে, প্রশ্নকর্ত্তার নিজের প্রাণে বা অপর কাহারও প্রাণে ঐ ভাব ঠিক ঠিক অনুভূতি করিবার ফল দেখিয়াই করা উচিত এবং যতদিন না ঐ দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন চুপ করিয়া থাকাই ভাল। তবে পাঠক যদি আমাদের ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করেন তো বলিতে হয়, ঠিক ঠিক ঐ ভাবানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে জগদম্বা যাঁহাকে ঐ ভাবময় করিয়া জগতের জন্য সংসারে প্রথম আনয়ন করিয়াছেন তাঁহার দর্শনও তোমার যুগপৎ লাভ হইবে এবং তাঁহার 'নির্ম্মাণমোহ' মূর্ত্তিতে প্রাণের ভক্তি-শ্রদ্ধা তুমি আপনা হইতেই ঢালিয়া দিবে। ঠাকুর উহা প্রার্থনা করিবেন না—অপরেও কেহ তোমায় ঐরূপ করিতে বলিবেন না, কিন্তু তুমি জগদম্বার প্রতি প্রেমে আপনিই উহা করিয়া ফেলিবে। এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরের ঐ কথার অর্থ

জগদম্বার ইচ্ছায় গুরুভাব কাহারও ভিতর কিঞ্চিন্মাত্র সহজ বা ঘনীভূত হইলে ঐ পুরুষের কার্য্যকলাপ, বিহার, ব্যবহার এবং অপরের প্রতি অহৈতুকী করুণাপ্রকাশ সকলই মানববুদ্ধির অগম্য

এক অদ্ভুতাকার যে ধারণ করে, ভারতের তন্ত্রকার একথা বারংবার বলিয়াছেন। ঐ ভাবের ঐরূপ বিকাশকে তন্ত্র দিব্যভাবাখ্যা প্রদান করেন এবং ঐ দিব্যভাবে ভাবিত পুরুষদিগের অপরকে শিক্ষাদীক্ষাদি-দান শাস্ত্রবিধিবদ্ধ নিয়মসকলের বহির্ভূত অসম্ভাবিত উপায়ে হইয়া থাকে, একথাও বলেন। কাহারও প্রতি করুণায় তাঁহারা ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই ঐ ব্যক্তিতে ধর্ম্মশক্তি সম্যক্ জাগ্রত করিয়া তদ্দণ্ডেই সমাধিস্থ করিতে পারেন; অথবা আংশিকভাবে ঐ শক্তিকে তাহাদের ভিতর জাগ্রত করিয়া এ জন্মেই যাহাতে উহা সম্যক্‌ভাবে জাগরিতা হয় ও সাধককে যথার্থ ধর্ম্মলাভে কৃতার্থ করে, তাহাও করিয়া দিতে পারেন। তন্ত্র বলেন, গুরুভাবের ঈষৎ ঘনীভূতাবস্থায় আচার্য্য শিষ্যকে 'শাক্তী' দীক্ষাদানে এবং বিশেষ ঘনীভূতাবস্থায় 'শাম্ভবী' দীক্ষাদানে সমর্থ হইয়া থাকেন। আর সাধারণ গুরুদেরই শিষ্যকে 'মান্ত্রী বা আণবী' দীক্ষাদান তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট। 'শাক্তী' ও 'শাম্ভবী' দীক্ষা সম্বন্ধে রুদ্রযামল, ষড়ন্বয় মহারত্ন, বায়বীয় সংহিতা, সারদা, বিশ্বসার প্রভৃতি সমস্ত তন্ত্র এক কথাই বলিয়াছেন। আমরা এখানে বায়বীয় সংহিতার শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম; যথা—

গুরুভাবের ঘনীভূতাবস্থাকেই তন্ত্র দিব্যভাব বলিয়াছেন। দিব্যভাবে উপনীত গুরুগণ শিষ্যকে কিরূপে দীক্ষা দিয়া থাকেন

শাম্ভবী চৈব শাক্তী চ মান্ত্রী চৈব শিবাগমে।
দীক্ষোপদিশ্যতে ত্রেধা শিবেন পরমাত্মনা॥
গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি।
সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তোর্দীক্ষা সা শাম্ভবী মতা॥

শাক্তী জ্ঞানবতী দীক্ষা শিষ্যদেহং প্রবিশ্যতি
গুরুণা জ্ঞানমার্গেন ক্রিয়তে জ্ঞানচক্ষুষা ॥
মান্ত্রী ক্রিয়াবতী দীক্ষা কুম্ভমণ্ডলপূর্ব্বিকা।

অর্থাৎ—আগমশাস্ত্রে পরমাত্মা শিব তিন প্রকার দীক্ষার উপদেশ করিয়াছেন, যথা—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। শাম্ভবী দীক্ষায় শ্রীগুরু-দর্শন, স্পর্শন বা সম্ভাষণ (প্রণামাদি) মাত্রেই জীবের তদ্দণ্ডে জ্ঞানোদয় হয়। শাক্তী দীক্ষায় জ্ঞানচক্ষু গুরু দিব্যজ্ঞান-সহায়ে শিষ্যের ভিতর নিজ শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করাইয়া দেন। মান্ত্রী দীক্ষায় মণ্ডল-অঙ্কন, ঘটস্থাপন এবং দেবতার পূজাদি পূর্ব্বক শিষ্যের কর্ণে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দিতে হয়।

শ্রীগুরুদর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণমাত্রেই শিষ্যের জ্ঞানের উদয় হওয়াকে শাম্ভবী দীক্ষা বলে এবং গুরুর শক্তি শিষ্য-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ভিতর জ্ঞানের উদয় করিয়া দেওয়াকেই শাক্তী দীক্ষা কহে

রুদ্রযামল বলেন—শাক্তী ও শাম্ভবী দীক্ষা সদ্যোমুক্তি-বিধায়িনী। যথা—

শাক্তী চ শাম্ভবী চান্যা সদ্যোমুক্তিবিধায়িনী।

সিদ্ধৈঃ স্বশক্তিমালোক্য তয়া কেবলয়া শিশোঃ।
নিরুপায়ং কৃতা দীক্ষা শাক্তেয়ী পরিকীর্ত্তিতা ॥
অভিসন্ধিং বিনাচার্য্য শিষ্যয়োরুভয়োরপি।
দেশিকানুগ্রহেণৈব শিবতা ব্যক্তিকারিণী ॥

অর্থাৎ—সিদ্ধ পুরুষেরা কোনরূপ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে শিষ্যের ভিতর যে দিব্য-জ্ঞানের উদয় করেন, তাহাকেই শাক্তী দীক্ষা কহে। শাম্ভবী দীক্ষায় আচার্য্য ও শিষ্যের মনে দীক্ষা প্রদান ও গ্রহণ করিব পূর্ব্ব হইতে এরূপ কোন সঙ্কল্প থাকে না। পরস্পরের দর্শন-মাত্রেই আচার্য্যের হৃদয়ে সহসা করুণার উদয় হইয়া শিষ্যকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয় এবং উহাতেই শিষ্যের ভিতর অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞানোদয় হইয়া সে শিষ্যত্ব স্বীকার করে।

পুরশ্চরণোল্লাস তন্ত্র বলেন, ঐ প্রকার দীক্ষায় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কালাকাল-বিচারেরও আবশ্যকতা নাই। যথা—

দীক্ষায়াং চঞ্চলাপাঙ্গি ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ।
সদ্‌গুরোর্দ্দর্শনাদেব সূর্য্যপর্ব্বে চ সর্ব্বদা॥
শিষ্যমাহূয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে।
তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিৎ ন বিচার্য্যং কদাচন॥

ঐরূপ দীক্ষায় কালাকাল-বিচারের আবশ্যকতা নাই

অর্থাৎ—হে চঞ্চলনয়নি পার্ব্বতি, বীর ও দিব্যভাবাপন্ন গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণে কালবিচারের কোনও আবশ্যকতা নাই। উত্তরায়ণকালে সদ্‌গুরুদর্শনলাভ হইলে এবং তিনি কৃপা করিয়া শিষ্যকে দীক্ষা দিতে আহ্বান করিলে লগ্নাদিবিচার না করিয়াই উহা লইবে।

সাধারণ দিব্যভাবাপন্ন গুরুর সম্বন্ধেই শাস্ত্র যখন ঐরূপ ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন, তখন এ অলৌকিক ঠাকুরের জগদম্বার হস্তে সর্ব্বথা যন্ত্রস্বরূপ থাকিয়া অহৈতুকী করুণায় অপরকে শিক্ষাদান

ও ধর্ম্মশক্তি-সঞ্চারের প্রকার আমরা কেমন করিয়া নির্ণয় করিতে পারিব! কারণ জগন্মাতা কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে এখন যে কেবল তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবের খেলাই শুধু দেখাইতে লাগিলেন তাহা নহে, কিন্তু দিব্যভাবাপন্ন যাবতীয় গুরুগণ 'যত মত তত পথ'-রূপ যে উদার ভাবের সাধন ও উপলব্ধি এ কাল পর্য্যন্ত কখনও করেন নাই, সেই মহদুদার ভাবের প্রকাশও তিনি এখন হইতে ঠাকুরের ভিতর দিয়া জগদ্ধিতায় করিতে লাগিলেন। তাই বলিতেছি, অতঃপর ঠাকুরের জীবনে এক নূতনাধ্যায় এখন হইতে আরম্ভ হইল।

দিব্যভাবাপন্ন গুরুগণের মধ্যে ঠাকুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—উহার কারণ

ভক্তিমান শ্রোতা হয়ত আমাদের ঐ কথায় কুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিবেন—তোমাদের ও-সকল কি প্রকার কথা? ঠাকুরকে যদি ঈশ্বরাবতার বলিয়াই নির্দ্দেশ কর, তবে তাঁহার ঐ ভাব বা শক্তিপ্রকাশ যে কখন ছিল না, একথা আর বলিতে পার না। ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি—ভ্রাতঃ, ঠাকুরের কথা-প্রমাণেই আমরা ঐরূপ বলিতেছি। নরদেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বরাবতার-দিগেরও সকল প্রকার ঈশ্বরীয় ভাব ও শক্তি-প্রকাশ সর্ব্বদা থাকে না; যখন যেটির আবশ্যক হয়, তখনই সেটি আসিয়া উপস্থিত হয়। কাশীপুরের বাগানে বহুকাল ব্যাধির সহিত সংগ্রামে ঠাকুরের শরীর যখন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাঁহার অন্তরের ভাব ও শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

অবতার-মহাপুরুষগণের ভিতরে সকল সময় সকল শক্তি প্রকাশিত থাকে না। ঐ বিষয়ে প্রমাণ

"মা দেখিয়ে দিচ্ছে কি যে, (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভেতর এখন এমন একটা শক্তি এসেছে যে, এখন আর কাহাকেও ছুঁয়ে দিতেও হবে না; তোদের বোল্‌বো ছুঁয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাইতেই অপরের চৈতন্য হয়ে যাবে! মা যদি এবার (শরীর দেখাইয়া) এটা আরাম করে দেন্ তো দরজায় লোকের ভিড় ঠেলে রাখ্‌তে পারবি না—এত সব লোক আস্‌বে! এত খাট্‌তে হবে যে ঔষধ খেয়ে গায়ের ব্যথা সারাতে হবে!"

ঠাকুরের ঐ কথাগুলিতেই বুঝা যায়, ঠাকুর স্বয়ং বলিতেছেন যে, যে শক্তিপ্রকাশ তাঁহাতে পূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই তাহাই তখন ভিতরে অনুভব করিতেছিলেন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত ঐ বিষয়ে দেওয়া যাইতে পারে।

ঠাকুরের ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্রের সহিত মিলন এবং উহার পরেই তাঁহার নিজ ভক্তগণের আগমন

দিব্যভাবের আবেগে ঠাকুর এখন ভক্তদিগকে ব্যাকুলচিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ডাকিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। যেখানে সংবাদ পৌছিলে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা প্রায় সকল ভক্তগণ জানিতে পারিবে, জগদম্বা তাঁহাকে সে কথা প্রাণে প্রাণে বলিয়া বেলঘরিয়ার উদ্যানে লইয়া যাইয়া ভক্তপ্রবর শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। ঐ ঘটনার অল্পদিন পর হইতে ঠাকুরের কৃপা-সম্পদের বিশেষভাবে অধিকারী, ভাবাবস্থায় পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দপ্রমুখ ভক্তসকলের একে একে আগমন হইতে থাকে; তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের দিব্য-ভাবে লীলার কথা ঠাকুর বলাইলে আমরা অন্য সময় বলিবার

চেষ্টা করিব। এখন ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যভাবাবেশে তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রথযাত্রার সময় নিজ ভক্তগণকে লইয়া যেরূপে কয়েকটি দিন কাটাইয়াছিলেন দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাহারই ছবি পাঠকের নয়ন-গোচর করিয়া আমরা গুরুভাবপর্ব্বের উপসংহার করি।

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবযাত্রা

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

—গীতা, ৯।৩১

দিব্য ভাবমুখে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে হইলে ভক্তসঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। কিরূপে কতভাবে ঠাকুর তাঁহার নানা প্রকৃতির ভক্তবৃন্দের সহিত প্রতিদিন উঠা-বসা, কথাবার্ত্তা, হাসি-তামাসা, ভাব ও সমাধিতে থাকিতেন তাহা শুনিতে ও তলাইয়া বুঝিতে হইবে, তবেই তাঁহার ঐ ভাবের লীলা একটু আধটু বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব ভক্তগণকে লইয়া ঠাকুরের ঐরূপ কয়েক দিনের লীলা-কথাই আমরা এখন পাঠককে উপহার দিব।

ঠাকুরে দেব-মানব উভয় ভাবের সম্মিলন

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, এ অলোকসামান্য মহাপুরুষের অতি সামান্য চেষ্টাদিও উদ্দেশ্যবিহীন বা অর্থশূন্য ছিল না। এমন অপূর্ব্ব দেব ও মানব-ভাবের একত্র সম্মিলন আর কোথাও দেখা দুর্লভ—অন্ততঃ পৃথিবীর নানা স্থানে এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া আমাদের চক্ষে আর একটিও পড়ে নাই। কথায় বলে—'দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না।'—ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ভাগ্যে তাহাই হইয়াছে। গলার অসুখের চিকিৎসা করাইবার জন্য ভক্তেরা যখন ঠাকুরকে কিছুদিন

কলিকাতায় শ্যামপুকুরে আনিয়া রাখেন, তখন শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া আমাদিগকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন।

শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দর্শন

শ্রীযুত বিজয় ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ দর্শন পান এবং উহা আপনার মাথার খেয়াল কি না জানিবার জন্য সম্মুখাবস্থিত দৃষ্ট মূর্ত্তির শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বহুক্ষণ ধরিয়া স্বহস্তে টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়া যাচাইয়া লন—সে কথাও ঐদিন ঠাকুরের ও আমাদের সম্মুখে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন।

শ্রীযুত বিজয়— দেশ-বিদেশ পাহাড়-পর্ব্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখলাম, কিন্তু (ঠাকুরকে দেখাইয়া) এমনটি আর কোথাও দেখলাম না; এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, তাহারই কোথাও দু-আনা, কোথাও এক আনা, কোথাও এক পাই, কোথাও আধ পাই মাত্র; চার আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।

ঠাকুর— (মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে) বলে কি !

শ্রীযুত বিজয়— (ঠাকুরকে) সেদিন ঢাকাতে যেরূপ দেখেছি, তাহাতে আপনি 'না' বল্‌লে আমি আর শুনি না, অতি সহজ হয়েই আপনি যত গোল করেছেন। কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর; যখনি ইচ্ছা তখনি এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি; আসতে কোন কষ্টও নাই—নৌকা, গাড়ী যথেষ্ট; ঘরের পাশে এইরূপে এত সহজে আপনাকে পাওয়া যায় বলেই আমরা আপনাকে

বুঝলাম না। যদি কোন পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকতেন, আর পথ হেঁটে অনাহারে গাছের শিকড় ধরে উঠে আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তাহলে আমরা আপনার কদর করতাম; এখন মনে করি ঘরের পাশেই যখন এইরকম, তখন না জানি বাহিরে দূর দূরান্তরে আরও কত ভাল ভাল সব আছে; তাই আপনাকে ফেলে ছুটোছুটি করে মরি আর কি!

ঠাকুরের ভক্তদের সহিত অলৌকিক আচরণে তাহাদের মনে কি হইত

বাস্তবিকই ঐরূপ! করুণাময় ঠাকুর তাঁহার নিকট যাহারা আসিত তাহাদের প্রায় সকলকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেন, একবার গ্রহণ করিলে তাহারা ছাড়াছাড়ি করিলেও আর ছাড়িতেন না এবং কখন কোমল, কখন কঠোর হস্তে তাহাদের জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কাররাশিকে শুষ্ক, দগ্ধ করিয়া নিজের নূতন ভাবে অদৃষ্টপূর্ব্ব, অমৃতময় ছাঁচে নূতন করিয়া গঠন করিয়া তাহাদের চিরশান্তির অধিকারী করিতেন! ভক্তেরা আপন আপন জীবন-কথা খুলিয়া বলিলে, এ কথায় আর সন্দেহ থাকিবে না। সেজন্য দেখিতে পাই, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ স্বগৃহে অবস্থানকালে কোন সময়ে সাংসারিক দুঃখকষ্টে অভিভূত হইয়া এবং এতদিন ধরিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন থাকিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইলাম না, ঠাকুরও কিছুই করিয়া দিলেন না—ভাবিয়া অভিমানে লুকাইয়া গৃহত্যাগে উদ্যত হইলে ঠাকুর তখন তাঁহাকে তাহা করিতে দিতেছেন না। দৈবশক্তি-প্রভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে সে দিন দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গে আনিয়াছেন এবং পরে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ভাবাবেশে গান ধরিয়াছেন—"কথা কহিতেও

ডরাই, না কহিতেও ডরাই ; আমার মনে সন্দ হয়, বুঝি তোমায় হারাই—হা রাই !" এবং নানাপ্রকারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতেছেন। আবার দেখি 'বকল্‌মা'-লাভে কৃতার্থ হইয়াও যখন শ্রীযুত গিরিশ পূর্ব্বসংস্কারের প্রতাপ স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হইতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, "এ কি ঢোঁরা সাপে তোকে ধরেছে রে শালা ? জাত সাপে ধরেছে—পালিয়ে বাসায় গেলেও মরে থাক্‌তে হবে ! দেখিস্ নে ? ব্যাঙ্‌গুলোকে যখন ঢোঁড়া সাপে ধরে, তখন কঁ্যা-কঁ্যা-কঁ্যা-কঁ্যা করে হাজার ডাক ডেকে তবে ঠাণ্ডা হয় (মরে যায়), কোনটা বা ছাড়িয়ে পালিয়েও যায় ; কিন্তু যখন কেউটে গোখ্‌রোতে ধরে, তখন কঁ্যা-কঁ্যা-কঁ্যা তিন ডাক ডেকেই আর ডাক্‌তে হয় না, সব ঠাণ্ডা। যদি কোনটা দৈবাৎ পালিয়েও যায় তো গর্ত্তে ঢুকে মরে থাকে। এখানকার সেরূপ জান্‌বি।" কিন্তু কে তখন ঠাকুরের ঐসব কথা ও ব্যবহারের মর্ম্ম বুঝে ? সকলেই ভাবিত, ঠাকুরের মত পুরুষ বুঝি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। ঠাকুর যেমন সকলের সকল আব্দার সহিয়া বরাভয়হস্তে সকলের দ্বারে অযাচিত হইয়া ফিরিতেছেন, সর্ব্বত্রই বুঝি এইরূপ। করুণাময় ঠাকুরের স্নেহের অঞ্চলে আবৃত থাকিয়া ভক্তদের তখন জোর কত, আব্দার কত, অভিমানই বা কত ! প্রায় সকলেরই মনে হইত, ধর্ম্মকর্ম্মটা অতি সোজা সহজ জিনিস। যখনি ধর্ম্মরাজ্যের যে ভাব দর্শনাদি লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখনি তাহা পাইব নিশ্চিত। ঠাকুরকে একটু ব্যাকুল হইয়া জোর করিয়া ধরিলেই হইল—ঠাকুর তখনি উহা অনায়াসে স্পর্শ, বাক্য বা কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারাই

লাভ করাইয়া দিবেন! ঐ বিষয়ে কতই বা দৃষ্টান্ত দিব! লেখাপড়ার ভিতর দিয়া কটাই বা বলা যায়!

শ্রীযুত বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) ইচ্ছা হইল, তাঁহার ভাবসমাধি হউক। ঠাকুরকে যাইয়া কান্নাকাটি করিয়া বিশেষভাবে ধরিলেন—"আপনি করে দিন।" ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মাকে বল্‌ব; আমার ইচ্ছাতে কি হয় রে?" ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুরের সে কথা কে শুনে? বাবুরামের ঐ এক কথা—"আপনি করে দিন।" এইরূপ আব্দারের কয়েকদিন পরেই শ্রীযুত বাবুরামকে কার্য্যবশতঃ নিজেদের বাটী আঁটপুরে যাইতে হইল। সেটা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এদিকে ঠাকুর তো ভাবিয়া আকুল—কি করিয়া বাবুরামের ভাবসমাধি হইবে! একে বলেন, ওকে বলেন, "বাবুরাম ঢের করে কাঁদাকাটা করে বলে গেছে যেন তার ভাব হয়—কি হবে? যদি না হয়, তবে সে আর এখানকার (আমার) কথা মান্‌বে নি।" তারপর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) বলিলেন, "মা, বাবুরামের যাতে একটু ভাবটাব হয় তাই করে দে।" মা বলিলেন, "ওর ভাব হবে না; ওর জ্ঞান হবে।" ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বাণী শুনিয়া আবার ভাবনা। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে বলিলেনও —"তাইতো বাবুরামের কথা মাকে বল্লুম, তা মা বল্লে 'ওর ভাব হবে নি, ওর জ্ঞান হবে'; তা যাই হোক একটা কিছু হয়ে তার মনে শান্তি হলেই হল; তার জন্যে মনটা কেমন করছে—অনেক কাঁদাকাটা করে গেছে" ইত্যাদি। আহা, সে কতই ভাবনা

স্বামী প্রেমানন্দের ভাবসমাধিলাভের ইচ্ছায় ঠাকুরকে ধরায় তাঁহার ভাবনা ও দর্শন

যাহাতে বাবুরামের কোনরূপে সাক্ষাৎ ধর্ম্মোপলব্ধি হয়! আবার সেই ভাবনার কথা বলিবার সময় ঠাকুরের কেমন বলা—"এটা না হলে ও (বাবুরাম) আর মানবে নি!" যেন তাহার মানা না মানার উপর ঠাকুরের সকলই নির্ভর করিতেছে!

আবার কখনও কখনও বলা হইত—"আচ্ছা, বল্ দেখি এই সব এদের (বালক ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) জন্মে এত ভাবি কেন? এর কি হল, ওর কি হল না, এত সব ভাবনা হয় কেন? এরা তো সব ইস্কুল বয় (school boy); কিছুই নেই—এক পয়সার বাতাসা দিয়ে যে আমার খবরটা নেবে, সে শক্তি নেই; তবু এদের জন্মে এত ভাবনা কেন? কেউ যদি দুদিন না এসেছে তো অমনি তার জন্মে প্রাণ আঁচোড়-পাঁচোড় করে, তার খবরটা জান্‌তে ইচ্ছা হয়—এ কেন?" জিজ্ঞাসিত বালক হয়ত বলিল, "তা কি জানি মশাই, কেন হয়। তবে তাদের মঙ্গলের জন্যই হয়।"

ঠাকুরের ভক্তদের সম্বন্ধে এত ভাবনা কেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। হাজরার ঠাকুরকে ভাবিতে বারণ করায় তাঁহার দর্শন ও উত্তর

ঠাকুর—কি জানিস্, এরা সব শুদ্ধসত্ত্ব; কাম-কাঞ্চন এদের এখনও স্পর্শ করে নি, এরা যদি ভগবানে মন দেয় তো তাঁকে লাভ কর্‌তে পারবে, এই জন্মে। এখানকার (আমার) যেন গাঁজাখোরের স্বভাব; গাঁজাখোরের যেমন একলা খেয়ে তৃপ্তি হয় না—একটান টেনেই কল্‌কেটা অপরের হাতে দেওয়া চাই, তবে নেশা জমে—সেই রকম। তবু আগে আগে নরেন্দরের জন্মে যেমনটা হত, তার মত এদের কারুর জন্মে হয় না। দুদিন যদি (নরেন্দ্রনাথ) আসতে দেরি করেছে তো বুকের ভিতরটায়

যেন গামছায় মোচড় দিত। লোকে কি বল্‌বে বলে ঝাউতলায়[১] গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। হাজরা[২] (এক সময়ে) বলেছিল, "ও কি তোমার স্বভাব? তোমার পরমহংস অবস্থা; তুমি সর্ব্বদা তাঁতে (শ্রীভগবানে) মন দিয়ে সমাধি লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে; তা না, নরেন্দ্র এলো না কেন, ভবনাথের কি হবে—এ সব ভাব কেন?" শুনে ভাবলুম—ঠিক বলেছে, আর অমনটা করা হবে নি; তারপর ঝাউতলা থেকে আসচি আর (শ্রীশ্রীজগদম্বা) দেখাচ্চে কি, যেন কলকাতাটা সামনে আর লোকগুলো সব কাম-কাঞ্চনে দিনরাত ডুবে রয়েছে ও যন্ত্রণা ভোগ কচ্চে। দেখে দয়া এলো। মনে হল, লক্ষগুণ কষ্ট পেয়েও যদি এদের মঙ্গল হয়, উদ্ধার হয় ত তা করবো। তখন ফিরে এসে হাজরাকে বল্লুম—বেশ করেছি, এদের জন্যে সব ভেবেছি। তোর কি রে শালা? নরেন্দর একবার বলেছিল, 'তুমি অত নরেন্দর নরেন্দর কর কেন? অত নরেন্দর নরেন্দর করলে তোমায় নরেন্দ্রের মত হতে হবে! ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে হরিণ হয়েছিল।' নরেন্দরের কথায় খুব বিশ্বাস কি না? শুনে ভয় হল! মাকে বললুম। মা বললে, 'ও ছেলে মানুষ; ওর কথা শুনিস্ কেন? ওর ভেতরে নারায়ণকে দেখতে পাস,

স্বামী বিবেকানন্দের ঠাকুরকে ঐ বিষয় বারণ করায় তাঁহার দর্শন ও উত্তর

১ রাণী রাসমণির কালীবাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ঝাউবৃক্ষগুলি। উদ্যানের ঐ অংশ শৌচাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় ঐ দিকে কেহ অন্য কোন কারণে যাইত না।

২ শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র হাজরা।

তাই ওর দিকে টান হয়।' শুনে তখন বাঁচলুম! নরেন্দ্রকে এসে বললুম, 'তোর কথা আমি মানি না; মা বলেছে তোর ভেতর নারায়ণকে দেখি বলেই তোর উপর টান হয়, যে দিন তা না দেখতে পাব, সে দিন থেকে তোর মুখও দেখব না রে শালা।'" এইরূপে অদ্ভুত ঠাকুরের অদ্ভুত ব্যবহারের প্রত্যেকটিরই অর্থ ছিল, আর আমরা তাহা না বুঝিয়া বিপরীত ভাবিলে পাছে আমাদের অকল্যাণ হয়, সেজন্য এইরূপে বুঝাইয়া দেওয়া ছিল।

ঠাকুরের গুণী ও মানী ব্যক্তিকে সম্মান করা—উহার কারণ

গুণীর গুণের কদর, মানীর মানরক্ষা ঠাকুরকে সর্ব্বদাই করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন, "ওরে, মানীকে মান না দিলে ভগবান রুষ্ট হন; তাঁর (শ্রীভগবানের) শক্তিতেই তো তারা বড় হয়েছে, তিনিই তো তাদের বড় করেছেন—তাদের অবজ্ঞা করলে তাঁকে (শ্রীভগবানকে অবজ্ঞা করা হয়।" তাই দেখতে পাই, যখনই ঠাকুর কোথাও কোন বিশেষ গুণী পুরুষের খবর পাইতেন, অমনি তাঁহাকে কোন না কোন উপায়ে দর্শন করিতে ব্যস্ত হইতেন। উক্ত পুরুষ যদি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে তো কথাই নাই, নতুবা স্বয়ং তাঁহার নিকট অনাহূত হইয়াও গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন, প্রণাম ও আলাপ করিয়া আসিতেন। বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাশীধামের প্রসিদ্ধ বীণকার মহেশ, শ্রীবৃন্দাবনে সখীভাবে ভাবিতা গঙ্গামাতা, ভক্তপ্রবর কেশব সেন—ঐরূপ আরও কত লোকেরই নাম না উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইঁহাদের প্রত্যেকের

বিশেষ বিশেষ গুণের কথা শুনিয়া দর্শন করিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া ঠাকুর স্বয়ং উঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঠাকুর অভিমান-রহিত হইবার জন্য কতদূর করিয়াছিলেন

অবশ্য ঠাকুরের ঐরূপে অযাচিত হইয়া কাহারও দ্বারে উপস্থিত হওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ 'আমি এত বড়লোক, আমি অপরের নিকট এইরূপে যাইলে খেলো হইতে হইবে, মর্য্যাদাহানি হইবে'—এ সব ভাব তো ঠাকুরের মনে কখন উদিত হইত না। অহঙ্কার অভিমানটাকে তিনি যে একেবারে ভস্ম করিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন! কালীবাটীতে কাঙ্গালী-ভোজনের পর কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি মাথায় করিয়া বহিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া স্বহস্তে ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়াছিলেন; সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত কোন সময়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কালীবাটীর চাকর-বাকরদিগের শৌচাদির জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাও এক সময়ে স্বহস্তে ধৌত করিয়া নিজ কেশ দ্বারা মুছিতে মুছিতে[১] জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, উহাদের চাইতে বড়, এ ভাব আমার যেন কখন না হয়!' তাই ঠাকুরের জীবনে অদ্ভুত নিরভিমানতা দেখিলেও আমাদের বিস্ময়ের উদয় হয় না, কিন্তু অপর সাধারণের যদি এতটুকু অভিমান কম দেখি তো 'কি আশ্চর্য্য' বলিয়া উঠি! কারণ ঠাকুর তো আর আমাদের এ সংসারের লোক ছিলেন না!

১ ঠাকুরের সাধনকালে নিজের শরীরের দিকে আদৌ দৃষ্টি না থাকায় মাথায় বড় বড় চুল হইয়াছিল ও ধুলি লাগিয়া উহা আপনাআপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল।

ঠাকুর কালীবাটীর বাগানে কোঁচার খুঁটটি গলায় দিয়া বেড়াইতেছেন, জনৈক বাবু তাঁহাকে সামান্য মালীজ্ঞানে বলিলেন, "ওহে, আমাকে ঐ ফুলগুলি তুলিয়া দাও তো। ঠাকুরও দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্রূপ করিয়া দিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। মথুর বাবুর পুত্র পরলোকগত ত্রৈলোক্য বাবু এক সময়ে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদুর (হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়) উপর বিরক্ত হইয়া হৃদয়কে অন্যত্র গমন করিতে হুকুম করেন। সে সময় নাকি ঠাকুরেরও আর কালীবাটীতে থাকিবার আবশ্যকতা নাই—রাগের মাথায় তিনি এইরূপ ভাব অপরের নিকট প্রকাশ করেন। ঠাকুরের কানে ঐ কথা উঠিবামাত্র তিনি হাসিতে হাসিতে গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন। প্রায় গেট পর্য্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময় ত্রৈলোক্য বাবু আবার অমঙ্গল-আশঙ্কায় ভীত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'আপনাকে ত আমি যাইতে বলি নাই, আপনি কেন যাইতেছেন' ইত্যাদি বলিয়া ঠাকুরকে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও যেন কিছুই হয় নাই, এরূপভাবে পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আপনার কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

ঠাকুরের অভিমান-রাহিত্যের দৃষ্টান্ত : কৈলাস ডাক্তার ও ত্রৈলোক্য বাবু সম্বন্ধীয় ঘটনা

এরূপ আরও কত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল ব্যবহারে আমরা যত আশ্চর্য্য না হই, সংসারের অপর কেহ যদি অতটাও না করিয়া এতটুকু ঐরূপ কাজ করে তো একেবারে ধন্য ধন্য করি! কেননা আমরা মুখে বলি আর নাই বলি, মনের ভিতরে ভিতরে

বিষয়ী লোকের বিপরীত ব্যবহার

একেবারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছি যে, সংসারে থাকিতে গেলেই 'নিজের কোলে ঝোল টানিতে হইবে', দুর্ব্বলকে সবল হস্তে সরাইয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আপনার কথা ষোল কাহন করিয়া ডঙ্কা বাজাইতে হইবে, নিজের দুর্ব্বলতাগুলি অপরের চক্ষুর অন্তরালে যত পারি লুকাইয়া রাখিতে হইবে, আর সরলভাবে ভগবানের বা মানুষের উপর ষোল আনা বিশ্বাস করিলে একেবারে 'কাজের বার' হইয়া 'বয়ে' যাইতে হইবে! হায় রে সংসার, তোমার আন্তর্জাতিক নীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মনীতি—সর্ব্বত্রই এইরূপ। তোমার 'দিল্লীকা লাড্ডু' যে খাইয়াছে সে তো পশ্চাত্তাপ করিতেছেই—যে না খাইয়াছে সেও তদ্রূপ করিতেছে।

ঠাকুরের প্রকট হইবার সময় ধর্ম্মান্দোলন ও উহার কারণ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ে ঠাকুরের বিশেষ প্রকট ভাব। তাঁহার অদ্ভুত আকর্ষণে তখন নিত্য কত নূতন নূতন লোক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছে। কলিকাতার ছোট বড় সকলে তখন 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের' নাম শুনিয়াছে এবং অনেকে তাঁহাকে দর্শনও করিয়াছে। আর কলিকাতার জনসাধারণের মন অধিকার করিয়া ভিতরে ভিতরে যেন একটা ধর্ম্মস্রোত নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে।[১] হেথায় হরিসভা, হোথায় ব্রাহ্মসমাজ, হেথায় নামসংকীর্ত্তন, হোথায় ধর্ম্মব্যাখ্যা ইত্যাদিতে তখন কলিকাতা নগরী পূর্ণ। অপর সকলে ঐ বিষয়ের কারণ না বুঝিলেও ঠাকুর বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ ভক্তের নিকটই ঐ কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন, আমাদের তো কথাই নাই। জনৈক

স্ত্রী-ভক্ত বলেন, ঠাকুর একদিন তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ওগো, এই যে সব দেখছ এত হরিসভা টরিসভা, এ সব জানবে (নিজ শরীর দেখাইয়া) এইটের জন্যে। এ সব কি ছিল ? কেমন এক রকম সব হয়ে গিয়েছিল! (পুনরায় নিজ শরীর দেখাইয়া) এইটে আসার পর থেকে এসব এত হয়েছে, ভিতরে ভিতরে একটা ধর্ম্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে!" আবার এক সময়ে ঠাকুর আমাদের বলিয়াছিলেন, "এই যে দেখছ সব ইয়াং বেঙ্গল (Young Bengal) এরা কি ভক্তি-টক্তির ধার ধারতো ? মাথা নুইয়ে পেরণামটা (প্রণাম) করতেও জানতো না! মাথা নুইয়ে আগে পেরণাম করতে করতে তবে এরা ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে। কেশবের বাড়ীতে দেখা করতে গেলুম, দেখি চেয়ারে বসে লিখছে। মাথা নুইয়ে পেরণাম করলুম, তাতে অমনি ঘাড় নেড়ে একটু সায় দিলে। তারপর আসবার সময় একেবারে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পেরণাম করলুম। তাতে হাত জোড় করে একবার মাথায় ঠেকালে। তারপর যত যাওয়া আসা হতে লাগলো ও কথাবার্ত্তা শুনতে লাগলো আর মাথা হেঁট করে পেরণাম করতে লাগলাম, তত ক্রমে ক্রমে তার মাথা নীচু হয়ে আসতে লাগলো। নইলে আগে আগে ওরা কি এসব ভক্তি-টক্তি করা জানতো, না মানতো!"

নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়া যখন খুব জমজমাট চলিয়াছে, সেই সময়েই পণ্ডিত শশধরের হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে কলিকাতা-আগমন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিক দিয়া হিন্দুদিগের নিত্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানগুলি বুঝাইবার চেষ্টা। 'নানা মুনির নানা মত' কথাটি সর্ব্ববিষয়ে সকল সময়েই সত্য; পণ্ডিতজীর

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মব্যাখ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রোতার হুড়াহুড়ির অভাব ছিল না। আফিসের ফের্‌তা বাবু-ভায়া ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের ভিড় লাগিয়া যাইত। আল্‌বার্ট হলে নানাভাবে ঠেশাঠেশি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সকলেই স্থির, উদ্‌গ্রীব—কোনরূপে পণ্ডিত-জীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মব্যাখ্যা যদি কতকটাও শুনিতে পায়! আমাদের মনে আছে, আমরাও একদিন কিছুকাল ঐভাবে দাঁড়াইয়া দুই-পাঁচটা কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম এবং ভিড়ের ভিতর মাথা গুঁজিয়া কোনরূপে প্রৌঢ়বয়স্ক পণ্ডিতজীর কৃষ্ণশ্মশ্রুরাজি-শোভিত সুন্দর মুখখানি এবং গৈরিকরুদ্রাক্ষ-শোভিত বক্ষঃস্থলের কিয়দংশের দর্শন পাইয়াছিলাম। কলিকাতার অনেক স্থলেই তখন ঐ এক আলোচনা—শশধর পণ্ডিতের ধর্ম্মব্যাখ্যা।

পণ্ডিত শশধরের ঐ সময়ে কলিকাতায় আগমন ও ধর্ম্মব্যাখ্যা

বলে 'কথা কানে হাঁটে', কাজেই দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের কথা পণ্ডিতজীর নিকটে এবং পণ্ডিতজীর গুণপনা ঠাকুরের নিকট পৌঁছিতে বড় বিলম্ব হইল না। ভক্তদিগেরই কেহ কেহ আসিয়া ঠাকুরের নিকট গল্প করিতে লাগিলেন, "খুব পণ্ডিত, বলেনও বেশ। বত্রিশাক্ষরী হরিনামের সেদিন দেবীপক্ষে অর্থ করিলেন, শুনিয়া সকলে 'বাহবা বাহবা' করিতে লাগিল" ইত্যাদি। ঠাকুরও ঐকথা শুনিয়া বলিলেন, "বটে? ঐটি বাবু একবার শুনতে ইচ্ছা করে।" এই বলিয়া ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিবার ইচ্ছা ভক্তদিগের নিকট প্রকাশ করেন।

ঠাকুরের শশধরকে দেখিবার ইচ্ছা

দেখা যাইত, ঠাকুরের শুদ্ধ মনে যখন যে বাসনার উদয় হইত, তাহা কোন না কোন উপায়ে পূর্ণ হইতই হইত। কে যেন ঐ বিষয়ের যত প্রতিবন্ধকগুলি ভিতরে ভিতরে সরাইয়া দিয়া উহার সফল হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত! পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে, কায়মনোবাক্যে সত্যপালন ও শুদ্ধ পবিত্র ভাব মনে নিরন্তর রাখিতে রাখিতে মানুষের এমন অবস্থা হয় যে, তখন সে আর কোন অবস্থায় কোন প্রকার মিথ্যাভাব চেষ্টা করিয়াও মনে আনিতে পারে না—যাহা কিছু সঙ্কল্প তাহার মনে উঠে সে সকলই সত্য হয়। কিন্তু সেটা মানুষের শরীরে যে এতদূর হইতে পারে, তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ঠাকুরের মনের সঙ্কল্পসকল অতর্কিতভাবে সিদ্ধ হইতে পুনঃপুনঃ দেখিয়াই ঐ কথাটায় আমাদের ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মে। তাই কি ঐ বিষয়ে পুরাপুরি বিশ্বাস আমাদের ঠাকুরের শরীর বিদ্যমানে জন্মিয়াছিল? তিনি বলিয়াছিলেন, "কেশব, বিজয়ের ভিতর দেখলাম এক একটি বাতির শিখার মত (জ্ঞানের) শিখা জ্বল্‌ছে, আর নরেন্দরের ভিতর দেখি জ্ঞান-সূর্য্য রয়েছে। কেশব একটা শক্তিতে জগৎ মাতিয়েছে, নরেনের ভিতর অমন আঠারটা শক্তি রয়েছে।"—এসব তাঁর নিজের সঙ্কল্পের কথা নয়, ভাবাবেশে দেখাশুনার কথা; কিন্তু ইহাতেই কি তখন বিশ্বাস ঠিক ঠিক দাঁড়াইত? কখনও ভাবিতাম—হবেও বা, ঠাকুর লোকের ভিতর দেখিতে পান; তিনি যখন বলিতেছেন তখন ইহার ভিতর কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে; আবার কখন ভাবিতাম, জগদ্বিখ্যাত

ঠাকুরের শুদ্ধ মনে উদিত বাসনাসমূহ সর্ব্বদা সফল হইত

বাগ্মী ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন কোথা, আর শ্রীযুত নরেন্দ্রের মত একটা স্কুলের ছোঁড়া কোথা! ইহা কি কখন হইতে পারে? ঠাকুরের দেখাশুনার কথার উপরেই যখন ঐরূপ সন্দেহ আসিত, তখন 'এইটি ইচ্ছা হয়' বলিয়া ঠাকুর যখন তাঁহার মনোগত সঙ্কল্পের কথা বলিতেন তখন উহা ঘটিবার পক্ষে যে সন্দেহ আসিত না, ইহা কেমন করিয়া বলি।

* * *

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবযাত্রার সময় ঠাকুর যথায় যথায় গমন করেন

পণ্ডিত শশধরের সম্বন্ধে ঠাকুরের সহিত ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইবার কয়েকদিন পরেই রথযাত্রা উপস্থিত। নয় দিন ধরিয়া রথোৎসব নির্দ্দিষ্ট থাকায় উহা 'নবযাত্রা' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবযাত্রার সময় ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। এই বৎসরেরই সোজা রথের দিন প্রাতে ঠাকুরের ঠন্‌ঠনিয়ায় শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ-রক্ষায় গমন এবং সেখান হইতে অপরাহ্ণে পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাওয়া, সন্ধ্যার পর ঠাকুরের বাগবাজারে শ্রীযুত বলরাম বাবুর বাটীতে রথোৎসবে যোগদান এবং সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া পরদিন প্রাতে কয়েকটি ভক্তসঙ্গে নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পুনরাগমন। ইহার কয়েক দিন পরেই আবার পণ্ডিত শশধর আলমবাজার বা উত্তর বরানগরের এক স্থলে ধর্ম্ম-সম্বন্ধিনী বক্তৃতা করিতে আসিয়া সেখান হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করেন। তৎপরে উল্টা রথের দিন প্রাতে ঠাকুরের পুনরায় বাগবাজারে

বলরাম বাবুর বাটীতে আগমন এবং সে দিন রাত ও তৎপর দিন রাত তথায় ভক্তগণের সঙ্গে সানন্দে অবস্থান করিয়া তৃতীয় দিবস প্রাতে 'গোপালের মা' প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন। উল্টা রথের দিনে পণ্ডিত শশধরও ঠাকুরকে দর্শন করিতে বলরাম বাবুর বাটীতে স্বয়ং আগমন করেন ও সজলনয়নে করযোড়ে ঠাকুরকে পুনরায় নিবেদন করেন, "দর্শন-চর্চ্চা করিয়া আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; আমায় একবিন্দু ভক্তিদান করুন।" ঠাকুরও তাহাতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতজীর হৃদয় ঐ দিন স্পর্শ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের কথাগুলি পাঠককে এখানে সবিস্তার বলিলে মন্দ হইবে না।

ঈশান বাবুর পরিচয়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রথের দিন প্রাতে ঠাকুর কলিকাতায় ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশান বাবুর বাটীতে আগমন করেন, সঙ্গে শ্রীযুত যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), হাজরা প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত। শ্রীযুত ঈশানের মত দয়ালু দানশীল ও ভগবদ্বিশ্বাসী ভক্তের দর্শন সংসারে দুর্লভ। তাঁহার আটটি পুত্র, সকলেই কৃতবিদ্য। তৃতীয় পুত্র সতীশ শ্রীযুত নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দ) সহপাঠী। শ্রীযুত সতীশের পাখোয়াজে অতি সুমিষ্ট হাত থাকায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের সুকণ্ঠের তান অনেক সময় ঐ বাটীতে শুনিতে পাওয়া যাইত। ঈশান বাবুর দয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে একদিন বলেন যে, উহা পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা কিছুতেই কম ছিল না। স্বামিজী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, ঈশান বাবু নিজের অন্নব্যঞ্জনাদি কতদিন (বাটীতে তখন কিছু আহার্য্য প্রস্তুত না থাকায়) অভুক্ত

ভিখারীকে সমস্ত অর্পণ করিয়া যাহা তাহা খাইয়া দিন কাটাইয়া দিলেন। আর অপরের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিয়া উহা দূর করা নিজের সাধ্যাতীত দেখিয়া কতদিন যে তিনি (স্বামিজী) অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে তাঁহাকে (ঈশান বাবুকে) দেখিয়াছেন, তাহাও বলিতেন। শ্রীযুত ঈশান যেমন দয়ালু, তেমনি জপপরায়ণও ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে নিয়মপূর্ব্বক উদয়াস্ত জপ করার কথাও আমরা অনেকে জানিতাম। জাপক ঈশান ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় ও অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। আমাদেব মনে আছে, জপ সমাধান করিয়া ঈশান যখন ঠাকুরের চরণে একদিন সন্ধ্যাকালে প্রণাম করিতে আসিলেন, তখন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ ঈশানের মস্তকে প্রদান করিলেন। পরে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া জোর করিয়া ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, "ওরে বামুন, ডুবে যা, ডুবে যা" (অর্থাৎ কেবল ভাসা ভাসা জপ না করিয়া শ্রীভগবানের নামে তন্ময় হইয়া যা)। ইদানীং প্রাতের পূজা ও জপেই শ্রীযুত ঈশানের প্রায় অপরাহ্ণ চারিটা হইয়া যাইত। পরে কিঞ্চিৎ লঘু আহার করিয়া অপরের সহিত কথাবার্ত্তা বা ভজন-শ্রবণাদিতে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া পুনরায় সান্ধ্য জপে উপবেশন করিয়া কত ঘণ্টা কাল কাটাইতেন। আর বিষয়কর্ম্ম দেখার ভার পুত্রেরাই লইয়াছিল। ঠাকুর ঈশানের বাটীতে মধ্যে মধ্যে শুভাগমন করিতেন এবং ঈশানও কলিকাতায় থাকিলে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন। নতুবা পবিত্র দেবস্থান ও তীর্থাদি-দর্শনে যাইয়া তপস্যায় কাল কাটাইতেন।

এ বৎসর (১৮৮৫ খৃঃ) রথের দিনে শ্রীযুত ঈশানের বাটীতে

আগমন করিয়া ঠাকুরের ভাটপাড়ার কতকগুলি ভট্টাচার্য্যের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে পণ্ডিতজীর কথা শুনিয়া এবং তাঁহার বাসা অতি নিকটে জানিতে পারিয়া ঠাকুর শশধরকে ঐ দিন দেখিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর কলিকাতাগমন-সংবাদ স্বামিজী প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। কারণ যাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণে তিনি ধর্ম্মবক্তৃতাদানে আগমন করেন তাঁহাদের সহিত স্বামিজীর পূর্ব্ব হইতেই আলাপ-পরিচয় ছিল এবং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ তাঁহাদের বাসভবনে স্বামিজীর গতায়াতও ছিল। আবার পণ্ডিতজীর আধ্যাত্মিক ধর্ম্মব্যাখ্যাগুলি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া ধারণা হওয়ায় তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁহাকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া দিবার প্রয়াসেও স্বামিজীর ঐ বাটীতে গমনাগমন এই সময়ে কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, এইরূপে স্বামিজীই পণ্ডিতজীর সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুরকে উহা বলেন এবং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিতদর্শনে লইয়া যান। পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুর সেদিন পণ্ডিতজীকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে 'চাপরাস' বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং কখন কখন প্রচারকের অভিমান-অহঙ্কার বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজীকে এই প্রথম দর্শনকালেই বলিয়াছিলেন। এই সকল জ্বলন্ত শক্তিপূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই যে পণ্ডিতজী কিছুকাল পরে প্রচারকার্য্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যাপীঠে তপস্যায় গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।

পণ্ডিতজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সেদিন শ্রীযুত যোগেনের সহিত সন্ধ্যাকালে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। যোগেন তখন আহারাদিতে বিশেষ 'আচারী', কাহারও বাটীতে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন না। কাজেই নিজ বাটীতে সামান্য জলযোগমাত্র করিয়াই ঠাকুরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে কোথাও খাইতে অনুরোধ করেন নাই; কারণ যোগেনের নিষ্ঠাচারিতার বিষয় ঠাকুরের অজ্ঞাত ছিল না। কেবল বলরাম বাবুর শ্রদ্ধাভক্তি ও ঠাকুরের উপরে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার বাটীতে ফলমূল-দুগ্ধ-মিষ্টান্নাদিগ্রহণ শ্রীযুত যোগেন পূর্ব্বাবধি করিতেন—একথাও ঠাকুর জানিতেন। সেজন্য পৌঁছিবার কিছু পরেই ঠাকুর বলরাম প্রভৃতিকে বলিলেন, "ওগো, এর (যোগেনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয় নি, একে কিছু খেতে দাও।" বলরাম বাবুও যোগেনকে সাদরে অন্দরে লইয়া যাইয়া জলযোগ করাইলেন। ভাবসমাধিতে আত্মহারা ঠাকুরের ভক্তদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেক বিষয়ে কতদূর লক্ষ্য থাকিত, তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত বলিয়া আমরা এ কথার এখানে উল্লেখ করিলাম।

যোগানন্দ স্বামীর আচার-নিষ্ঠা

বলরাম বাবুর বাটীতে রথে ঠাকুরকে লইয়া আনন্দের তুফান ছুটিত। অদ্য সন্ধ্যার পরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া অন্দরের ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আনা হইল এবং বস্ত্রপতাকাদি দ্বারা ইতিপূর্ব্বেই সজ্জিত ছোট রথখানিতে বসাইয়া আবার পূজা করা হইল। বলরাম বাবুর পুরোহিতবংশজ ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুত ফকীরই ঐ পূজা করিলেন।

শ্রীযুত ফকীর বলরাম বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও আশ্রয়দাতার একমাত্র শিশুপুত্র রামকৃষ্ণের পাঠাভ্যাসাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। ইনি বিশেষ নিষ্ঠাপরায়ণ ও ভক্তিমান ছিলেন এবং ঠাকুরের প্রথম দর্শনাবধি তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুর কখন কখন ইঁহার মুখ হইতে স্তোত্রাদি শুনিতে ভালবাসিতেন এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত কালীস্তোত্র কিরূপে ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথাগুলি সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিয়া আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা একদিন ইহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐদিন সন্ধ্যার সময় ফকীরকে নিজ কক্ষের উত্তর দিকের বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া স্পর্শও করেন এবং ধ্যান করিতে বলেন। ফকীরের উহাতে অদ্ভুত দর্শনাদি হইয়াছিল।

বলরাম বসুর বাটীতে রথোৎসব

এইবার সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে রথের টান আরম্ভ হইল। ঠাকুর স্বয়ং রথের রশ্মি ধরিয়া অল্পক্ষণ টানিলেন। পরে ভাবাবেশে তালে তালে সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে ভাবমত্ত হুঙ্কার ও নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তখন আত্মহারা—ভগবদ্ভক্তিতে উন্মাদ! বাহির বাটীর দোতলার চক্‌মিলান বারাণ্ডাটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকক্ষণ অবধি এইরূপ নৃত্য, কীর্ত্তন ও রথের টান হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং পরিশেষে তদ্‌ভক্তবৃন্দ, সকলের পৃথক্ পৃথক্ নামোল্লেখ করিয়া জয়কার দিয়া প্রণামান্তে কীর্ত্তন সাঙ্গ হইল। পরে রথ হইতে ৺জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে অবরোহণ করাইয়া ত্রিতলে (চিলের ছাদের ঘরে) সাতদিনের মত স্থানান্তরিত করিয়া

স্থাপন করা হইল। ইহার অর্থ—রথে চড়িয়া ৺জগন্নাথদেব যেন অন্যত্র আসিয়াছেন, সাতদিন পরে পুনঃ এখান হইতে রথে চড়িয়া আপনার পূর্ব্বস্থানে গমন করিবেন। ৺জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে পূর্ব্বোক্ত স্থানে রাখিয়া ভোগনিবেদন করিবার পর অগ্রে ঠাকুর ও পরে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার সহিত আগত যোগেন সে রাত্রি বলরাম বাবুর বাটীতেই রহিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা অনেকেই যে যাঁহার স্থানে চলিয়া গেলেন।

স্ত্রী-ভক্তদিগের ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ

পরদিন প্রাতে ৮টা বা ৯টার সময় নৌকা ডাকা হইল—ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। নৌকা আসিলে ঠাকুর অন্দরে যাইয়া ৺জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া এবং ভক্ত-পরিবারবর্গের প্রণাম স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বাহির বাটীর দিকে আসিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের পূর্ব্বদিকে রন্ধনশালার সম্মুখে ছাদের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া বিষণ্নমনে ফিরিয়া যাইলেন, কারণ এ অদ্ভুত জীবন্ত ঠাকুরকে ছাড়িতে কাহার প্রাণ চায়? উক্ত ছাদ হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তিন-চারিটি সিঁড়ি উঠিলেই একটি দ্বার এবং ঐ দরজাটি পার হইয়াই বাহিরের দ্বিতলের চক্‌মিলান বারাণ্ডা। সকল স্ত্রী-ভক্তেরা ঐ ছাদের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিলেও একজন যেন আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের চক্‌মিলান বারাণ্ডাবধি আসিলেন—যেন বাহিরে অপরিচিত পুরুষেরা সব আছে, সে বিষয়ে আদৌ হুঁশ নাই।

ঠাকুর স্ত্রী-ভক্তদিগের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণান্তে ভাবাবেশে এমন গোঁ-ভরে বরাবর চলিয়া আসিতেছিলেন যে, মেয়েরা যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতদূর আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের একজন যে এখনও ঐ ভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ হুঁশ ছিল না। ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ-ভরে চলা যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারিবেন; অপরকে উহা বুঝান কঠিন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী, কেবল দ্বাদশবর্ষই বা বলি কেন, আজন্ম একাগ্রতা-অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের মন-বুদ্ধি এমন একনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল যে, যখন যেখানে বা যে কার্য্যে রাখিতেন তাঁহার মন তখন ঠিক সেখানেই থাকিত—চারি পাশে উঁকিঝুঁকি একেবারেই মারিত না। আর শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি এমন বশীভূত হইয়া গিয়াছিল যে, মনে যখন যে ভাবটি বর্ত্তমান উহারাও তখন কেবলমাত্র সেই ভাবটিই প্রকাশ করিত! একটুও এদিক্ ওদিক্ করিতে পারিত না। এ কথাটি বুঝান বড় কঠিন। কারণ আপন আপন মনের দিকে চাহিলেই আমরা দেখিতে পাই নানাপ্রকার পরস্পর-বিপরীত ভাবনা যেন এককালে রাজত্ব করিতেছে এবং উহাদের ভিতর যেটি অভ্যাসবশতঃ অপেক্ষাকৃত প্রবল, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির নিষেধ না মানিয়া তাহারই বশে ছুটিয়াছে। ঠাকুরের মনের গঠন আর আমাদের মনের গঠন এতই বিভিন্ন!

ঠাকুরের অন্যমনে চলা ও জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের আত্মহারা হইয়া পশ্চাতে আসা

দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও অনেক কথা এখানে বলা যাইতে পারে।

দক্ষিণেশ্বরে আপনার ঘর হইতে ঠাকুর মা কালীকে দর্শন করিতে চলিলেন। ঘরের পূর্ব্বের দালানে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া ঠাকুর বাটীর উঠানে নামিয়া একেবারে সিধা মা কালীর মন্দিরের দিকে চলিলেন। ঠাকুরের থাকিবার ঘর হইতে মা কালীর মন্দিরে যাইতে অগ্রে শ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দির পড়ে; যাইবার সময় ঠাকুর উক্ত মন্দিরে উঠিয়া শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মা কালীর মন্দিরে যাইতে পারেন। কিন্তু তাহা কখনও করিতে পারিতেন না! একেবারে সরাসর মা কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রণামাদি করিয়া পরে ফিরিয়া আসিবার কালে ঐ মন্দিরে উঠিতেন। আমরা তখন তখন ভাবিতাম, ঠাকুর মা কালীকে অধিক ভালবাসেন বলিয়াই বুঝি ঐরূপ করেন। পরে একদিন ঠাকুর নিজেই বলিলেন, "আচ্ছা, এ কি বল্ দেখি? মা কালীকে দেখতে যাব মনে করেছি তো একেবারে সিধে মা কালীর মন্দিরে যেতে হবে। এদিক ওদিক ঘুরে বা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে উঠে যে প্রণাম করে যাব, তা হবে না। কে যেন পা টেনে সিধে মা কালীর মন্দিরে নিয়ে যায়—একটু এদিক ওদিক বেঁকতে দেয় না। মা কালীকে দেখার পর, যেথা ইচ্ছা যেতে পারি—এ কেন বল্ দেখি?" আমরা মুখে বলিতাম, 'কি জানি মশাই'; আবার মনে মনে ভাবিতাম, 'এও কি হয়? ইচ্ছা করিলেই আগে রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করিয়া যাইতে পারেন। মা কালীকে দেখবার ইচ্ছাটা বেশী হয় বলিয়াই বোধ হয় অনুরূপ ইচ্ছা হয় না' ইত্যাদি; কিন্তু এ সব কথা সহসা ভাঙ্গিয়া বলিতেও

ঠাকুরের ঐরূপ অন্যমনে চলিবার আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত; ঐরূপ হইবার কারণ

পারিতাম না। ঠাকুরই আবার কখন কখন ঐ বিষয়ের উত্তরে বলিতেন, "কি জানিস? যখন যেটা মনে হয় করবো, সেটা তখনই করতে হবে—এতটুকু দেরী সয় না।" কে জানে তখন একনিষ্ঠ মনের এই প্রকার গতি ও চেষ্টাদি এবং ঠাকুরের মনটার অন্তঃস্তর অবধি সমস্তটা বহুকাল ধরিয়া একনিষ্ঠ হইয়া একেবারে একভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে—উহাতে অন্য ভাবকে আশ্রয় করিয়া বিপরীত তরঙ্গরাজি আর উঠেই না। আবার কখন কখন বলিতেন, "দেখ, নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উঠলে তখন তো আর আমি-তুমি, দেখা-শুনা, বলা-কহা কিছুই থাকে না; সেখান থেকে দুই-তিন ধাপ নেমে এসেও এতটা ঝোঁক থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিস নিয়ে ব্যবহার চলে না। তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারী সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সে সকলের দিকে যায় না, এক জায়গা থেকেই মুখে উঠবে। এমন সব অবস্থা হয়। তখন ভাত ডাল তরকারী পায়েস সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়!" আমরা এই সমরস অবস্থার দুই-তিন ধাপ নীচের কথা শুনিয়াই অবাক হইয়া থাকিতাম। "আবার এমন একটা অবস্থা হয়, তখন কাউকে ছুঁতে পারি না। (ভক্তদের সকলকে দেখাইয়া) এদের কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠি।"—আমাদের ভিতর কেইবা তখন এ কথার মর্ম্ম বুঝে যে, শুদ্ধসত্ত্ব গুণটা তখন ঠাকুরের মনে এতটা বেশী হয় যে এতটুকু অশুদ্ধতার স্পর্শ সহ্য করিতে পারেন না! পুনরায় বলিতেন, "ভাবে আবার একটা অবস্থা হয়, তখন খালি (শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজকে দেখাইয়া) ওকে ছুঁতে পারি; ও

যদি তখন ধরে[১] ত কষ্ট হয় না। ও খাইয়ে দিলে তবে খেতে পারি।" যাক্ এখন সে সব কথা। পূর্ব্বকথার অনুসরণ করি।

ঠাকুর গোঁ-ভরে চলিতে চলিতে বাহিরের রারাণ্ডায় (যেখানে পূর্ব্বরাত্রে রথটানা হইয়াছিল) আসিয়া হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন সেই স্ত্রী-ভক্তটি ঐরূপে তাঁহার পেছনে পেছনে আসিতেছেন। দেখিয়াই দাঁড়াইলেন এবং 'মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী' বলিয়া বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভক্তটিও ঠাকুরের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'চ না গো মা, চ না!' কথাগুলি এমনভাবে বলিলেন এবং ভক্তটিও এমন এক আকর্ষণ অনুভব করিলেন যে আর দিক্‌বিদিক্ না দেখিয়া (ইঁহার বয়স তখন ত্রিশ বৎসর হইবে এবং গাড়ী-পাল্কীতে ভিন্ন এক স্থান হইতে অপর স্থানে কখনও ইহার পূর্ব্বে যাতায়াত করেন নাই) ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিলেন!

স্ত্রী-ভক্তটিকে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আহ্বান

---

১ ভাবাবেশ হইলে ঠাকুরের শরীর-জ্ঞান না থাকায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি (হাত, মুখ, গ্রীবা ইত্যাদি) বাঁকিয়া যাইত এবং কখনও বা সমস্ত শরীরটা হেলিয়া পড়িয়া যাইবার মত হইত। তখন নিকটস্থ ভক্তেরা ঐ সকল অঙ্গাদি ধরিয়া ধীরে ধীরে যথাযথভাবে সংস্থিত করিয়া দিতেন এবং পাছে ঠাকুর পড়িয়া গিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হন, এজন্য তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতেন। আর যে দেবদেবীর ভাবে ঠাকুরের ঐ অবস্থা, সেই দেবদেবীর নাম তখন তাঁহার কর্ণকুহরে শুনাইতে থাকিতেন, যথা—কালী কালী, রাম রাম, ওঁ ওঁ বা ওঁ তৎ সৎ ইত্যাদি। ঐরূপ শুনাইতে শুনাইতে তবে ধীরে ধীরে ঠাকুরের আবার বাহ্য চৈতন্য আসিত। যে ভাবে ঠাকুর যখন আবিষ্ট ও আত্মহারা হইতেন, সেই নাম ভিন্ন অপর নাম শুনাইলে তাঁহার বিষম যন্ত্রণাবোধ হইত।

কেবল একবার মাত্র ছুটিয়া বাটীর ভিতর যাইয়া বলরাম বাবুর গৃহিণীকে বলিয়া আসিলেন, "আমি ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চললুম।" পূর্ব্বোক্ত ভক্তটি এইরূপে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন শুনিয়া আর একটি স্ত্রী-ভক্তও সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এদিকে ঠাকুর ভাবাবেশে স্ত্রী-ভক্তটিকে ঐরূপে আসিতে বলিয়া আর পশ্চাতে না চাহিয়া শ্রীযুত যোগেন, ছোট নরেন প্রভৃতি বালক ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া সরাসর নৌকায় যাইয়া বসিলেন। স্ত্রী-ভক্ত দুইটিও ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিয়া বাহিরের পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িলেন। নৌকা ছাড়িল।

যাইতে যাইতে স্ত্রী-ভক্তটি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "ইচ্ছা হয় খুব তাঁকে ডাকি, তাঁতে ষোল-আনা মন দি কিন্তু মন কিছুতেই বাগ মানে না—কি করি?"

নৌকায় যাইতে যাইতে স্ত্রী-ভক্তের প্রশ্নে ঠাকুরের উত্তর—'ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাকবে'

ঠাকুর—তাঁর উপর ভার দিয়ে থাক না গো! ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থাকতে হয়—সেটা কি জান? পাতাখানা পড়ে আছে; য্যাম্‌নে হাওয়াতে নিয়ে যাচ্চে ত্যাম্‌নে উড়ে যাচ্চে, সেই রকম; এই রকম করে তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাকতে হয়—চৈতন্য বায়ু য্যাম্‌নে মনকে ফেরাবে ত্যাম্‌নে ফিরবে, এই আর কি।

এইরূপ প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে নৌকা কালীবাটীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। নৌকা হইতে নামিয়াই ঠাকুর কালীঘরে[১]

১ মা কালীর মন্দিরকে ঠাকুর 'কালীঘর' ও রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরকে 'বিষ্ণুঘর' বলিতেন।

যাইলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা কালীবাটীর উত্তরে অবস্থিত নহবৎখানায়[১] শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে যাইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মা কালীকে প্রণাম করিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

এদিকে ঠাকুর বালক ভক্তগণ সঙ্গে মা কালীর মন্দিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে আসিয়া বসিলেন এবং মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

ভুবন ভুলাইলি মা ভুবনমোহিনি।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনি॥
শরীরে শারীরি যন্ত্রে, স্বষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিনগ্রাম-সঞ্চারিণি॥
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনি॥
বিশুদ্ধে হিন্দোল স্বরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে
তান মান লয় স্বরে ত্রিসপ্ত-স্বরভেদিনি॥
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনি॥

নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার সামনে বসিয়া ঠাকুর এইরূপে গাহিতেছেন, সঙ্গী ভক্তেরা কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে উহা শুনিয়া মোহিত হইয়া রহিয়াছেন! গাহিতে

১ এই নহবৎখানায় নিম্নের ঘরে শ্রীশ্রীমা শয়ন করিতেন এবং সকল প্রকার দ্রব্যাদি রাখিতেন। নিম্নের ঘরের সম্মুখের রকে রন্ধনাদি হইত। উপরের ঘরে দিনের বেলায় কখন কখন উঠিতেন এবং কলিকাতা হইতে আগতা স্ত্রী-ভক্তদিগের সংখ্যা অধিক হইলে শয়ন করিতে দিতেন।

গাহিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গান থামিয়া গেল, মুখের অদৃষ্টপূর্ব্ব হাসি যেন সেই স্থানে আনন্দ ছড়াইয়া দিল—ভক্তেরা নিস্পন্দ হইয়া এখন ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিই দেখিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের শরীর একটু হেলিয়াছে দেখিয়া পাছে পড়িয়া যান ভাবিয়া শ্রীযুত ছোট নরেন তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি স্পর্শ করিবামাত্র ঠাকুর যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ছোট নরেন, তাঁহার স্পর্শ ঠাকুরের এখন অভিমত নয় বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল মন্দিরাভ্যন্তর হইতে ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত কষ্টসূচক শব্দ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ধারণ করিলেন। কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া নাম শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের ধীরে ধীরে বাহ্য চৈতন্য হইল; কিন্তু তখনও যেন বিপরীত নেশার ঝোঁকে সহজভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না! পা বেজায় টলিতেছে!

দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ ও ক্ষত শরীরে দেবতাস্পর্শ-নিষেধ সম্বন্ধে ভক্তদের প্রমাণ পাওয়া

এই অবস্থায় কোন রকমে হামা দেওয়ার মত করিয়া ঠাকুর নাটমন্দিরের উত্তরের সিঁড়িগুলি দিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে নামিতে লাগিলেন ও ছোট শিশুর মত বলিতে লাগিলেন, "মা, পড়ে যাব না—পড়ে যাব না?" বাস্তবিকই তখন ঠাকুরকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন একটি ছোট তিন-চারি বৎসরের ছেলে, মার দিকে চাহিয়া ঐ কথাগুলি বলিতেছেন, আর মার নয়নে নয়ন রাখিয়া ভরসান্বিত হইয়াই সিঁড়িগুলি নামিতে

পারিতেছেন! অতি সামান্য বিষয়েও এমন অপরূপ নির্ভরের ভাব আর কি কোথাও দেখিতে পাইব?

প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুর এইবার নিজ কক্ষে আসিয়া পশ্চিমের দিকের গোল বারাণ্ডায় যাইয়া বসিলেন—তখনও ভাবাবিষ্ট। সে ভাব আর ছাড়ে না—কখনও একটু কমে, আবার বাড়িয়া বাহ্য চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হয়। এইরূপে কতক্ষণ থাকার পর ভাবাবস্থায় ঠাকুর সঙ্গী ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সাপ দেখেছ? সাপের জ্বালায় গেলুম!" আবার তখনি যেন ভক্তদের ভুলিয়া সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীকেই (তাঁহাকেই যে ঠাকুর বর্ত্তমান ভাবাবস্থায় দেখিতেছিলেন একথা আর বলিতে হইবে না) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তুমি এখন যাও বাবু; ঠাকৃরুণ, তুমি এখন সর; আমি তামাক খাব, মুখ ধোব, দাঁতন হয় নি"—ইত্যাদি। এইরূপে কখনও ভক্তদিগের সহিত এবং কখনও ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্ত্তির সহিত কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ক্রমে সাধারণ মানবের মত বাহ্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন।

ভাবাবেশে কুণ্ডলিনী-দর্শন ও ঠাকুরের কথা

সাধারণ মানবের ন্যায় যখন থাকিতেন তখন ঠাকুরের ভক্তদিগের নিমিত্তই চিন্তা। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন ঘরে কিছু তরিতরকারী আছে কি না। শ্রীশ্রীমা তদুত্তরে 'কিছুই নাই' বলিয়া পাঠাইলে ঠাকুরের আবার ভাবনা হইল, 'কে এখন বাজারে যায়; কারণ বাজার হইতে কিছু শাকশব্জী কিনিয়া না আনিলে কলিকাতা হইতে আগত স্ত্রী-পুরুষ ভক্তেরা

ভাবভঙ্গে আগত ভক্তেরা সব কি খাইবে বলিয়া ঠাকুরের চিন্তা ও স্ত্রী-ভক্তদের বাজার করিতে পাঠান

খাইবে কি দিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রী-ভক্ত দুইটিকে বলিলেন, "বাজার করতে যেতে পারবে?" তাঁহারাও বলিলেন, "পারবো" এবং বাজারে যাইয়া দুটো বড় বেগুন, কিছু আলু ও শাক কিনিয়া আনিলেন; শ্রীশ্রীমা ঐ সকল রন্ধন করিলেন। কালীবাটী হইতেও ঠাকুরের নিত্য বরাদ্দ এক থাল মা-কালীর প্রসাদ আসিল। পরে ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে ঠাকুরের ভাবাবস্থার সময় শ্রীযুত ছোট নরেন ধরিতে যাইলে ঠাকুরের ওরূপ কষ্ট কেন হইল, সে কথার অনুসন্ধানে কারণ জানিতে পারা গেল। ছোট নরেনের মস্তকের বাঁ দিক্‌কার রগে একটি ছোট আব্ হইয়াছিল ও ক্রমে সেটি বড় হইতেছিল। সেটা পরে যন্ত্রণাদায়ক হইবে বলিয়া ডাক্তারেরা ঔষধ দিয়া ঐ স্থানটিতে ঘা করিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে, শরীরে ক্ষত থাকিলে দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে নাই, কিন্তু কথাটার সত্যতা যে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এইরূপে প্রমাণিত হইবে, তাহা আর কে ভাবিয়াছিল! দেবভাবে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইলেও ঠাকুর যে কি অন্তর্নিহিত দৈবশক্তির বলে ঐরূপ করিয়া উঠিলেন, তাহা বুঝা সাধ্যায়ত্ত না হইলেও তাঁহার যে বাস্তবিকই কষ্ট হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহ। ছোট নরেনকে ঠাকুর কত শুদ্ধস্বভাব বলিতেন তাহা আমাদের জানা ছিল এবং সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর অপর সকলের ন্যায় তাঁহাকে শরীরে ঐরূপ ক্ষতস্থান থাকিলেও ছুঁইতেছেন, পদস্পর্শ করিতে দিতেছেন ও তাঁহার সহিত একত্র বসা-দাঁড়ান করিতেছেন। অতএব তিনিই

বা কেমন করিয়া জানিবেন, ভাবের সময় ঠাকুর ঐরূপে তাঁহার স্পর্শ সহ্য করিতে পারিবেন না? যাহা হউক, তদবধি তিনি যত দিন না উক্ত ক্ষতটি আরাম হইল, ততদিন আর ভাবাবস্থার সময় ঠাকুরকে স্পর্শ করিতেন না।

ঠাকুরের সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গে সমস্ত দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া ভক্তেরা যে যাহার বাটীর দিকে চলিলেন। স্ত্রীলোক দুইটিও ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পদব্রজে কলিকাতায় আসিলেন।

* * *

বালকস্বভাব ঠাকুরের বালকের ন্যায় ভয়

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির পরে দুই-তিন দিন গত হইয়াছে। আজ পণ্ডিত শশধর ঠাকুরকে দর্শন করিতে অপরাহ্ণে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিবেন। বালকস্বভাব ঠাকুরের অনেক সময় বালকের ন্যায় ভয়ও হইত। বিশেষ কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন শুনিলেই ভয় পাইতেন। ভাবিতেন, তিনি তো লেখাপড়া কিছুই জানেন না, তাহার উপর কখন কিরূপ ভাবাবেশ হয় তাহার তো কিছুই ঠিক-ঠিকানা নাই, আবার তাহার উপর ভাবের সময় নিজের শরীরেরই হুঁশ থাকে না তো পরিধেয় বস্ত্রাদির! এরূপ অবস্থায় আগন্তুক কি ভাবিবে ও বলিবে! আমাদের মনে হইত, আগন্তুক যাহাই কেন ভাবুক না, তাহাতে তাঁহার আসিয়া গেল কি! তিনি তো নিজেই বারবার কত লোককে শিক্ষা দিতেছেন, 'লোক না পোক (কীট); লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাক্‌তে নয়।' তবে কি ইনি নামযশের কাঙ্গালী?

কিন্তু যাচাইয়া দেখিতে যাইলেই দেখিতাম—বালক যেমন কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়, আবার একটু পরিচয় হইলে সেই ব্যক্তিরই কাঁধে পিঠে চড়িয়া চুল টানিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নানারূপ মিষ্ট অত্যাচার করে—ঠাকুরের এই ভাবটিও তদ্রূপ। নতুবা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির সহিত তিনি যেরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, নাম-যশের কিছুমাত্র ইচ্ছা ভিতরে থাকিলে তিনি তাঁহাদের সহিত কখনই ঐ ভাবে কথা কহিতে পারিতেন না।[১]

আবার কখন কখন দেখা গিয়াছে, ঠাকুর আগন্তুকের পাছে অকল্যাণ হয় ভাবিয়া ভয়ও পাইতেন! কারণ তাঁহার আচরণ ও ব্যবহার প্রভৃতি বুঝিতে পারুক বা নাই পারুক তাহাতে ঠাকুরের কিছু আসিয়া যাইত না সত্য; কিন্তু বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক যদি ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিত, তাহাতে তাহারই অকল্যাণ নিশ্চিত জানিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভয় পাইতেন। তাই শ্রীযুত গিরিশ অভিমান-আব্দারে কোন সময়ে ঠাকুরের সম্মুখে

১ মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন, "তা বাবু, আমি কিন্তু তোমায় রাজা বল্‌তে পার্‌ব না; মিথ্যা কথা বল্‌বো কিরূপে?" আবার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন নিজের কথা বলিতে বলিতে যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত আপনার তুলনা করেন, তখন ঠাকুর বিশেষ বিরক্তির সহিত তাঁহার ঐরূপ বুদ্ধির নিন্দা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত কৃষ্ণদাস পালও যখন জগতের উপকার করা ছাড়া আর কোন ধর্ম্মই নাই ইত্যাদি বলিয়া ঠাকুরের সহিত তর্ক উত্থাপন করেন, তখন ঠাকুর বিশেষ বিরক্তির সহিত তাঁহার বুদ্ধির দোষ দর্শাইয়া দেন

তাঁহার প্রতি নানা কটূক্তি প্রয়োগ করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ওরে, ও আমাকে যা বলে বলুকগে, আমার মাকে কিছু বলেনি তো ?" যাক এখন সে কথা।

শশধর পণ্ডিতের দ্বিতীয় দিবস ঠাকুরকে দর্শন

পণ্ডিত শশধর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন শুনিয়া ঠাকুরের আর ভয়ের সীমা-পরিসীমা নাই। শ্রীযুত যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), শ্রীযুত ছোট নরেন ও আর আর অনেককে বলিলেন, "ওরে, তোরা তখন (পণ্ডিতজী যখন আসিবেন) থাকিস!" ভাবটা এই যে তিনি মূর্খ মানুষ, পণ্ডিতের সহিত কথা কহিতে কি বলিতে কি বলিবেন, তাই আমরা সব উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিতজীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিব ও ঠাকুরকে সামলাইব। আহা, সে ছেলেমানুষের মত ভয়ের কথা অপরকে বুঝানও দুষ্কর। কিন্তু পণ্ডিত শশধর যখন বাস্তবিক উপস্থিত হইলেন, তখন ঠাকুর যেন আর একজন! হাস্যপ্রস্ফুরিতাধরে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যদশার মত অবস্থা হইল এবং পণ্ডিত শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি পণ্ডিত, তুমি কিছু বল।"

শশধর—মহাশয়, দর্শন-শাস্ত্র পড়িয়া আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ; তাই আপনার নিকটে আসিয়াছি ভক্তিরস পাইব বলিয়া ; অতএব আমি শুনি, আপনি কিছু বলুন।

ঠাকুর—আমি আর কি বলবো, বাবু! সচ্চিদানন্দ যে কি (পদার্থ) তা কেউ বল্‌তে পারে না! তাই তিনি প্রথম হলেন অর্দ্ধনারীশ্বর। কেন ?—না, দেখাবেন বলে যে পুরুষ প্রকৃতি

দুই-ই আমি। তার পর তা থেকে আরও এক থাক্ নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।

ঐরূপে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক নিগূঢ় কথাসকল বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া পণ্ডিত শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর— সচ্চিদানন্দে যতদিন মন না লীন হয় ততদিন তাঁকে ডাকা ও সংসারের কাজ করা দুই-ই থাকে। তারপর তাঁতে মন লীন হলে আর কোনও কাজ করবার প্রয়োজন থাকে না। যেমন ধর কীর্ত্তনে গাইছে—'নিতাই আমার মাতা (মত্ত) হাতী।' যখন প্রথম গান ধরেছে তখন গানের কথা, সুর, তাল, মান, লয়—সকল দিকে মন রেখে ঠিক করে গাইছে। তারপর যেই গানের ভাবে মন একটু লীন হয়েছে তখন কেবল বলছে—'মাতা হাতী, মাতা হাতী।' পরে যেই আরও মন ভাবে লীন হলো অমনি খালি বলচে—'হাতী, হাতী।' আর যেই মন আরও ভাবে লীন হলো অমনি 'হাতী' বলতে গিয়ে 'হা—' (বলেই হাঁ করে রইল)!

ঠাকুর ঐরূপে 'হা—' পর্য্যন্ত বলিয়াই ভাবাবেশে একেবারে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া গেলেন এবং ঐ প্রকার অবস্থায় প্রায় পনর মিনিট কাল প্রসন্নোজ্জ্বলবদনে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবসানে আবার শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ঠাকুর—ওগো পণ্ডিত, তোমায় দেখলুম।[১] তুমি বেশ লোক।

১ অর্থাৎ সমাধিসহায়ে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তোমার অন্তরে কিরূপ পূর্ব্ব-সংস্কারসকল আছে তাহা দেখিলাম।

গিন্নী যেমন রেঁধেবেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা ধুতে, কাপড় কাচতে যায়, আর হেঁশেল-ঘরে ফেরে না—তুমিও তেমনি সকলকে তাঁহার কথা বোলে কোয়ে যে যাবে, আর ফিরবে না!

পণ্ডিত শশধর ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া, 'সে আপনাদের অনুগ্রহ' বলিয়া ঠাকুরের পদধূলি বারংবার গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিত ও আর্দ্রহৃদয়ে ভগবদ্বস্তু জীবনে লাভ হইল না ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

আমাদের একজন পরম বন্ধু, পণ্ডিত শশধরের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পরদিন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে ঠাকুর যে ভাবে ঐ বিষয় তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, তাহাই আমরা এখন এখানে বলিব।

ঠাকুর— ওগো, দেখছই তো এখানে ও সব (লেখাপড়া) কিছু নেই, মুখ্যু-শুখ্যু মানুষ, পণ্ডিত দেখা করতে আসবে শুনে বড় ভয় হলো। এই তো দেখছ, পরনের কাপড়েরই হুঁশ থাকে না, কি বলতে কি বলব ভেবে একেবারে জড়সড় হলুম! মাকে বললুম, 'দেখিস মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর (শাস্ত্র) মাস্তর কিছুই জানি না, দেখিস।' তার পর একে বলি 'তুই তখন থাকিস', ওকে বলি 'তুই তখন আসিস—তোদের সব দেখলে তবু ভরসা হবে।' পণ্ডিত যখন এসে বসলো তখনও ভয় রয়েছে—চুপ করে বসে তার দিকেই দেখছি,

ঠাকুর ঐ দিনের কথা অনৈক ভক্তকে নিজে যেমন বলিয়াছিলেন

তার কথাই শুনছি, এমন সময় দেখছি কি—যেন তার (পণ্ডিতের) ভেতরটা মা দেখিয়ে দিচ্ছে—শাস্তর (শাস্ত্র) মাস্তর পড়লে কি হবে, বিবেক বৈরাগ্য না হলে ওসব কিছুই নয়! তার পরেই সড় সড় করে (নিজ শরীর দেখাইয়া) একটা মাথার দিকে উঠে গেল, আর ভয় ডর সব কোথা চলে গেল! একেবারে বিভভুল হয়ে গেলুম! মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে যেন একটা কথার ফোয়ারা বেরুতে লাগল—এমনটা বোধ হতে লাগল! যত বেরুচ্চে, তত ভেতর থেকে যেন কে ঠেলে ঠেলে যোগান দিচ্চে! ওদেশে (কামারপুকুরে) ধানমাপবার সময় যেমন একজন 'রামে রাম, দুইয়ে দুই' করে মাপে আর একজন তার পেছনে বসে রাশ (ধানের রাশি) ঠেলে দেয়, সেইরূপ। কিন্তু কি যে সব বলেছি, তা কিছুই জানি না! যখন একটু হুঁশ হল তখন দেখছি কি যে, সে (পণ্ডিত) কাঁদছে, একেবারে ভিজে গেছে! ঐ রকম একটা আবস্থা (অবস্থা) মাঝে মাঝে হয়। কেশব যেদিন খবর পাঠালে জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে, একজন সাহেবকে (ভারতভ্রমণে আগত পাদ্রি কুক্) সঙ্গে করে নিয়ে আসচে, সেদিনও ভয়ে কেবলই ঝাউতলার দিকে (শৌচে) যাচ্চি! তারপর যখন তারা এলো আর জাহাজে উঠলুম, তখন এই রকমটা হয়ে গিয়েছিল! আর কত কি বলেছিলুম! পরে এরা (আমাদের দেখাইয়া) সব বললে, 'খুব উপদেশ দিয়েছিলেন।' আমি কিন্তু বাবু কিছুই জানি নি।

অদ্ভুত ঠাকুরের এই প্রকার অদ্ভুত অবস্থার কথা কেমন করিয়া বুঝিব? আমরা অবাক হইয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম মাত্র। কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি যে তাঁহার শরীর মনটাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল

অপূর্ব্ব লীলার বিস্তার করিত, অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণে যাহাকে ইচ্ছা টানিয়া আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিত ও ধর্ম্ম-রাজ্যের উচ্চতর স্তরসমূহে আরোহণে সামর্থ্য প্রদান করিত, তাহা দেখিয়াও বুঝা যাইত না। তবে ফল দেখিয়া বুঝা যাইত, সত্যই ঐরূপ হইতেছে, এই পর্য্যন্ত। কতবারই না আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াছি, অতি দ্বেষী ব্যক্তি দ্বেষ করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট আসিয়াছে এবং ঠাকুরও ঐ শক্তিপ্রভাবে আত্মহারা হইয়া ভাবাবেশে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন, আর সেইক্ষণ হইতে তাহার ভিতরের স্বভাব আমূল পরিবর্ত্তিত হইযা সে নবজীবন-লাভে ধন্য হইয়াছে। বেশ্যা মেরীকে স্পর্শমাত্রে ঈশা নূতন জীবন দান করিলেন, ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্য কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিলেন ও তাহার ভিতরের সংশয়, অবিশ্বাস প্রভৃতি পাষণ্ড ভাবসকল দলিত হইয়া সে ভক্তি লাভ করিল। ভগবদবতারদিগের জীবনপাঠে ঐ সকল ঘটনার বর্ণনা দেখিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভাবিতাম, শিষ্য-প্রশিষ্যগণের গোঁড়ামি ও দলপুষ্টি করিবার হীন ইচ্ছা হইতেই ঐরূপ মিথ্যা কল্পনাসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ্যের যথাযথ সত্যলাভের পথে বিষম অন্তরায়স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মনে আছে, হরিনামে শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত, নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে এ কথাটি সত্য বলিয়া স্বীকৃত দেখিয়া আমরা তখন ভাবিয়াছিলাম, গ্রন্থকারের মস্তিষ্কের কিছু গোল হইয়াছে! কি কূপমণ্ডূকই না আমরা তখন ছিলাম এবং

ঠাকুরের অলৌকিক ব্যবহার দেখিয়া অন্যান্য অবতারের সম্বন্ধে প্রচলিত ঐরূপ কথাসকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়

ঠাকুরের দর্শন না পাইলে কি দুর্দ্দশাই না আমাদের হইত! ঠাকুরের দর্শন পাইয়া এখন 'ছাইতে না জানি গোর চিনি' অন্ততঃ এ অবস্থাটাও হইয়াছে। এখন নিজের পাজি মন যে নানা সন্দেহ তুলিয়া বা অপরে যে নানা কথা কহিয়া একটা যাহা-তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়া যাইবে সেটার হাত হইতে অন্ততঃ নিষ্কৃতি পাইয়াছি; আর ভক্তিবিশ্বাসাদি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় যে হাতে হাতে অপরকে সাক্ষাৎ দেওয়া যায়, একথাটিও এখন জানিতে পারিয়া অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুরের কৃপাকণালাভে অমৃতত্ব পাইব ধ্রুব বুঝিয়া আশাপথ চাহিয়া পড়িয়া আছি।



গোপালের

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ—গোপালের মার[১] পূর্ব্বকথা

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজম্ ।
* * *
বল্লবীবদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতম্ ॥ —শ্রীগোপালস্তোত্র

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ —গীতা, ৭।২১

"And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me." —*Mathew XVIII—5*

গোপালের মা ঠাকুরকে প্রথম কবে দেখিতে আসেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—তবে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের চৈত্র বা বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যখন আমরা তাঁহাকে প্রথম

---

১ দিব্য-ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরকে বিশিষ্ট সাধক-ভক্তগণের সহিত কিরূপ লীলা করিতে দেখিয়াছি তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত গোপালের মার অদ্ভুত দর্শনাদির কথা পাঠককে এখানে উপহার দিতেছি। যাঁহারা মনে করিবেন আমরা উহা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা উহাতে মুন্সিয়ানা কিছুমাত্র ফলাই নাই—এমন কি ভাবাতে পর্য্যন্ত নহে। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদিগের নিকট হইতে যেমন সংগ্রহ

দেখি, তখন তিনি প্রায় ছয় মাস ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেছেন ও তাঁহার সহিত শ্রীভগবানের বালগোপাল-ভাবে অপূর্ব্ব লীলাও চলিতেছে। আমাদের বেশ মনে আছে—সেদিন গোপালের মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের উত্তরপশ্চিম কোণে যে গঙ্গাজলের জালা ছিল, তাহারই নিকটে দক্ষিণপূর্ব্বাস্য হইয়া অর্থাৎ ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন; বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইলেও বুঝিতে পারা কঠিন, কারণ বৃদ্ধার মুখে বালিকার আনন্দ! আমাদের পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি গি—র ছেলে? তুমি তো আমাদের গো। ওমা, গি - র ছেলে আবার ভক্ত হয়েছে! গোপাল এবার আর কাউকে বাকী রাখবে না; এক এক করে সব্বাইকে টেনে নেবে! তা বেশ, পূর্ব্বে তোমার সহিত মায়িক সম্বন্ধ ছিল, এখন আবার তার চেয়ে অধিক নিকট সম্বন্ধ হল" ইত্যাদি—সে আজ চব্বিশ বৎসরের কথা।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ; আকাশ যতদূর পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইতে হয়। এ বৎসর আবার কার্ত্তিকের গোড়া থেকেই শীতের একটু আমেজ দেয়—আমাদের মনে আছে। এই নাতিশীতোষ্ণ হেমন্তেই বোধ হয় গোপালের মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম

করিয়াছি প্রায় তেমনই ধরিয়া দিয়াছি। আবার উহা সংগ্রহও করিয়াছি এমন সব লোকের নিকট হইতে, যাঁহারা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ যথাযথ বলিবার প্রয়াস পান, না পারিলে অনুতপ্তা হন এবং 'কামারহাটির বামনীর' স্তাবক হওয়া দূরে যাউক, কখন কখন তদনুষ্ঠিত কোন কোন আচরণের তীব্র সমালোচনাও আমাদের নিকট করিয়াছেন।

দর্শনলাভ করেন। পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কামারহাটিতে গঙ্গাতীরে যে ঠাকুরবাটী ও বাগান আছে, সেখান হইতেই নৌকায় করিয়া তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। তাঁহারা বলিতেছি—কারণ গোপালের মা সে দিন একাকী আসেন নাই; উক্ত উদ্যানস্বামীর বিধবা পত্নী, কামিনী নাম্নী তাঁহার একটি দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার সহিত গোপালের মার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম তখন কলিকাতায় অনেকের নিকটেই পরিচিত। ইঁহারাও এই অলৌকিক ভক্তসাধুর কথা শুনিয়া অবধি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। কার্ত্তিক মাসে শ্রীবিগ্রহের নিয়ম-সেবা করিতে হয়, সেজন্য গোবিন্দ বাবুর পত্নী বা গিন্নী ঠাকুরাণী ঐ সময়ে কামারহাটির উদ্যানে প্রতি বৎসর বাস করিয়া স্বয়ং উক্ত সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। কামারহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বর আবার দুই বা তিন মাইল মাত্র হইবে—অতএব আসিবার বেশ সুবিধা। কামারহাটির গিন্নী এবং গোপালের মাও সেই সুযোগে রাণী রাসমণির কালীবাটীতে উপস্থিত হন।

গোপালের মার ঠাকুরকে প্রথম দর্শন

ঠাকুর সে দিন ইঁহাদের সাদরে স্বগৃহে বসাইয়া ভক্তিতত্ত্বের অনেক উপদেশ দেন ও ভজন গাহিয়া শুনান এবং পুনরায় আসিতে বলিয়া বিদায় দেন। আসিবার কালে গিন্নী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাহার কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুরও সুবিধামত একদিন যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বাস্তবিক ঠাকুর সে দিন গিন্নীর ও গোপালের মার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "আহা, চোখমুখের কি ভাব—

ভক্তি-প্রেমে যেন ভাস্‌চে—প্রেমময় চক্ষু! নাকের তিলকটি পর্য্যন্ত সুন্দর।" অর্থাৎ তাঁহাদের চাল-চলন, বেশ-ভূষা ইত্যাদিতে ভিতরের ভক্তিভাবই যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, অথচ লোকদেখান কিছুই নাই।

পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কলিকাতায় কোনও এক বিখ্যাত সওদাগরি আফিসে মুৎসুদ্দি ছিলেন। সেখানে কার্য্য-দক্ষতা ও উদ্যমশীলতায় অনেক সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু কিছুকাল পরে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। তাঁহার একমাত্র পুত্র উহার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। থাকিবার মধ্যে ছিল দুই কন্যা ভূত ও নারাণ[১] এবং তাহাদের সন্তানসন্ততি। এদিকে বিষয় নিতান্ত অল্প নহে—কাজেই শেষ জীবনে গোবিন্দ বাবুর ধর্ম্মালোচনা ও পুণ্যকর্ম্মেই কাল কাটিত। বাড়ীতে রামায়ণ-মহাভারতাদি-কথা দেওয়া, কামারহাটির বাগানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ সমারোহে স্থাপন করা, ভাগবতাদি শাস্ত্রের পারায়ণ, সস্ত্রীক তুলাদণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র প্রভৃতিকে দান ইত্যাদি অনেক সৎকার্য্য তিনি করিয়া যান। বিশেষতঃ আবার কামারহাটির বাগানে শ্রীবিগ্রহের পূজোপলক্ষে তখন বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই থাকিত এবং অতিথি-অভ্যাগত, দীন-দরিদ্র সকলকেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীউর প্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হইত।

[১] ব্রজেশ্বরী ও নারায়ণী

গোবিন্দ বাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার সতী সাধ্বী পত্নীও শ্রীবিগ্রহের ঐরূপ সমারোহে সেবা অনেক দিন পর্য্যন্ত চালাইয়া আসিতেছিলেন। পরে নানা কারণে বিষয়ের অধিকাংশ নষ্ট হইল। তজ্জন্য শ্রীবিগ্রহের সেবার যাহাতে ত্রুটি না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্যই গোবিন্দ বাবুর গৃহিণী এখন স্বয়ং এখানে থাকিয়া ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন। গিন্নী সেকেলে মেয়ে, জীবনে শোকতাপও ঢের পাইয়াছেন, কাজেই ধর্ম্মানুষ্ঠানেই শান্তি, একথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তবু পোড়া মায়া কি সহজে ছাড়ে—মেয়ে, জামাই, সমাজ, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদিও দেখিয়া চলিতে হইত। স্বামীর মৃত্যুর দিন হইতে নিজে কিন্তু কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। মাটিতে শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, এক সন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, নিয়ম, উপবাস, শ্রীবিগ্রহের সেবা, জপ, ধ্যান, দান ইত্যাদি লইয়াই থাকিতেন।

তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী

কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীর অতি নিকটেই গোবিন্দ বাবুর পুরোহিতবংশের বাস। পুরোহিত নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। 'গোপালের মাতা' ইঁহারই ভগ্নী—পূর্ব্ব নাম অঘোরমণি দেবী—বালিকাবয়সে বিধবা হওয়ায় পিত্রালয়েই চিরকাল বাস। গিন্নী বা গোবিন্দ বাবুর পত্নীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়া অবধি অঘোরমণির ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর-সেবাতেই কাল কাটিতে থাকে। ক্রমে অনুরাগের আধিক্যে গঙ্গাতীরে ঠাকুরবাড়ীতেই বাস করিবার ইচ্ছা প্রবল

তাঁহার পুরোহিতবংশ। বালবিধবা অঘোরমণি

হওয়ায় তিনি গিন্নীর অনুমতি লইয়া মেয়েমহলের একটি ঘরে আসিয়াই বসবাস করিলেন; পিত্রালয়ে দিনের মধ্যে দুই একবার যাইয়া দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন মাত্র।

গিন্নীর যেমন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপোনুষ্ঠানে অনুরাগ, অঘোরমণিরও তদ্রূপ; সেজন্য উভয়ের মধ্যে মানসিক চিন্তা ও ভাবের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। বাহিরে কিন্তু বিষয়ের অধিকারিণী গিন্নীকে সামাজিক মানসম্ভ্রমাদি দেখিয়া চলিতে হইত, অঘোরমণির কিছুই না থাকায় সে সব কিছুই দেখিতে হইত না। আবার নিজের পেটের একটাও না থাকায় জঞ্জালও কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে বোধ হয় অলঙ্কারাদি স্ত্রীধন-বিক্রয়ে প্রাপ্ত পাঁচ-সাত শত টাকা; তাহাও কোম্পানির কাগজ করিয়া গিন্নীর নিকট গচ্ছিত ছিল। উহার সুদ লইয়া এবং সময়ে সময়ে বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলে মূলধনে যতদূর সম্ভব অল্পস্বল্প হস্তক্ষেপ করিয়াই অঘোরমণির দিন কাটিত। অবশ্য গিন্নীও সকল বিষয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতার পরিবারবর্গকে সাহায্য করিতেন।

অঘোরমণি কড়ে রাঁড়ী—স্বামীর সুখ কোন দিনই জীবনে জানেন নাই। মেয়েরা বলে "ওরা সব যত্নী রাঁড়ী, নুনটুকু পর্য্যন্ত ধুয়ে খায়"—অঘোরমণিও বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাই। বেজায় আচার-বিচার! আমরা জানি, একদিন তিনি রন্ধন করিয়া বোক্‌নো হইতে ভাত তুলিয়া পরমহংসদেবের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন প্রকারে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সে ভাত আর খাওয়া হইল না এবং ভাতের

অঘোরমণির আচারনিষ্ঠা

কাঠিটিও গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন, ইহা সেই সময়ের কথা।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে দুই-তিনটি উন্নুন পাতা ছিল। শ্রীশ্রীকালীমাতার ভোগরাগ সাঙ্গ হইতে অনেক বিলম্ব হইত, কখন কখন আড়াই প্রহর বেলা হইয়া যাইত। পরমহংসদেবের শরীর অসুস্থ থাকিলে—আর তাঁহার তো পেটের অসুখাদি নিত্য লাগিয়াই থাকিত—পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী ঐ উন্নুনে সকাল সকাল দুটি ঝোলভাত তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতেন। যে সকল ভক্তেরা ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত ডাল রুটি ঐ উন্নুনে তৈয়ারী হইত। আবার কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিলা ঠাকুরের দর্শনে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীর সহিত ঐ নহবৎখানায় সমস্ত দিন থাকিতেন এবং কখন কখন সেখানে রাত্রিযাপনও করিতেন—তাঁহাদের আহারাদিও শ্রীশ্রীমা ঐ উন্নুনে প্রস্তুত করিতেন। অঘোরমণি—অথবা ঠাকুর যেমন তাঁহাকে প্রথম প্রথম নির্দ্দেশ করিতেন, 'কামারহাটির বামুনঠাকরুণ বা বামনী'—যে দিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন সেদিন ঠাকুরের ঝোল-ভাত রাঁধার পর শ্রীশ্রীমাকে গোবর, গঙ্গাজল প্রভৃতি দিয়া তিন বার উন্নুন পাড়িয়া দিতে হইত, তবে তাহাতে ব্রাহ্মণীর বোক্‌নো চাপিত! এতদূর বিচার ছিল।

'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' আবার ছেলেবেলা হইতে বড় অভিমানিনী। কাহারও কথা এতটুকু সহ্য করিতে পারিতেন না—অর্থসাহায্যের জন্য হাত পাতা ত দূরের কথা। তাহার

উপর আবার অন্যায় দেখিলেই লোকের মুখের উপর বলিয়া দিতে কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা ছিল না—কাজেই খুব অল্প লোকের সহিত তাঁহার বনিবনাও হইত। গিন্নী যে ঘরখানিতে তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে। ঘরের দক্ষিণের তিনটি জানালা দিয়া সুন্দর গঙ্গাদর্শন হইত এবং উত্তরে ও পশ্চিমে দুইটি দরজা ছিল। ব্রাহ্মণী ঐ ঘরে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন ও দিবারাত্রি জপ করিতেন। এইরূপে ঐ ঘরে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল ব্রাহ্মণীর সুখে-দুঃখে কাটিয়া যাইবার পর তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শন তিনি লাভ করেন।

গোবিন্দ বাবুর ঠাকুরবাটীতে বাস ও তপস্যা

ব্রাহ্মণীর পিতৃকুল বোধহয় শাক্ত ছিল, শ্বশুরকুল কি ছিল বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার নিজের বরাবর বৈষ্ণবপদানুগা ভক্তি ছিল ও গুরুর নিকট হইতে গোপালমন্ত্র-গ্রহণ হইয়াছিল। গিন্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতাও বোধ হয় তাঁহার ঐ বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল। কারণ মালপাড়ার গোস্বামীবংশীয়েরাই গোবিন্দ বাবুর গুরুবংশ এবং উঁহাদের দুই-এক জন কামারহাটির ঠাকুরবাটী হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়ই ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন। কিন্তু মায়িক সম্বন্ধে সন্তান-বাৎসল্যের আস্বাদ এ জন্মে কিছুমাত্র না পাইয়াও কেমন করিয়া যে অঘোরমণির বাৎসল্যরতিতে এত নিষ্ঠা হয় এবং শ্রীভগবানকে পুত্রস্থানীয় করিয়া গোপালভাবে ভজনা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার মীমাংসা হওয়া কঠিন। অনেকেই বলিবেন পূর্ব্ব জন্ম ও সংস্কার—যাহাই হউক, ঘটনা কিন্তু সত্য।

বিলাতে আমেরিকায় সংসারে দুঃখ-কষ্ট পাইয়া বা অপর

কোন কারণে স্ত্রীলোকদিগের ভিতর ধর্ম্মনিষ্ঠা আসিলেই উহা দান, পরোপকার এবং দরিদ্র ও রোগীর সেবারূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। দিবারাত্রি সৎকর্ম্ম করা ইহাই তাহাদের লক্ষ্য হয়। আমাদের দেশে উহার ঠিক বিপরীত। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, তপশ্চরণ, আচার এবং জপাদির ভিতর দিয়াই ঐ ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সংসার-ত্যাগ এবং অন্তর্মুখীনতার দিকে অগ্রসর হওয়াই দিন দিন তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের এ জীবনে দর্শনলাভ করা জীবনের সাধ্য এবং উহাতেই যথার্থ শান্তি—একথা এদেশের জলবায়ুতে বর্ত্তমান থাকিয়া স্ত্রীপুরুষের অস্থিমজ্জায় পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কাজেই 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী'র একান্ত বাস ও তপশ্চরণ অন্যদেশের আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও এদেশে সহজ ভাব।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠার বিভিন্নভাবে প্রকাশ

* * *

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই কামারহাটির ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন—কেন, কি কারণে এবং উহা কতদূর গড়াইবে, সে কথা অবশ্য কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই; কিন্তু 'ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধু-ভক্ত এবং ইঁহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব'—এইরূপ ভাবে কেমন একটা অব্যক্ত টানের উদয় হইয়াছিল। গিন্নীও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে সমাজে নিন্দা করে এই ভয়ে আর আসিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাহার উপর মেয়ে জামাইদের জন্য তাঁহাকে অনেক কাল আবার পটলডাঙ্গার বাটীতেও

কাটাইতে হইত। সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বর অনেক দূর এবং আসিতে হইলে সকলকে জানাইয়া সাজ সরঞ্জাম করিয়া আসিতে হয়—কাজেই আর বড় একটা আসা হইত না।

অঘোরমণির ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন

ব্রাহ্মণীর ও সব ঝঞ্চাট তো নাই—কাজেই প্রথম দর্শনের অল্প দিন পরে জপ করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিবার ইচ্ছা হইবামাত্র দুই-তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ, আমার জন্য কি এনেছ দাও।" গোপালের মা বলেন, "আমি তো একেবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন ক'রে সে 'রোঘো' (খারাপ) সন্দেশ বার করি—এঁকে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্চে—আবার তাই ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!" ভয়ে লজ্জায় কিছু না বলিতে পারিয়া সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরও উহা মহা আনন্দ করিয়া খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আনো কেন? নারকেল-নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারী—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।" গোপালের মা বলেন, "ধর্ম্মকর্ম্মের কথা দূরে গেল, এইরূপে কেবল খাবার কথাই হ'তে লাগলো, আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেছি—কেবল খাই খাই, কেবল খাই খাই; আমি গরীব কাঙ্গাল

লোক—কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক্, আর আসবো না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েচি, অমনি যেন পেছন থেকে তিনি টানতে লাগলেন। কোন মতে এগুতে আর পারি না! কত করে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি! ইহার কয়েক দিন পরেই আবার 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' চচ্চড়ি হাতে করিয়া তিন মাইল হাঁটিয়া পরমহংসদেবের দর্শনে উপস্থিত। ঠাকুরও পূর্ব্বের ন্যায় আসিবামাত্র উহা চাহিয়া খাইয়া "আহা কি রান্না, যেন সুধা, সুধা" বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গোপালের মার সে আনন্দ দেখিয়া চোখে জল আসিল। ভাবিলেন—তিনি গরীব কাঙ্গাল বলিয়া তাঁহার এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন।

এইরূপে দুই-চারি মাস ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত হইতে লাগিল। যে দিন যা রাঁধেন, ভাল লাগিলেই তাহা পরের বারে ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার সময় ব্রাহ্মণী কামারহাটি হইতে লইয়া আসেন। ঠাকুরও তাহা কত আনন্দ করিয়া খান, আবার কখন বা কোন সামান্য জিনিস, যেমন সুষনি শাক সস্‌সড়ি, কলমি শাক চচ্চাড় ইত্যাদি আনিবার জন্য অনুরোধ করেন। কেবল 'এটা এনো, ওটা এনো' আর 'খাই খাই'র জ্বালায় বিরক্ত হইয়া গোপালের মা কখন কখন ভাবেন, "গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হ'লো? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল খেতে চায়! আর আসবো না।" কিন্তু সে কি এক বিষম টান! দূরে গেলেই আবার কবে যাব, কতক্ষণে যাব, এই মনে হয়।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও একবার কামারহাটিতে গোবিন্দ বাবুর বাগানে গমন করেন এবং তথায় শ্রীবিগ্রহের সেবাদি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। সেবার তিনি সেখানে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কীর্ত্তনাদি করিয়া প্রসাদ পাইবার পর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের সময় তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া গিন্নী ও সকলে বিশেষ মুগ্ধ হন। তবে গোস্বামিপাদদিগের মনে পাছে প্রভুত্ব হারাইতে হয় বলিয়া একটু ঈর্ষা বিদ্বেষ আসিয়াছিল কিনা বলা সুকঠিন। শুনিতে পাই ঐরূপই হইয়াছিল।

ঠাকুরের গোবিন্দ বাবুর বাগানে আগমন

* * *

'কামারহাটির ব্রাহ্মণী'র বহুকালের অভ্যাস—রাত্রি ২টায় উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া ৩টার সময় হইতে জপে বসা। তার পর বেলা আটটা-নয়টার সময় জপ সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া স্নান ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীর দর্শন ও সেবাকার্য্যে যথাসাধ্য যোগদান করা। পরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদি হইয়া গেলে দুই প্রহরের সময় আপনার নিমিত্ত রন্ধনাদিতে ব্যাপৃত হওয়া। পরে আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াই পুনরায় জপে বসা ও সন্ধ্যায় আরতিদর্শন করিবার পর পুনরায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জপে কাটান। পরে একটু দুধ পান করিয়া কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম। স্বভাবতঃই তাঁহার বায়ুপ্রধান ধাত ছিল—নিদ্রা অতি অল্পই হইত। কখন কখন বুক ধড়ফড় ও প্রাণ কেমন কেমন করিত। ঠাকুর শুনিয়া বলেন, "ও তোমার হরিবাই

—ওটা গেলে কি নিয়ে থাকবে? যখন ওরূপ হবে তখন কিছু খেও।"

অঘোরমণির অলৌকিক বালগোপাল-মূর্ত্তি-দর্শনে অবস্থা

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ—শীত ঋতু অপগত হইয়া কুসুমাকর সরস বসন্ত আসিয়া উপস্থিত। পত্র-পুষ্প-গীতিপূর্ণ বসুন্ধরা এক অপূর্ব্ব উন্মত্ততায় জাগরিতা। ঐ উন্মত্ততার ইতরবিশেষ নাই—আছে কিন্তু জীবের প্রবৃত্তির। যাহার যেরূপ সু বা কু প্রবৃত্তি ও সংস্কার, তাহার নিকট উহা সেই ভাবে প্রকাশিত। সাধু সদ্বিষয়ে নব-জাগরণে জাগরিত, অসাধু অন্যরূপে—ইহাই প্রভেদ।

এই সময় 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুটো করার মত দেখা। ইতেছে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট জীবন্ত! ভাবিলেন, "একি? এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন ক'রে হেথায় এলেন?" গোপালের মা বলেন, "আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐ কথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'গোপাল' বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসছে! তার পর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্ত্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ মাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এত বড়

ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখ পানে চেয়ে (সে কি রূপ, আর কি চাউনি !) বললে, 'মা, ননী দাও।' আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা! চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হ'ত ! কেঁদে বল্লুম, 'বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা ?' কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল 'খেতে দাও' বলে ! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুকনো নারকেল-লাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বল্লুম, 'বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য্য জিনিস খেতে দিলুম ব'লে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।

"তার পর জপ সে দিন আর কে করে ? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায় !

ঐ অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আগমন

যেমন সকাল হোলো অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চল্লো—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চল্লুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলচে !"

অঘোরমণি যে দিন ঐরূপে সহসা নিজ উপাস্যদেবতার দর্শনলাভে ভাবে প্রেমে উন্মত্তা হইয়া কামারহাটির বাগান হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট প্রত্যূষে আসিয়া উপস্থিত হন সে দিন সেখানে আমাদের পরিচিতা

অন্য একটি স্ত্রীভক্তও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিব। তিনি বলেন—

"আমি তখন ঠাকুরের ঘরটি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করচি—বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। এমন সময় শুনতে পেলুম বাহিরে কে 'গোপাল, গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে ঠাকুরের ঘরের দিকে আসচে। গলার আওয়াজটা পরিচিত—ক্রমেই নিকট হতে লাগলো। চেয়ে দেখি গোপালের মা! —এলোথেলো পাগলের মত, দুই চক্ষু যেন কপালে উঠেছে, আঁচলটা ভূঁয়ে লুটুচ্চে, কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই—এমনি ভাবে ঠাকুরের ঘরে পূব দিককার দরজাটি দিয়ে ঢুকচে। ঠাকুর তখন ঘরের ভেতর ছোট তক্তাপোশখানির উপর বসেছিলেন।

"গোপালের মাকে ঐরূপ দেখে আমি তো একেবারে হাঁ হয়ে গেছি—এমন সময় তাঁকে দেখে ঠাকুরেরও ভাব হয়ে গেল। ইতি-মধ্যে গোপালের মা এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়লো এবং ঠাকুরও ছেলের মত তার কোলে গিয়ে বসলেন। গোপালের মার দুই চক্ষে তখন দর্ দর্ করে জল পড়চে আর যে ক্ষীর সর ননী এনেছিল তাই ঠাকুরের মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্চে। আমি তো দেখে অবাক আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, কারণ ইহার পূর্ব্বে কখন তো ঠাকুরকে ভাব হয়ে কোনও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতে দেখি নাই; শুনেছিলাম বটে ঠাকুরের গুরু বামনীর কখন কখন যশোদার ভাব হতো আর ঠাকুরও তখন গোপালভাবে তার কোলে উঠে

বসতেন। যা হোক, গোপালের মার ঐ অবস্থা আর ঠাকুরের ভাব দেখে আমি তো একেবারে আড়ষ্ট! কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে ভাব থামলো এবং তিনি আপনার চৌকিতে উঠে বসলেন। গোপালের মার কিন্তু সে ভাব আর থামে না! আনন্দে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে' ইত্যাদি পাগলের মত বলে আর ঘরময় নেচে নেচে বেড়ায়! ঠাকুর তাই দেখে হেসে আমাকে বল্লেন—'দেখ, দেখ, আনন্দে ভরে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে।' বাস্তবিকই ভাবে গোপালের মার ঐরূপ দর্শন হত ও যেন আর এক মানুষ হয়ে যেত! আর একদিন খাবার সময় ভাবে প্রেমে গদ্‌গদ্ হয়ে আমাদের সকলকে গোপাল বলে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়েছিল। আমি আমাদের সমান ঘরে মেয়ের বিয়ে দি নাই বলে আমায় মনে মনে একটু ঘেন্না করতো—সে দিন তার জন্মেই বা গোপালের মার কত অনুনয়-বিনয়! বললে, 'আমি কি আগে জানি যে তোর ভেতরে এতখানি ভক্তি-বিশ্বাস! যে গোপাল ভাবের সময় প্রায় কাউকে ছুঁতে পারে না, সে কি না আজ ভাবাবেশে তোর পিঠের উপর গিয়ে বসলো! তুই কি সামান্যি!'" বাস্তবিকই সেদিন ঠাকুর গোপালের মাকে দেখিয়া সহসা গোপাল-ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রথম এই স্ত্রী-ভক্তটির পৃষ্ঠদেশে এবং পরে গোপালের মার ক্রোড়ে কিছুক্ষণের জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন।

অঘোরমণি ঐরূপ ভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ভাবের আধিক্যে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সে দিন কত কি কথাই না বলিলেন! "এই যে গোপাল আমার কোলে,"

"ঐ তোমার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ভেতর ঢুকে গেল," "ঐ আবার বেরিয়ে এলো," "আয় বাবা, দুঃখিনী মার কাছে আয়"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে দেখিলেন চপল গোপাল কখন বা ঠাকুরের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, আবার কখন বা উজ্জ্বল বালক-মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব বাল্যলীলা-তরঙ্গতুফান তুলিয়া তাহাকে বাহ্য জগতের কঠোর শাসন, নিয়ম প্রভৃতি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল! সে প্রবল ভাবতরঙ্গে পড়িয়া কেইবা আপনাকে সামলাইতে পারে!

ঠাকুরের ঐ অবস্থা দুর্লভ বলিয়া প্রশংসা করা এবং তাঁহাকে শান্ত করা

অদ্য হইতে অঘোরমণি বাস্তবিকই 'গোপালের মা' হইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মার ঐরূপ অপরূপ অবস্থা দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, শান্ত করিবার জন্য তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং ঘরে যত কিছু ভাল ভাল খাদ্য-সামগ্রী ছিল সে সব আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। খাইতে খাইতেও ভাবের ঘোরে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল, "বাবা গেপাল, তোমার দুঃখিনী মা এজন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েচে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েচে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করচো!" ইত্যাদি।

সমস্ত দিন কাছে রাখিয়া স্নানাহার করাইয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে কামারহাটি পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিবার সময় ভাবদৃষ্ট বালক গোপালও পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণীর কোলে চাপিয়া চলিল। ঘরে

ফিরিয়া গোপালের মা পূর্ব্বাভ্যাসে জপ করিতে বসিলেন, কিন্তু সেদিন আর কি জপ করা যায়? যাঁহার জন্য জপ, যাঁহাকে এতকাল ধরিয়া ভাবা—সে যে সম্মুখে নানা রঙ্গ, নানা আবদার করিতেছে! ব্রাহ্মণী শেষে উঠিয়া গোপালকে কাছে লইয়া তক্তাপোশের উপর বিছানায় শয়ন করিল। ব্রাহ্মণীর যাহাতে তাহাতে শয়ন—মাথায় দিবার একটা বালিশও ছিল না। এখন শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই - গোপাল শুধু মাথায় শুইয়া খুঁৎ খুঁৎ করে! অগত্যা ব্রাহ্মণী আপনার বাম বাহূপরি গোপালের মাথা রাখিয়া তাহাকে কোলের গোড়ায় শোয়াইয়া কত কি বলিয়া ভুলাইতে লাগিল—"বাবা, আজ এইরকমে শো; রাত পোয়ালেই কাল কল্‌কেতা গিয়ে ভূতোকে (গিন্নীর বড় মেয়ে) বলে তোমায় বিচি ঝেড়ে বেছে নরম বালিশ করিয়ে দেব," ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোপালের মা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া গোপালকে উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিন, সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্না-ঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে। এইরূপে মায়ে পোয়ে কাঠকুড়ান হইল—তাহার পর রান্না। রান্নার সময়ও দুরন্ত গোপাল কখন কাছে বসিয়া, কখন পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল, কত কি বলিতে লাগিল, কত কি আবদার করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণীও কখন মিষ্ট কথায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন, কখন বকিতে লাগিলেন।

গোপালের মার পূর্ব্বকথা

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে গোপালের মা একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নহবতে—যেখানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী থাকিতেন—যাইয়া জপ করিতে বসিলেন। নিয়মিত জপ সাঙ্গ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন ঠাকুর পঞ্চবটী হইতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর গোপালের মাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "তুমি এখনও অত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে (দর্শনাদি)।"

গোপালের মা— জপ কোরবো না? আমার কি সব হয়েছে?

ঠাকুর— সব হয়েছে।

ঠাকুরের গোপালের মাকে বলা—'তোমার সব হয়েছে'

গোপালের মা— সব হয়েছে?

ঠাকুর— হাঁ, সব হয়েছে।

গোপালের মা— বল কি, সব হয়েছে?

ঠাকুর— হাঁ, তোমার আপনার জন্য জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে, তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হয় তো করতে পার।

গোপালের মা—তবে এখন থেকে যা কিছু কোরবো সব তোমার, তোমার, তোমার।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গোপালের মা কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন, "গোপালের মুখে ঐ কথা সেদিন শুনে থলি মালা সব গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলুম। গোপালের কল্যাণের জন্য করেই জপ করতুম। তার পর অনেক দিন বাদে আবার একটা মালা নিলুম। ভাবলুম—একটা কিছু তো করতে হবে?

চব্বিশ ঘণ্টা করি কি? তাই গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।”

এখন হইতে গোপালের মার জপ-তপ সব শেষ হইল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ঘন ঘন আসা-যাওয়া বাড়িয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে এত খাওয়া-দাওয়ায় আচার-নিষ্ঠা ছিল সে সবও এই মহাভাবতরঙ্গে পড়িয়া দিন দিন কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গোপাল তাঁহার মন-প্রাণ এককালে অধিকার করিয়া বসিয়া কতরূপে তাঁহাকে যে শিক্ষা দিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আর নিষ্ঠাই বা রাখেন কি করিয়া?—গোপাল যে যখন তখন খাইতে চায়, আবার নিজে খাইতে খাইতে মার মুখে গুঁজিয়া দেয়! তাহা কি ফেলিয়া দেওয়া যায়? আর ফেলিয়া দিলে সে যে কাঁদে! ব্রাহ্মণী এই অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গে পড়িয়া অবধি বুঝিয়াছিলেন যে, উহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই খেলা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার ‘নবীন-নীরদশ্যাম, নীলেন্দীবরলোচন’ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ! কাজেই তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়ান, তাঁহার প্রসাদ খাওয়া ইত্যাদিতে আর দ্বিধা রহিল না।

এইরূপে অনবরত দুই মাস কাল কামারহাটির ব্রাহ্মণী গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিবারাত্রি বুকে পিঠে করিয়া এক সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন! ভাবরাজ্যে এইরূপ দীর্ঘকাল বাস করিয়া ‘চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যামের’ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দর্শন মহাভাগ্যবানেরই সম্ভবে। একে তো শ্রীভগবানে বাৎসল্যরতিই জগতে দুর্লভ—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্র মনে থাকিতে উহার উদয় অসম্ভব—তাহার উপর সেই রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহায়ে ঘনীভূত

হইয়া শ্রীভগবানের এইরূপ দর্শনলাভ করা যে আরও কত দুর্লভ তাহা সহজে অনুমিত হইবে। প্রবাদ আছে, 'কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ', 'কলৌ জাগর্ত্তি কালিকা'—তাই বোধ হয় অদ্যাপি শ্রীভগবানের ঐ দুই ভাবের এইরূপ জ্বলন্ত উপলব্ধি কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার খুব হয়েছে। কলিতে এরূপ অবস্থা বরাবর থাকলে, শরীর থাকে না।" বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছাই ছিল, বাৎসল্যরতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণীর ভাবপূত শরীর লোকহিতায় আরও কিছুদিন এ সংসারে থাকে। পূর্ব্বোক্ত দুই মাসের পর গোপালের মার দর্শনাদি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া গেল। তবে একটু স্থির হইয়া বসিয়া গোপালের চিন্তা করিলেই পূর্ব্বের ন্যায় দর্শন পাইতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পুনর্যাত্রা ও গোপালের মার শেষ কথা

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯।২২

'কামারহাটির ব্রাহ্মণী'র গোপালরূপী শ্রীভগবানের দর্শনের কিছুকাল পরে রথের সময় ঠাকুর কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন বাগবাজারের বলরাম বসুর বাটীতে। ভক্তদের ভিড় লাগিয়াছে; বলরাম বাবুও আনন্দে আটখানা হইয়া সকলকে সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। বসুজ মহাশয় পুরুষানুক্রমে বনিয়াদি ভক্ত—এক পুরুষে নয়। ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার ও তৎপরিবার-বর্গের উপর অসীম।

বলরাম বসুর বাটীতে পুনর্যাত্রা উপলক্ষে উৎসব

ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনা—এক সময়ে ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরপ্রদক্ষিণ করা দেখিবার সাধ হইলে ভাবাবস্থায় তদ্দর্শন হয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—অসীম জনতা, হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ততা! আর সেই উন্মাদতরঙ্গের সকলেরই ভিতর উন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদক আকর্ষণ! সেই

অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—উহারই ভিতর যে কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিতে চির অঙ্কিত ছিল, বলরাম বাবুর ভক্তিজ্যোতিঃপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি তাহাদের অন্যতম। বলরাম বাবু যে দিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হন, সে দিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন—এ ব্যক্তি সেই লোক।

স্ত্রী-ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তন দেখিবার সাধ ও তদ্দর্শন। বলরাম বসুকে উহার ভিতর দর্শন করা

বসুজ মহাশয়ের কোঠারে (উড়িষ্যার অন্তর্গত) জমিদারী ও শ্যামচাঁদ-বিগ্রহের সেবা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ও শ্যামসুন্দরের সেবা আছে এবং কলিকাতার বাটীতেও ৺জগন্নাথ-দেবের বিগ্রহ[1] ও সেবাদি আছে। ঠাকুর বলিতেন, "বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।" বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরাম বাবুর অন্নই (ভাত) তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি! কলিকাতায় ঠাকুর যে দিন প্রাতে আসিতেন,

বলরামের নানাস্থানে ঠাকুর-সেবার ও শুদ্ধ অন্নের কথা

১ এই বিগ্রহ এখন কোঠারে আছেন।

সে দিন মধ্যাহ্নভোজন বলরামের বাটীতেই হইত। ব্রাহ্মণ ভক্তদিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহারও বাটীতে কোনদিন অন্নগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্য কথা।

অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের অতি সামান্য নিত্যনৈমিত্তিক চেষ্টাদিতেও কেমন একটু অলৌকিকত্ব, নূতনত্ব থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত যাঁহারা একদিনও সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার মর্ম্ম বিশেষরূপে বুঝিবেন। বলরাম বাবুর অন্ন খাইতে পারা সম্বন্ধেও একটু তলাইয়া দেখিলে উহাই উপলব্ধি হইবে। সাধনাকালে ঠাকুর এক সময়ে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন, "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিস নি—রসে বসে রাখিস"; জগদম্বাও তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার রসদ (খাদ্যাদি) যোগাইবার নিমিত্ত চারিজন রসদ্দার প্রেরিত হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন—ঐ চারিজনের ভিতর রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ প্রথম ও শম্ভু মল্লিক দ্বিতীয় ছিলেন। সিমলার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে (যাহাকে ঠাকুর কখন 'সুরেন্দর' ও কখন 'সুরেশ' বলিয়া ডাকিতেন) 'অর্দ্ধেক রসদ্দার' অর্থাৎ সুরেন্দ্র পুরা একজন রসদ্দার নয়—বলিতেন; মথুরানাথের ও শম্ভু বাবুর সেবা চক্ষে দেখা আমাদের ভাগ্যে হয় নাই—কারণ আমরা তাঁহাদের পরলোক-প্রাপ্তির অনেক পরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। তবে ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। বলরাম বাবুকে ঠাকুর তাঁহার রসদ্দারদিগের অন্যতম বলিয়া কখনও নির্দ্দিষ্ট

ঠাকুরের চারিজন রসদ্দার ও বলরাম বাবুর সেবাধিকার

করিয়াছেন একথা মনে হয় না; কিন্তু তাঁহার যেরূপ সেবাধিকার দেখিয়াছি তাহা আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা মথুর বাবু ভিন্ন অপর রসদ্দারদিগের সেবাধিকার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সে সব কথা অপর কোন সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন এইটুকুই বলি যে, বলরাম বাবু যে দিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন, সেই দিন হইতে ঠাকুরের অদর্শন-দিন পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিজের যাহা কিছু আহার্য্যের প্রয়োজন হইত প্রায় সে সমস্তই যোগাইতেন—চাল, মিছরি, সুজি, সাগু, বার্লি, ভার্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি এবং সুরেন্দ্র বা 'সুরেশ মিত্তির' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরের সেবাদির নিমিত্ত যে সকল ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত লেপ, বালিশ ও ডাল-রুটির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

কি গূঢ় সম্বন্ধে যে এই সকল ব্যক্তি ঠাকুরের সহিত সম্বদ্ধ ছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ কারণে ইঁহারা এই উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হন, তাহাই বা কে বলিবে? আমরা এই পর্য্যন্তই বুঝিয়াছি যে, ইঁহারা মহাভাগ্যবান—জগদম্বার চিহ্নিত ব্যক্তি। নতুবা লোকোত্তর পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বর্ত্তমান লীলায় ইঁহারা এইরূপে বিশেষ সহায়ক হইয়া জন্মাধিকার লাভ করিতেন না। নতুবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত মনে ইঁহাদের মুখের ছবি এরূপ ভাবে অঙ্কিত থাকিত না, যাহাতে তিনি দর্শনমাত্রেই ত বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা এখানকার, এই বিশেষ অধিকার লইয়া আসিয়াছে।"

'ইহারা আমার' না বলিয়া ঠাকুর 'এখানকার' বলিতেন, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপাপবিদ্ধ মনে অহং-বুদ্ধি এতটুকুও স্থান পাইত না। তাই 'আমি, আমার' এই কথাগুলি প্রয়োগ করা তাঁহার পক্ষে বড়ই কঠিন ছিল। কঠিন ছিলই বা বলি কেন? তিনি ঐ দুই শব্দ আদৌ বলিতে পারিতেন না। যখন নিতান্তই বলিতে হইত, তখন 'শ্রীজগদম্বার দাস বা সন্তান আমি'—এই অর্থে বলিতেন এবং উহাও পূর্ব্ব হইতে ঐ ভাব ঠিক ঠিক মনে আসিলে তবেই বলা চলিত, সে জন্য কথোপকথনকালে কোন স্থলে 'আমার' বলিতে হইলে ঠাকুর নিজ শরীর দেখাইয়া 'এখানকার' এই কথাটি প্রায়ই বলিতেন—ভক্তেরাও উহা হইতে বুঝিয়া লইতেন; যথা, 'এখানকার লোক', 'এখানকার ভাব নয়' ইত্যাদি বলিলেই আমরা বুঝিতাম, তিনি 'তাঁহার লোক নয়' 'তাঁহার ভাব নয়' বলিতেছেন।

ঠাকুর 'আমি', 'আমার' শব্দের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা 'এখানে', 'এখানকার' বলিতেন। উহার কারণ

যাক্ এখন সে কথা—এখন আমরা রসদ্দারদের কথাই বলি—প্রথম রসদ্দার মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কলিকাতায় প্রথম শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় দেড় জনের ভিতর শম্ভু বাবু মথুর বাবুর শরীর-ত্যাগের কিছু পর হইতে কেশব বাবু প্রমুখ কলিকাতার ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন এবং অর্দ্ধ-রসদ্দার সুরেশ বাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

রসদ্দারেরা কে কি ভাবে কতদিন ঠাকুরের সেবা করে



৺মথুর বাবু



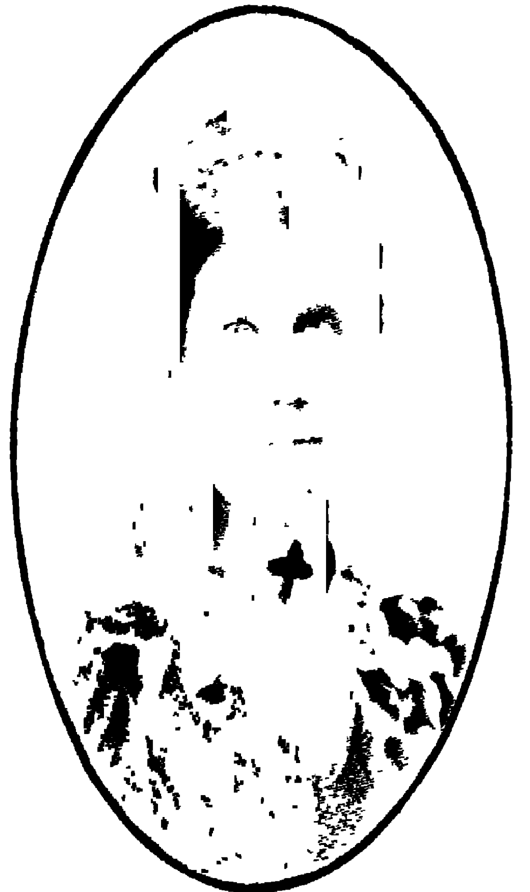
৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক



৺সুরেশ মিত্র



৺বলরাম বসু



৺সারা সি বুল্

অদর্শনের ছয় সাত বৎসর পূর্ব্ব হইতে চারি পাঁচ বৎসর পর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে বরাহনগরে মুন্সী বাবুদিগের পুরাতন ভগ্ন জীর্ণ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মঠ—যাহা আজ বেলুড় মঠে পরিণত—এই সুরেশ বাবুর আগ্রহে এবং ব্যয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। হিসাবের বাকি আর দেড়জন রসদ্দার—কোথায় তাঁহারা? আমাদের প্রসঙ্গোক্ত বলরাম বাবু ও আমেরিকা-নিবাসিনী মহিলা (মিসেস্ সারা সি বুল) শ্রীবিবেকানন্দ স্বামিজীকে বেলুড়-মঠ-স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন—তাঁহারাই কি ঐ দেড় জন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ স্বামিজীর অদর্শনে এ কথা এখন আর কে মীমাংসা করিবে?

*　　　*　　　*

বলরাম বাবু দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর রথের সময় ঠাকুরকে বাটীতে লইয়া আসেন। বাগবাজার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে তাঁহার বাটী অথবা তাঁহার ভ্রাতা কটকের প্রসিদ্ধ উকিল রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের বাটী। বলরাম-বাবু তাঁহার ভ্রাতার বাটীতেই থাকিতেন—বাটীর নম্বর ৫৭। এই ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট বাটীতে ঠাকুরের যে কতবার শুভাগমন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুর কখন কখন রহস্য করিয়া 'মা কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, কলিকাতার বসুপাড়ার এই বাটীকে

'বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা'

তাঁহার দ্বিতীয় কেল্লা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন, "বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা"—কর্ত্তা গিন্নী হইতে বাটীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি পর্য্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ। প্রায় অনেক পরিবারেই দেখা যায়, যদি একজন কি দুইজন ধার্ম্মিক তো অপর সকলে আর একরূপ, বিজাতীয়; এ পরিবারে কিন্তু সেটি নাই; সকলেই একজাতীয় লোক। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ধর্ম্মানুরাগী পরিবার বোধ হয় অল্পই পাওয়া যায়—তাহার উপর আবার পরিবারস্থ সকলের এইরূপ এক বিষয়ে অনুরাগ থাকা এবং পরস্পর পরস্পরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা, ইহা দেখিতে পাওয়া কদাচ কখন হয়। কাজেই এই পরিবারবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয় কেল্লাস্বরূপ হইবে এবং এখানে আসিয়া যে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ পাইবেন ইহা বিচিত্র নহে।

বলরামের বাটীতে রথোৎসব, আড়ম্বরশূন্য ভক্তির ব্যাপার

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ছিল, কাজেই রথের সময় রথটানাও হইত; কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই। বাড়ী সাজান, বাদ্যভাণ্ড, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—এ সবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ বাহির বাটীর দোতলায় চক-মিলান বারাণ্ডার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত—একদল কীর্ত্তন আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিত, আর ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ ঐ কীর্ত্তনে যোগদান

করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য—সে আর অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইবে? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা! এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কীর্ত্তনের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন। তারপর অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত এবং ভক্তেরা দুই-চারি জন ব্যতীত যে যার বাটীতে চলিয়া যাইতেন। লেখকের এই আনন্দ-সম্ভোগ জীবনে একবারমাত্রই হইয়াছিল—ঐ বারেই গোপালের মাকে এই বাটীতে ঠাকুরের কথায় আনিতে পাঠান হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের উল্‌টো রথের কথাই আমরা এখানে বলিতেছি। ঠাকুর এই বৎসর ঐ দিন এখানে আসিয়া বলরাম বাবুর বাটীতে দুই দিন দুই রাত থাকিয়া তৃতীয় দিনে বেলা আটটা নয়টার সময় নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।

* * *

আজ ঠাকুর প্রাতেই এ বাটীতে আসিয়াছেন। বাহিরে কিছুক্ষণ বসার পর তাঁহাকে অন্দরে জলযোগ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল। বাহিরে দু-চারিটি করিয়া অনেকগুলি পুরুষ ভক্তের সমাগম হইয়াছে, ভিতরেও নিকটবর্ত্তী বাটীসকল হইতে ঠাকুরের যত স্ত্রীভক্ত সকলে আসিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেই বলরাম বাবুর

আত্মীয়া বা পরিচিতা এবং তাঁহার বাটীতে যখনই পরমহংসদেব উপস্থিত হইতেন বা তিনি নিজে যখনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিতে যাইতেন, তখনই ইঁহাদের সংবাদ দিয়া বাটীতে আনাইতেন বা আনাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ভাবিনী ঠাকুরুণ, অসীমের মা, গন্নুর মা ও তাঁর মা—এইরূপ এর মা, ওর পিসী, এর ননদ, ওর পড়শী প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের আজ সমাগম হইয়াছে।

এই সকল সতী সাধ্বী ভক্তিমতী স্ত্রীলোকদিগের সহিত কামগন্ধহীন ঠাকুরের যে কি এক মধুর সম্বন্ধ ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইঁহাদের অনেকেই ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা বলিয়া তখনি জানেন। সকলেরই ঠাকুরের উপর এইরূপ বিশ্বাস। আবার কোন কোন ভাগ্যবতী উহা গোপালের মার ন্যায় দর্শনাদি দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কাজেই ঠাকুরকে ইঁহারা আপনার হইতেও আপনার বলিয়া জানেন এবং তাঁহার নিকট কোনরূপ ভয় ডর বা সঙ্কোচ অনুভব করেন না। ঘরে কোনরূপ ভাল খাবার-দাবার তৈয়ার করিলে তাহা পতিপুত্রদের আগে না দিয়া ইঁহারা ঠাকুরের জন্য আগে পাঠান বা স্বয়ং লইয়া যান। ঠাকুর থাকিতে এই সকল ভদ্রমহিলারা কতদিন যে পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় নিজেদের বাটীতে গতায়াত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। কোন দিন সন্ধ্যার পর, কোন দিন-রাত দশটায়, আবার কোন দিন বা উৎসব-কীর্ত্তনাদি সাঙ্গ হইতে ও দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিতে রাত দুই প্রহরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে!

স্ত্রী-ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ

ইঁহাদের কাহাকেও ঠাকুর ছেলেমানুষের মত কত আগ্রহের সহিত নিজের পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগের ঔষধ জিজ্ঞাসা করিতেন কেহ তাঁহাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া হাসিলে বলিতেন, "তুই কি জানিস? ও কত বড় ডাক্তারের স্ত্রী—ও দু-চারটে ঔষধ জানেই জানে।" কাহারও ভাবপ্রেম দেখিয়া বলিতেন, "ও কৃপাসিদ্ধ গোপী।" কাহারও মধুর রান্না খাইয়া বলিতেন, "ও বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী, সুক্তোয় সিদ্ধ-হস্ত" ইত্যাদি। ঠাকুর জল খাইতে খাইতে আজ এই সকল স্ত্রীলোককে গোপালের মার সৌভাগ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ওগো, সেই যে কামারহাটি থেকে বামনের মেয়েটি আসে, যার গোপালভাব—তার সব কত কি দর্শন হয়েছে; সে বলে, গোপাল তার কাছ থেকে হাত পেতে খেতে চায়! সে দিন ঐ সব কত কি দেখে শুনে ভাবে প্রেমে উন্মাদ হয়ে উপস্থিত। খাওয়াতে দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হোলো। থাকতে বল্লুম, কিন্তু থাকলো না। যাবার সময়ও সেইরূপ উন্মাদ—গায়ের কাপড় খুলে ভূঁয়ে লুটিয়ে যাচ্ছে, হুঁশ নেই। আমি আবার কাপড় তুলে দিয়ে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দি! খুব ভক্তি বিশ্বাস—বেশ! তাকে এখানে আনতে পাঠাও না।"

ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদিগকে গোপালের মার দর্শনের কথা বলা ও তাঁহাকে আনিতে পাঠান

বলরাম বাবুর কানে ঐ কথা উঠিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ কামারহাটি হইতে গোপালের মাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন—কারণ আসিবার সময় যথেষ্ট আছে; ঠাকুর আজ কাল তো এখানেই থাকিবেন।

জলযোগ সাঙ্গ হইলে ঠাকুর বাহিরে আসিয়া বসিলেন ও ভক্তদের সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঠাকুরের মধ্যাহ্নভোজন হইয়া গেল—ভক্তেরাও সকলে প্রসাদ পাইলেন। একটু বিশ্রামের পর ঠাকুর বাহিরে হলঘরে বসিয়া ভক্তদের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁহার ভাবাবেশ হইল। আমরা সকলেই বালগোপালের ধাতুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছি—দুই জানু ও এক হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও এক হাত তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে যেন কাহারও মুখপানে সাহ্লাদ-সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি চাহিতেছে! ভাবাবেশে ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ঠিক সেইরূপ সংস্থান হইয়া গেল, কেবল চক্ষু দুইটি যেন বাহিরের কিছুই দেখিতেছে না, এইরূপ ভাবে অর্দ্ধনিমীলিত অবস্থায় রহিল! ঠাকুরের এইরূপ ভাবাবস্থারম্ভ হইবার একটু পরেই গোপালের মারও গাড়ী আসিয়া বলরাম বাবুর বাটীর দরজায় দাঁড়াইল এবং গোপালের মা উপরে আসিয়া ঠাকুরকে আপনার ইষ্টরূপে দর্শন করিলেন। উপস্থিত সকলে গোপালের মার ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা এইরূপ গোপাল-ভাবাবেশ হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে বহু ভাগ্যবতী জ্ঞানে সম্মান ও বন্দনা করিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, ‘কি ভক্তি, ভক্তির জোরে ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপালরূপ ধারণ করিলেন’ ইত্যাদি! গোপালের মা বলিলেন, “আমি কিন্তু বাপু, ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে খেলবে

অপরাহ্নে ঠাকুরের সহসা গোপাল-ভাবাবেশ ও পরক্ষণেই গোপালের মার আগমন

বেড়াবে দৌড়ুবে—ও মা, ও কি! একেবারে যেন কাঠ! আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নেই!" বাস্তবিকই ভাবসমাধিতে ঠাকুরের ঐরূপ বাহ্যজ্ঞান-হারান প্রথম যে দিন তিনি দেখেন, সে দিন ভয়ে ডরে কাতর হইয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বলিয়াছিলেন, "ও বাবা, তুমি অমন হলে কেন?"—সে কামারহাটিতে ঠাকুর যে দিন প্রথম গিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভাবাবেশে যখন যাহা করিতেন তাহাই সুন্দর দেখাইত। উহার কারণ

আমরা যখন ঠাকুরের নিকট যাই, ঠাকুরের বয়স তখন ঊনপঞ্চাশের কাছাকাছি—বোধ হয় ঊনপঞ্চাশ হইতে পাঁচ ছয় মাস বাকি আছে; গোপালের মাও ঐ সময়েই যান। ঠাকুরের কাছে যাইবার পূর্ব্বে মনে হইত ছোট ছেলে নাচে, অঙ্গভঙ্গী করে, তা লোকের বেশ লাগে কিন্তু একটা বুড়ো মিন্‌সে, সাজোয়ান মরদ যদি ঐরূপ করে, তা হ'লে লোকের বিরক্তিকর বা হাস্যোদ্দীপকই হয়। 'গণ্ডারের খেমটি নাচ কি কারুর ভাল লাগে?'—স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসিয়া দেখি সব উল্টো ব্যাপার। বয়সে প্রৌঢ় হইলেও ঠাকুর নাচেন, গাহেন, কত হাবভাব দেখান—কিন্তু তার সকলগুলিই কি মিষ্ট! বাস্তবিক 'একটা বুড়ো মিনসেকে নাচিলে যে এত ভাল দেখায়, এ কথা আমরা কখন স্বপ্নে ভাবি নাই!'—গিরিশ বাবু এ কথাটি বলিতেন। আজ বলরাম বাবুর বাড়ীতেই এই যে তাহার গোপাল-ভাবাবেশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান বালগোপালের ন্যায় হইল, তাহাই বা কত সুন্দর! কেন যে ঐরূপ সুন্দর বোধ হইত, তাহা তখন বুঝিতাম না—কেবল সুন্দর ইহাই অনুভব করিতাম।

এখন বুঝি যে, যে ভাব যখন তাঁহার ভিতরে আসিত তাহা তখন পুরাপুরিই আসিত, তাঁহার ভিতর এতটুকু আর অন্য ভাব থাকিত না—এতটুকু 'ভাবের ঘরে চুরি' বা লোকদেখান ভাব থাকিত না। সে ভাবে তিনি তখন একেবারে অনুপ্রাণিত, তন্ময় বা (তিনি নিজে যেমন রহস্য করিয়া বলিতেন) ডাইলুট (dilute) হইয়া যাইতেন; কাজেই তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া বালকের অভিনয় করিতেছেন বা পুরুষ হইয়া স্ত্রীর অভিনয় করিতেছেন—এ কথা লোকের মনে আর উদয় হইতেই পাইত না! ভিতরের প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া শরীরটাকে যেন এককালে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত।

*　　　*　　　*

ভক্তসঙ্গে আনন্দে দুই দিন দুই রাত ঠাকুরের বলরাম বাবুর বাটীতে কাটিয়াছে। আজ তৃতীয় দিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন।

পুনর্যাত্রা-শেষে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আগমন

বেলা আন্দাজ ৮টা কি ৯টা হইবে—ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। স্থির হইল, গোপালের মা ও অন্য একজন স্ত্রীভক্তও (গোলাপ-মাতা) ঐ নৌকায় ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, তদ্ভিন্ন দুই এক জন বালক-ভক্ত যাঁহারা ঠাকুরের পরিচর্য্যার জন্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও যাইবেন। বোধ হয় শ্রীযুত কালী (স্বামী অভেদানন্দ) উহাদের অন্যতম।

ঠাকুর বাটীর ভিতরে যাইয়া জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া এবং ভক্ত-পরিবারের প্রণাম গ্রহণ করিয়া নৌকায় যাইয়া উঠিলেন। গোপালের মা প্রভৃতিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া নৌকায়

উঠিলেন। বলরাম বাবুর পরিবারবর্গের অনেকে ভক্তি করিয়া গোপালের মাকে কাপড় ইত্যাদি এবং তাঁহার অভাব আছে জানিয়া রন্ধনের নিমিত্ত হাতা, বেড়ী প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্য তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সে পুঁটুলি বা মোটটি নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। নৌকা ছাড়িল।

নৌকায় যাইবার সময় ঠাকুরের গোপালের মার পুঁটুলি দেখিয়া বিরক্তি। ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের যেমন ভালবাসা তেমনি কঠোর শাসনও ছিল

যাইতে যাইতে পুঁটুলি দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসায় জানিলেন—উহা গোপালের মার; ভক্ত-পরিবারেরা তাঁহাকে যে সকল দ্রব্যাদি দিয়াছেন, তাহারই পুঁটুলি। শুনিয়াই ঠাকুরের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। গোপালের মাকে কিছু না বলিয়া অপর স্ত্রী-ভক্ত গোলাপ-মাতাকে লক্ষ্য করিয়া ত্যাগের বিষয়ে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "যে ত্যাগী সেই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুধু হাতে চলে আসে, সে ভগবানের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে।" ইত্যাদি। সেদিন যাইতে যাইতে ঠাকুর গোপালের মার সহিত একটিও কথা কহিলেন না, আর বারবার ঐ পুঁটুলিটির দিকে দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ঐ ভাব দেখিয়া গোপালের মার মনে হইতে লাগিল, পুঁটুলিটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দি। একদিকে ঠাকুরের যেমন পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ভাবে ভক্তদের সহিত হাসি তামাসা ঠাট্টা খেলাধূলা ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি কঠোর শাসন। কাহারও এতটুকুও বেচাল দেখিতে পারিতেন না। ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র জিনিসের তত্ত্বাবধান ছিল, কাহারও অতি সামান্য ব্যবহার

বে-ভাবের হইলে অমনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িত ও যাহাতে উহার সংশোধন হয় তাহার চেষ্টা আসিত। চেষ্টারও বড় একটা বেশী আড়ম্বর করিতে হইত না, একবার মুখ ভারী করিয়া তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথা না কহিলেই সে ছট্‌ফট্‌ করিত ও স্বকৃত দোষের জন্য অনুতপ্ত হইত। তাহাতেও যে নিজের ভুল না শোধরাইত, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে দুই একটি সামান্য তিরস্কারই তাহার মতি স্থির করিতে যথেষ্ট হইত! অদ্ভুত ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তের সহিত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যবহার ও শিক্ষাদান এইরূপে চলিত— প্রথম অমানুষী ভালবাসায় তাহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার, তাহার পর যাহা কিছু বলিবার কহিবার দুই চারি কথায় বলা বা বুঝান।

দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়াই গোপালের মা নহবতে শ্রীশ্রীমার নিকট ব্যাকুল হইয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "অ বৌমা, গোপাল এই সব জিনিসের পুঁটুলি দেখে রাগ করেছে; এখন উপায়? তা এসব আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই।"

ঠাকুরের বিরক্তি-প্রকাশে গোপালের মার কষ্ট ও শ্রীশ্রীমার তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপার দয়া—বুড়ীকে কাতর দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "উনি বলুনগে। তোমায় দেবার ত কেউ নেই, তা তুমি কি করবে মা—দরকার বলেই ত এনেছ?"

গোপালের মা তত্রাচ তাহার মধ্য হইতে একখানা কাপড় ও আরও কি কি দুই একটি জিনিস বিলাইয়া দিলেন এবং ভয়ে ভয়ে দুই একটি তরকারী স্বহস্তে রাঁধিয়া ঠাকুরকে ভাত খাওয়াইতে

গেলেন। অন্তর্য্যামী ঠাকুর তাঁহাকে অনুতপ্তা দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না। আবার গোপালের মার সহিত হাসিয়া কথা কহিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। গোপালের মাও আশ্বস্তা হইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া বৈকালে কামারহাটি ফিরিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গোপালের মার ভাবঘন গোপালমূর্ত্তি প্রথম দর্শনের দুই মাস পরে সে দর্শন আর সদাসর্ব্বক্ষণ হইত না। তাহাতে কেহ না মনে করিয়া বসেন যে, উহার পরে তাঁহার কালেভদ্রে কখন গোপালমূর্ত্তির দর্শন হইত। কারণ প্রতিদিনই তিনি দিনের মধ্যে দুই-দশ বার গোপালের দর্শন পাইতেন। যখনই দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইত তখনই পাইতেন, আবার যখনই কোন বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার প্রয়োজন তখনই গোপাল সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইয়া সঙ্কেতে, কথায় বা নিজে হাতেনাতে করিয়া দেখাইয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিতে প্রবৃত্ত করিতেন। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বার বার মিশিয়া যাইয়া তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভিন্ন। খাইবার ও শুইবার জিনিস চাহিয়া চিন্তিয়া লইয়া কি ভাবে তাঁহার সেবা করা উচিত তাহা শিখাইয়াছিলেন। আবার কোন কোন বিশেষ বিশেষ শ্রীরাম-কৃষ্ণভক্তদিগের সহিত একত্র বিহার করিয়া বা তাঁহাদের সহিত অন্য কোনরূপ আচরণ করিয়া দেখাইয়া নিজ মাতাকে বুঝাইয়া-ছিলেন, ইঁহারা ও তিনি অভেদ—ভক্ত ও ভগবান এক। কাজেই তাঁহাদের ছোঁয়ান্যাপা বস্তু-ভোজনেও তাঁহার দ্বিধা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবে ইষ্টদেব-বুদ্ধি দৃঢ় হইবার পর হইতে আর

তাঁহার বড় একটা গোপালমূর্ত্তির দর্শন হইত না। যখন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই দেখিতে পাইতেন এবং ঐ মূর্ত্তির ভিতর দিয়াই বাল-গোপালরূপী ভগবান তাঁহাকে যত কিছু শিক্ষা দিতেন। প্রথম প্রথম ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই অশান্তি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "গোপাল, তুমি আমায় কি করলে, আমার কি অপরাধ হল, কেন আর আমি তোমায় আগেকার মত (গোপালরূপে) দেখতে পাই না?" ইত্যাদি। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দেন, "ওরূপ সদাসর্ব্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে শরীর থাকে না; একুশদিন মাত্র শরীরটা থেকে তার পর শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে যায়।" বাস্তবিক প্রথম দর্শনের পর দুই মাস গোপালের মা সর্ব্বদাই একটা ভাবের ঘোরে থাকিতেন। রান্না-বাড়া, স্নান-আহার, জপ-ধ্যান প্রভৃতি যাহা কিছু করিতেন সব যেন পূর্ব্বের বহুকালের অভ্যাস ছিল ও করিতে হয় বলিয়া; তাঁহার শরীরটা অভ্যাসবশে আপনাআপনি ঐ সকল কোন রকমে সারিয়া লইত এই পর্য্যন্ত! কিন্তু তিনি নিজে সদাসর্ব্বক্ষণ যেন একটা বিপরীত নেশার ঝোঁকে থাকিতেন! কাজেই এ ভাবে শরীর আর কয়দিন থাকে? দুই মাসও যে ছিল ইহাই আশ্চর্য্য! দুই মাস পরে সে নেশার ঝোঁক অনেকটা কাটিয়া গেল। কিন্তু গোপালকে পূর্ব্বের ন্যায় না দেখিতে পাওয়ায় আবার এক বিপরীত ব্যাকুলতা আসিল। বায়ুপ্রধান ধাত—বায়ু বাড়িয়া বুকের ভিতর একটা দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেই জন্যই বলেন, "বাই বেড়ে বুক

গোপালের মার ঠাকুরে ইষ্ট-বুদ্ধি দৃঢ় হইবার পর যেরূপ দর্শনাদি হইত

যেন আমার করাত দিয়ে চিরচে!" ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "ও তোমার হরিবাই; ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গো? ও থাকা ভাল; যখন বেশী কষ্ট হবে তখন কিছু খেয়ো।" এই কথা বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নানারূপ ভাল ভাল জিনিস সে দিন খাওয়াইয়াছিলেন।

* * *

ঠাকুরের নিকটে মাড়োয়ারী ভক্তদের আসা-যাওয়া

কলিকাতা হইতে আমরা মেয়ে-পুরুষে অনেকে ঠাকুরকে যেমন দেখিতে যাইতাম অনেকগুলি মাড়োয়ারী মেয়ে-পুরুষও তেমনি সময়ে সময়ে দেখিতে আসিত। তাহারা সকলে অনেকগুলি গাড়ীতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিত এবং গঙ্গাস্নান করিয়া পুষ্পচয়ন ও শিব-পূজাদি সারিয়া পঞ্চবটীতে আড্ডা করিত। পরে ঐ গাছতলায় উনুন খুঁড়িয়া ডাল, লেট্টি, চুরমা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক আগে ঠাকুরকে সেই সব খাবার দিয়া যাইত এবং পরে আপনারা প্রসাদ পাইত। ইহাদের ভিতর আবার অনেকে ঠাকুরের নিমিত্ত বাদাম, কিস্‌মিস্‌, পেস্তা, ছোয়ারা, থালা-মিছরি, আঙ্গুর, বেদানা, পেয়ারা, পান প্রভৃতি লইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। কারণ তাহারা আমাদের অনেকের মত ছিল না, রিক্তহস্তে সাধুর আশ্রমে বা দেবতার স্থানে যে যাইতে নাই এ কথা সকলেই জানিত এবং সে জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিতই আসিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু তাহাদের দু-এক জনের ছাড়া ঐ সকল মাড়োয়ারী-প্রদত্ত জিনিসের কিছুই স্বয়ং গ্রহণ করিতেন না।

বলিতেন, "ওরা যদি এক খিলি পান দেয় ত তার সঙ্গে ষোলটা কামনা জুড়ে দেয়—'আমার মকদ্দমার জয় হোক, আমার রোগ ভাল হোক, আমার ব্যবসায়ে লাভ হোক' ইত্যাদি!" ঠাকুর নিজে ত ঐ সকল জিনিস খাইতেন না, আবার ভক্তদেরও ঐ সকল খাবার খাইতে দিতেন না। তবে ডাল, রুটি ইত্যাদি রাঁধা খাবার, যাহা তাহারা ঠাকুর দেবতাকে ভোগ দিয়া তাঁহাকে দিয়া যাইত, 'প্রসাদ' বলিয়া নিজেও তাহা কখন একটু আধটু গ্রহণ করিতেন এবং আমাদের সকলকেও খাইতে দিতেন। তাহাদের দেওয়া ঐ সকল মিছরি, মেওয়া প্রভৃতি খাওয়ার অধিকারী ছিলেন একমাত্র নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দজী)। ঠাকুর বলিতেন, "ওর (নরেন্দ্রের) কাছে জ্ঞান-অসি রয়েছে—খাপখোলা তরোয়াল, ও ওসব খেলে কিছুই দোষ হবে না, বুদ্ধি মলিন হবে না।" তাই ঠাকুর ভক্তদের ভিতর যাহাকে পাইতেন তাহাকে দিয়া ঐ সব খাবার নরেন্দ্রনাথের বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। যেদিন কাহাকেও পাইতেন না, সেদিন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র মা কালীর ঘরের পূজারী রামলালকে দিয়া পাঠাইয়া দিতেন। আমরা রামলাল দাদার নিকট শুনিয়াছি, নিত্য নিত্য ঐরূপ লইয়া যাইতে পাছে রামলাল বিরক্ত হয় তাই একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর রামলালকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কিরে, তোর কল্‌কাতায় কোন দরকার নেই?"

কামনা করিয়া দেওয়া জিনিস ঠাকুর গ্রহণ ও ভোজন করিতে পারিতেন না। ভক্তদেরও উহা খাইতে দিতেন না।

রামলাল—আজ্ঞে, আমার কল্‌কাতায় আর কি দরকার। তবে আপনি বলেন ত যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তাই বলছিলাম ; বলি অনেকদিন বেড়াতে টেড়াতে যাস্ নি, তাই যদি বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা হয়ে থাকে। তা একবার যা না। যাস্‌তো ঐ টিনের বাক্সয় পয়সা আছে, নিয়ে বরানগর থেকে সেয়ারের গাড়ীতে করে যাস। তা না হলে রোদ লেগে অসুখ করবে। আর ঐ মিছরি, বাদামগুলো নরেন্দ্রকে দিয়ে আসবি ও তার খবরটা নিয়ে আসবি—সে অনেক দিন আসে নি ; তার খবরের জন্য মনটা 'আটু-পাটু' কচ্চে।

মাড়োয়ারীদের দেওয়া খাদ্যদ্রব্য নরেন্দ্রনাথকে পাঠান

রামলাল দাদা বলেন, "আহা, সে কত সঙ্কোচ, পাছে আমি বিরক্ত হই !" বলা বাহুল্য, রামলাল দাদাও ঐরূপ অবসরে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়া ভক্তদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

* * *

আজ অনেকগুলি মাড়োয়ারী ভক্ত ঐরূপে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় ফল, মিছরি ইত্যাদি ঠাকুরের ঘরে অনেক জমিয়াছে। এমন সময় গোপালের মা ও কতকগুলি স্ত্রী-ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত। গোপালের মাকে দেখিয়া ঠাকুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে ছেলে যেমন মাকে পাইয়া কত প্রকারে আদর করে, তেমনি করিতে লাগিলেন। গোপালের মার শরীরটা দেখাইয়া সকলকে বলিলেন, "এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে ভরা ; হরিময় শরীর !" গোপালের মাও চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।—ঠাকুর ঐরূপে পায়ে হাত দিতেছেন বলিয়া একটুও সঙ্কুচিতা হইলেন না। পরে ঘরে যত

কিছু ভাল ভাল জিনিস ছিল, সব আনিয়া ঠাকুর বৃদ্ধাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে যাইলেই ঠাকুর ঐরূপ করিতেন ও খাওয়াইতেন। গোপালের মা তাহাতে একদিন বলেন, "গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালবাস কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছ।

গোপালের মা—আগে কবে খাইয়েছি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জন্মান্তরে।

সমস্ত দিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গোপালের মা যখন কামারহাটি ফিরিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তখন ঠাকুর মাড়োয়ারীদের দেওয়া যত মিছরি আনিয়া গোপালের মাকে দিলেন ও সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিলেন। গোপালের মা বলিলেন, "অত মিছরি সব দিচ্চ কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—(গোপালের মার চিবুক সাদরে ধরিয়া) ওগো, ছিলে গুড়, হলে চিনি, তারপর হলে মিছরি! এখন মিছরি হয়েছ—মিছরি খাও আর আনন্দ কর।

গোপালের মাকে ঠাকুরের মাড়োয়ারীদের প্রদত্ত মিছরি দেওয়া

মাড়োয়ারীদের মিছরি ঐরূপে গোপালের মাকে ঠাকুর দেওয়াতে সকলে অবাক্ হইয়া রহিল—বুঝিল, ঠাকুরের কৃপায় এখন আর গোপালের মার মন কিছুতেই মলিন হইবার নয়। গোপালের মা আর কি করেন, অগত্যা ঐ মিছরিগুলি লইয়া গেলেন, নতুবা গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ছাড়েন না; আর শরীর থাকিতে ত সকল জিনিসেরই প্রয়োজন—গোপালের মা যেমন

কখন কখন আমাদের বলিতেন, "শরীর থাক্‌তে সব চাই—জিরেটুকু মেথিটুকু পর্য্যন্ত, এমন দেখি নি।"

গোপালের মা পূর্ব্বাবধি জপ-ধ্যান করিতে করিতে যাহা কিছু দেখিতেন সব ঠাকুরকে আসিয়া বলিতেন। তাহাতে ঠাকুর বলিতেন, "দর্শনের কথা কাহাকেও বল্‌তে নেই, তা হলে আর হয় না।" গোপালের মা তাহাতে এক দিবস বলেন, "কেন? সে সব ত তোমারি দর্শনের কথা, তোমায়ও বল্‌তে নেই?" ঠাকুর তাহাতে বলেন, "এখানকার দর্শন হলেও আমাকে বল্‌তে নেই।" গোপালের মা বলিলেন, "বটে?" তদবধি তিনি আর দর্শনাদির কথা কাহারও নিকট বড় একটা বলিতেন না। সরল উদার গোপালের মার শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিতেন তাহাতেই একেবারে পাকা বিশ্বাস হইত। আর সংশয়াত্মা আমরা? আমাদের ঠাকুরের কথা যাচাই করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া গেল—জীবনে পরিণত করিয়া ঐ সকলের ফলভোগে আনন্দ করা আর ঘটিয়া উঠিল না!

দর্শনের কথা অপরকে বলিতে নাই

এই সময় একদিন গোপালের মা ও শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ স্বামিজী) উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথের তখনও ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদে বেশ ঝোঁক। ঠাকুর, দেবতা—পৌত্তলিকতায় বিশেষ বিদ্বেষ; তবে এটা ধারণা হইয়াছে যে, পুতুল মূর্ত্তি-টুর্ত্তি অবলম্বন করিয়াও লোক নিরাকার সর্ব্বভূতস্থ ভগবানে কালে পৌঁছায়। ঠাকুরের রহস্যবোধটা খুব ছিল। একদিকে এই সর্ব্বগুণান্বিত সুপণ্ডিত মেধাবী বিচারপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত নরেন্দ্রনাথ এবং অপর দিকে গরীব কাঙ্গালী নামমাত্রাবলম্বনে

শ্রীভগবানের দর্শন ও কৃপা-প্রয়াসী সরলবিশ্বাসী গোপালের মা—যিনি কখনও লেখাপড়া জ্ঞানবিচারের ধার দিয়াও যান নাই—উভয়কে একত্র পাইয়া এক মজা বাধাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী যেরূপে বালগোপালরূপী ভগবানের দর্শন পান এবং তদবধি গোপাল যেভাবে তাঁহার সহিত লীলাবিলাস করিতেছেন, সে সমস্ত কথা শ্রীযুত নরেন্দ্রের নিকট গোপালের মাকে বলিতে বলিলেন। গোপালের মা ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাতে কিছু দোষ হবে না ত, গোপাল?" পরে ঐ বিষয়ে ঠাকুরের আশ্বাস পাইয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে গদ্গদস্বরে গোপালরূপী শ্রীভগবানের প্রথম দর্শনের পর হইতে দুই মাস পর্য্যন্ত যত লীলাবিলাসের কথা আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া গোপাল তাঁহার কোলে উঠিয়া কাঁধে মাথা রাখিয়া কামারহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত সারাপথ আসিয়াছিল, আর তাঁহার লালটুকটুকে পা দুখানি তাঁহার বুকের উপর ঝুলিতেছিল তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন; ঠাকুরের অঙ্গে কেমন মাঝে মাঝে প্রবেশ করিয়া আবার নির্গত হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল; শুইবার সময় বালিশ না পাইয়া বারবার খুঁৎখুঁৎ করিয়াছিল; রাঁধিবার কাঠ কুড়াইয়াছিল এবং খাইবার জন্য দৌরাত্ম্য করিয়াছিল—সকল কথা সবিস্তার বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে বুড়ী ভাবে বিভোর হইয়া গোপালরূপী শ্রীভগবানকে পুনরায় দর্শন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের বাহিরে কঠোর জ্ঞানবিচারের আবরণ থাকিলেও ভিতরটা চিরকালই ভক্তিপ্রেমে

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ঠাকুরের গোপালের মার পরিচয় করিয়া দেওয়া

ভরা ছিল—তিনি বুড়ীর ঐরূপ ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির কথা শুনিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। আবার বলিতে বলিতে বুড়ী বরাবর নরেন্দ্রনাথকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমরা পণ্ডিত বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙ্গালী কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—তোমরা বল, আমার এ সব ত মিথ্যা নয়?" নরেন্দ্রনাথও বরাবর বুড়ীকে আশ্বাস দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "না, মা, তুমি যা দেখেছ সে সব সত্য!" গোপালের মা ব্যাকুল হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার কারণ বোধ হয় তখন আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদা শ্রীগোপালের দর্শন পাইতেন না বলিয়া।

এই সময়ে ঠাকুর একদিন শ্রীযুত রাখালকে (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) সঙ্গে লইয়া কামারহাটিতে গোপালের মার নিকট আসিয়া উপস্থিত—বেলা দশটা আন্দাজ হইবে। কারণ গোপালের মার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল, নিজ হস্তে ভাল করিয়া রন্ধন করিয়া একদিন ঠাকুরকে খাওয়ান। বুড়ী ত ঠাকুরকে পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। যাহা যোগাড় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই জল-যোগের জন্য দিয়া জল খাওয়াইয়া বাবুদের বৈঠকখানার ঘরে ভাল করিয়া বিছানা পাতিয়া তাঁহাদের বসাইয়া নিজে কোমর বাঁধিয়া রাঁধিতে গেলেন। ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া নানা ভাল ভাল জিনিস যোগাড় করিয়াছিলেন—নানা প্রকার রান্না করিয়া মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে বেশ করিয়া খাওয়াইলেন এবং বিশ্রামের জন্য মেয়েমহলের দোতলায় দক্ষিণ দিকের ঘরখানিতে আপনার লেপখানি পাতিয়া, ধোপদস্ত চাদর একখানি তাহার উপর বিছাইয়া ভাল করিয়া

বিছানা করিয়া দিলেন। ঠাকুরও তাহাতে শয়ন করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শ্রীযুত রাখালও ঠাকুরের পার্শ্বেই শয়ন করিলেন, কারণ রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর ঠিক ঠিক নিজের সন্তানের মত দেখিতেন এবং তাঁহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহারও সর্ব্বদা করিতেন।

গোপালের মার নিমন্ত্রণে ঠাকুরের কামারহাটির বাগানে গমন ও তথায় প্রেতযোনি-দর্শন

এই সময়ে ঐ স্থানে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঠাকুর দেখেন। তাঁহার নিজের মুখ হইতে শোনা বলিয়াই তাঁহা আমরা এখানে বলিতে সাহসী হইতেছি, নতুবা ঐ কথা চাপিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। ঠাকুরের দিনে রাতে নিদ্রা অল্পই হইত, কাজেই তিনি স্থির হইয়া শুইয়া আছেন; আর রাখাল মহারাজ তাঁহার পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় ঠাকুর বলেন, "একটা দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলো; তারপর দেখি ঘরের কোণে দুটো মূর্ত্তি! বিট্‌কেল চেহারা, পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে নাড়িভুঁড়িগুলো ঝুলচে, আর মুখ, হাত, পা মেডিকেল কলেজে যেমন একবার মানুষের হাড়-গোড় সাজান দেখেছিলাম (মানব-অস্থিকঙ্কাল) ঠিক সেইরকম! তারা আমাকে অনুনয় করে বল্‌চে, আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদের (নিজেদের অবস্থার কথা মনে পড়ে বোধ হয়!) বড় কষ্ট হচ্ছে।' এদিকে তারা ঐরূপ কাকুতি মিনতি কচ্চে, ওদিকে রাখাল ঘুমুচ্চে। তাদের কষ্ট হচ্চে দেখে বেটুয়া ও গামছাখানা নিয়ে চলে আসবার জন্য উঠ্‌ছি এমন সময় রাখাল জেগে বলে উঠলো, 'ওগো, তুমি কোথায় যাও?' আমি তাকে

'পরে সব বলবো' বলে তার হাত ধরে নীচে নেমে এলাম ও বুড়ীকে (তার তখন খাওয়া হয়েছে মাত্র) বলে নৌকায় গিয়ে উঠলাম। তখন রাখালকে সব বলি—ঐখানে দুটো ভূত আছে! বাগানের পাশেই কামারহাটির কল—ঐ কলের সাহেবরা খানা খেয়ে হাড়গোড়গুলো যা ফেলে দেয় তাই শোঁকে (কারণ ঘ্রাণ লওয়াই উহাদের ভোজন করা!) ও ঐ ঘরে থাকে। বুড়ীকে ও কথার কিছু বল্লুম না—তাকে ঐ বাড়ীতেই সদা সর্ব্বক্ষণ একলা থাকতে হয়—ভয় পাবে।"

* * *

কলিকাতার যে রাস্তাটি বাগবাজারের গঙ্গার ধার দিয়া পুল পার হইয়া উত্তরমুখো বরাবর বরানগর-বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই রাস্তার উপরেই মতিঝিল বা কলিকাতার বিখ্যাত ধনী পরলোকগত মতিলাল শীলের উদ্যান-সম্মুখস্থ ঝিল। ঐ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে রাস্তায় মিলিয়াছে তাহার পূর্ব্বে রাস্তার অপর পারেই রাণী কাত্যায়নীর (লালা বাবুর পত্নী) জামাতা ৺কৃষ্ণগোপাল ঘোষের উদ্যানবাটী। ঐ বাগানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আটমাস কাল বাস করিয়া (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত) ভক্তদিগের স্থূলনেত্রের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হন। ঐ উদ্যানই তাঁহাদিগের নিকট 'কাশীপুরের বাগান' নামে অভিহিত হইয়া সকলের মনে কতই না হর্ষ-শোকের উদয় করিয়া দেয়! তোমরা

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের গোপালের মাকে ক্ষীর খাওয়ান ও বলা—তাঁহার মুখ দিয়া গোপাল খাইয়া থাকেন

বলিবে—ঠাকুর ত তখন রোগশয্যায়, তবে হর্ষ আবার কিসের? আপাতদৃষ্টিতে রোগশয্যা বটে, কিন্তু ঠাকুরের দেবশরীরে ঐ প্রকার রোগের বাহ্যিক বিকাশ তাঁহার ভক্তদিগকে বিভিন্ন-শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র সম্মিলিত করিয়া কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রণয়বন্ধনে যে গ্রথিত করিয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে! অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ, সন্ন্যাসী-গৃহী, জ্ঞানী-ভক্ত—এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ ভক্তদিগের ভিতর এখানেই স্পষ্টীকৃত হয়; আবার ইহারা সকলেই যে এক পরিবারের অন্তর্গত, এ ধারণার সুদৃঢ় ভিত্তি এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কত লোকেই যে এখানে আসিয়া ধর্ম্মালোক অপরোক্ষানুভব করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এখানেই শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথের সাধনায় নির্ব্বিকল্পসমাধি-অনুভব, এখানেই নরেন্দ্রপ্রমুখ দ্বাদশ জন বালক-ভক্তের ঠাকুরের শ্রীহস্ত হইতে গৈরিকবসন-লাভ, আবার এখানেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অপরাহ্নে (বেলা তিনটা হইতে চারটার ভিতর) উদ্যানপথে শেষদিন পরিভ্রমণ করিতে নামিয়া ভক্তবৃন্দের সকলকে দেখিয়া ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভাবাবস্থার উপস্থিত হয় এবং 'আমি আর তোমাদের কি বল্‌বো, তোমাদের চৈতন্য হোক্!' বলিয়া সকলের বক্ষ শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করেন। দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের নিত্য জনতা হইত। এখানেও শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঠাকুরের আহার্য্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি সেবায় নিত্য নিযুক্তা থাকিতেন এবং গোপালের মা প্রমুখ ঠাকুরের সকল স্ত্রী-ভক্তেরা তাঁহার নিকট আসিয়া ঠাকুরের ও তদীয় ভক্তগণের

সেবায় সহায়তা করিতেন—কেহ কেহ রাত্রিযাপনও করিয়া যাইতেন। অতএব কাশীপুর উদ্যানে ভক্তদিগের অপূর্ব্ব মেলার কথা অনুধাবন করিয়া আমাদের মনে হয়, জগদম্বা এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত করিবেন বলিয়াই ঠাকুরের দেবশরীরে ব্যাধির সঞ্চার করিয়াছিলেন। এখানে ঠাকুরের নিত্য নূতন লীলা ও নূতন নূতন ভক্তসকলের সমাগম দেখিয়া এবং ঠাকুরের সদানন্দমূর্ত্তি ও নিত্য অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি-প্রকাশ দর্শন করিয়া অনেক পুরাতন ভক্তেরও মনে হইয়াছিল, ঠাকুর লোকহিতের নিমিত্ত একটা রোগের ভান করিয়া রহিয়াছেন মাত্র—ইচ্ছামাত্রেই ঐ রোগ দূরীভূত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ হইবেন।

*　　　*　　　*

কাশীপুরের উদ্যান—ঠাকুরের বার্লি, ভার্মিসেলি, সুজি প্রভৃতি তরল পদার্থ আহারে দিন কাটিতেছে! একদিন তিনি পালোদেওয়া ক্ষীর—যেমন কলিকাতায় নিমন্ত্রণবাটীতে খাইতে পাওয়া যায়—খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেহই তাহাতে ওজর আপত্তি করিল না, কারণ দুধে সিদ্ধ সুজি বা বার্লি যখন খাওয়া চলিতেছে, তখন পালোমিশ্রিত ক্ষীর একটু খাইলে আর অসুখ অধিক কি বাড়িবে? ডাক্তারেরাও অমত করিলেন না। অতএব স্থির হইল—শ্রীযুত যোগীন্দ্র (যোগানন্দ স্বামিজী) আগামী কাল ভোরে কলিকাতা গিয়া ঐরূপ ক্ষীর একখানা কিনিয়া আনিবেন।

যোগীন্দ্র বা যোগেন ঠিক সময়ে রওনা হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, 'বাজারের ক্ষীরে পালো ছাড়া আরো কত কি ভেজাল মিশান থাকে—ঠাকুরের খেলে অসুখ বাড়বে না ত?'

ভক্তদের সকলেই ঠাকুরকে প্রাণের প্রাণস্বরূপে দেখিত, কাজেই সকলের মনেই ঠাকুরের অসুখ হওয়া অবধি ঐ এক চিন্তাই সর্ব্বদা থাকিত। যোগেনের সেজন্যই নিশ্চয় ঐরূপ চিন্তার উদয় হইল। আবার ভাবিলেন—কিন্তু ঠাকুরকে ত ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসেন নাই, অতএব কোন ভক্তের দ্বারা ঐরূপ ক্ষীর তৈয়ার করিয়া লইয়া যাইলে তিনি ত বিরক্ত হইবেন না? সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে যোগানন্দ বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে পৌছিলেন এবং আসার কারণ জিজ্ঞাসায় সকল কথা বলিলেন। সেখানে ভক্তেরা সকলে বলিলেন, 'বাজারের ক্ষীর কেন? আমরাই পালো দিয়ে ক্ষীর করে দিচ্চি; কিন্তু এ বেলা ত নিয়ে যাওয়া হবে না, কারণ করতে দেরী হবে। অতএব তুমি এ বেলা এখানে খাওয়া দাওয়া কর, ইতিমধ্যে ক্ষীর তৈয়ার হয়ে যাবে। বেলা তিনটার সময় নিয়ে যেও।' যোগেনও ঐ কথায় সম্মত হইয়া ঐরূপ করিলেন এবং বেলা প্রায় চারিটার সময় ক্ষীর লইয়া কাশীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধ্যাহ্নেই ক্ষীর খাইবেন বলিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে যাহা খাইতেন তাহাই খাইলেন। পরে যোগেন আসিয়া পৌছিলে সকল কথা শুনিয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়া যোগেনকে বলিলেন, "তোকে বাজার থেকে কিনে আনতে বলা হল, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছা, তুই কেন ভক্তদের বাড়ী গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এইরূপে ক্ষীর নিয়ে এলি? তারপর ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক, ওকি খাওয়া চলবে—ও আমি খাব না।" বাস্তবিকই তিনি তাহা স্পর্শও করিলেন না—শ্রীশ্রীমাকে উহা

সমস্ত গোপালের মাকে খাওয়াইতে বলিয়া বলিলেন, "ভক্তের দেওয়া জিনিস, ওর ভেতর গোপাল আছে, ও খেলেই আমার খাওয়া হবে।"

*　　　*　　　*

ঠাকুরের অদর্শন হইলে গোপালের মার আর অশান্তির সীমা রহিল না। অনেকদিন আর কামারহাটি ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। একলা নির্জ্জনেই থাকিতেন। পরে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ঠাকুরের দর্শনাদি পাইয়া সে ভাবটার শান্তি হইল। ঠাকুরের অদর্শনের পরেও গোপালের মার ঐরূপ দর্শনাদির কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। তন্মধ্যে একবার গঙ্গার অপর পারে মাহেশে রথযাত্রা দেখিতে যাইয়া সর্ব্বভূতে শ্রীগোপালের দর্শন পাইয়া তাঁহার বিশেষ আনন্দ হয়। তিনি বলিতেন—তখন রথ, রথের উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব, যাহারা রথ টানিতেছে সেই অপার জনসংঘ সকলই দেখেন তাঁহার গোপাল—ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র! এইরূপে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের দর্শনাভাস পাইয়া ভাবে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। জনৈকা স্ত্রী-বন্ধুর নিকট তিনি নিজে উহা বলিবার সময় বলিয়াছিলেন, "তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না—নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম।"

গোপালের মার বিশ্বরূপ-দর্শন

এখন হইতে প্রাণে কিছুমাত্র অশান্তি হইলেই তিনি বরানগর মঠে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের নিকট আসিতেন এবং আসিলেই শান্তি পাইতেন। যেদিন তিনি মঠে আসিতেন সেদিন সন্ন্যাসী ভক্তেরা তাঁহাকেই ঠাকুরকে ভোগ

বরানগর মঠে গোপালের মা

দিয়া খাওয়াইতে অনুরোধ করিতেন। গোপালের মাও সানন্দে দুই একখানা তরকারী নিজ হাতে রাঁধিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতেন। মঠ যখন আলমবাজারে ও পরে গঙ্গার অপর পারে নীলাম্বর বাবুর বাটীতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখনও গোপালের মা এইরূপে ঐ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন থাকিয়া কখন কখন আনন্দ করিতেন—কখনও এক আধ দিন রাত্রিযাপনও করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য মহিলাগণ-সঙ্গে গোপালের মা

শ্রীবিবেকানন্দ স্বামিজীর বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর সারা [১] (Mrs. Sara C. Bull), জয়া [১] (Miss J. MacLeod) ও নিবেদিতা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁহারা একদিন গোপালের মাকে কামারহাটিতে দর্শন করিতে যান এবং তাঁহার কথায় ও আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হন। আমাদের মনে আছে, গোপালের মা সেদিন তাঁহার গোপালকে তাঁহাদের ভিতরেও অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করেন, আপনার বিছানায় সাদরে বসাইয়া মুড়ি, নারিকেল-লাড়ু প্রভৃতি যাহা ঘরে ছিল তাহা খাইতে দেন ও জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার দর্শনাদির কথা তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বলেন। তাঁহারাও উহা সানন্দে ভক্ষণ ও তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং ঐ মুড়ির কিছু আমেরিকায় লইয়া যাইবেন বলিয়া চাহিয়া লন।

* * *

গোপালের মার অদ্ভুত জীবন-কথা শুনিয়া সিষ্টার নিবেদিতা

১ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ইঁহাদের ঐ নামে ডাকিতেন এবং ইঁহাদের সরলতা, ভক্তি, বিশ্বাসাদি দেখিয়া বিশেষ প্রীতা হইয়াছিলেন।

এতই মোহিত হন যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন গোপালের মার শরীর অসুস্থ ও বিশেষ অপটু হওয়ায় তাঁহাকে বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে আনা হয়, তখন তাঁহাকে বাগবাজারস্থ নিজ ভবনে (১৭নং বসুপাড়া) লইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোপালের মা-ও তাঁহার আগ্রহে স্বীকৃতা হইয়া তথায় গমন করেন; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ধীরে ধীরে সকল বিষয়েরই দ্বিধা শ্রীগোপালজী দূরীভূত করিয়া দেন। উহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ একদিন মা কালীর প্রসাদী পাঁঠা এক বাটী খাইয়া হস্ত ধৌত করিতে যাইলে ঠাকুর জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে ঐ স্থান পরিষ্কার করিতে বলেন। গোপালের মা তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুরের ঐ কথা শুনিবামাত্র তিনি (গোপালের মা) ঐ সকল হাড়গোড় উচ্ছিষ্টাদি তৎক্ষণাৎ নিজহস্তে সরাইয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া আনন্দে পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী-ভক্তকে বলেন, "দেখ, দেখ, দিন দিন কি উদার হয়ে যাচ্ছে!"

সিষ্টার নিবেদিতার ভবনে গোপালের মা

সিষ্টার নিবেদিতার ভবনে এখন হইতে গোপালের মা বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর মানস-কন্যা নিবেদিতাও মাতৃ-নির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত নিকটবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে করিয়া দেওয়া হইল। আহারের সময় গোপালের মা তথায় যাইয়া দুইটি ভাত খাইয়া আসিতেন এবং রাত্রে লুচি ইত্যাদি ঐ ব্রাহ্মণ-পরিবারের কেহ স্বয়ং

গোপালের মার শরীরত্যাগ

গোপালের মার ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেন। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর বাস করিয়া গোপালের মা গঙ্গাগর্ভে শরীরত্যাগ করেন। তাঁহাকে তীরস্থ করিবার সময় নিবেদিতা পুষ্প, চন্দন, মাল্যাদি দিয়া তাঁহার শয্যাদি স্বহস্তে সুন্দরভাবে ঢাকিয়া সাজাইয়া দেন, একদল কীর্ত্তনীয়া আনয়ন করেন এবং স্বয়ং অনাবৃতপদে সাশ্রুনয়নে সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা-তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া যে দুই দিন গঙ্গাতীরে গোপালের মা জীবিতা ছিলেন, সে দুইদিন তথায়ই রাত্রিযাপন করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই অথবা সন ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উদীয়মান সূর্য্যের রক্তিমাভায় যখন পূর্ব্বগগন রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে এবং নীলাম্বরতলে দুই-চারিটি ক্ষীণপ্রভ তারকা ক্ষীণজ্যোতিঃ চক্ষুর ন্যায় পৃথিবীপানে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, যখন শৈলসুতা ভাগীরথী জোয়ারে পূর্ণা হইয়া ধবল তরঙ্গে দুই কূল প্লাবিত করিয়া মৃদু মধুর নাদে প্রবাহিতা, সেই সময়ে গোপালের মার শরীর সেই তরঙ্গে অর্দ্ধনিমজ্জিতাবস্থায় স্থাপিত করা হইল এবং তাঁহার পূত প্রাণপঙ্ক শ্রীভগবানের অভয় পদে মিলিত হইল ও তিনি অভয়ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

আত্মীয়েরা কেহ নিকটে না থাকায় বেলুড় মঠের জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীই গোপালের মার মৃত শরীরের সৎকার করিয়া দ্বাদশ দিন নিয়ম রক্ষা করিলেন।

গোপালের মার কথার উপসংহার

শোকসন্তপ্তহৃদয়া সিষ্টার নিবেদিতা ঐ দ্বাদশ দিন গত হইলে গোপালের মার পরিচিত পল্লীস্থ অনেকগুলি স্ত্রী-লোককে নিজ স্কুলবাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া কীর্ত্তন ও উৎসবাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

গোপালের মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে ছবিখানি এতদিন পূজা করিয়াছিলেন, তাহা বেলুড় মঠে ঠাকুরঘরে রাখিবার জন্য দিয়া যান এবং ঐ ঠাকুরসেবার জন্য দুই শত টাকাও ঐ সঙ্গে দিয়া গিয়াছিলেন।

শরীরত্যাগের দশ বার বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সর্ব্বদা গৈরিক বসনই ধারণ করিতেন।

পরিশিষ্ট

ঠাকুরের মানুষভাব

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সন ১৩১১ সালের ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে আহূত সভায় পঠিত প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগবিভূতি-সকলের কথা শুনিয়াই সাধারণ মানবের তাঁহার প্রতি ভক্তি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবভাব সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন; এমন কি, অনেকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরের কারণ অনুসন্ধান করিলে তাঁহার অমানুষ যোগ-বিভূতিসকলই উহার মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন তুমি তাঁহাকে মান?—এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুদূরের ঘটনাবলী ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসিয়া দেখিতে পাইতেন, স্পর্শ করিয়া কঠিন কঠিন শারীরিক ব্যাধিসমূহ কখন কখন আরাম করিয়াছেন, দেবতাদের সহিতও তাঁহার সর্ব্বদা বাক্যালাপ হইত এবং তাঁহার বাক্য এতদূর অমোঘ ছিল যে মুখপদ্ম হইতে কোন অসম্ভব কথা বাহির হইলেও বহিঃপ্রকৃতির ঘটনাবলীও ঠিক সেইভাবে পরিবর্ত্তিত এবং নিয়মিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাজদ্বারে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তাঁহার কৃপাকণা ও আশীর্ব্বাদ-লাভে আসন্ন

মৃত্যু হইতে রক্ষিত এবং বিশেষ সম্মানিত পর্য্যন্ত হইয়াছিল ; অথবা কেবলমাত্র রক্তকুসুমোৎপাদী বৃক্ষে শ্বেত কুসুমেরও আবির্ভাব হইয়াছিল, ইত্যাদি।

অথবা বলেন যে, তিনি মনের কথা বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রত্যেক মানবশরীরের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মনের চিন্তা, গঠন এবং প্রবৃত্তিসমূহ পর্য্যন্তও দেখিতে পাইত, তাঁহার কোমল করস্পর্শমাত্রেই চঞ্চলচিত্ত ভক্তের চক্ষে ইষ্টমূর্ত্ত্যাদির আবির্ভাব হইত অথবা গভীর ধ্যান এবং অধিকারিবিশেষে নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বার পর্য্যন্ত উন্মুক্ত হইত।

কেহ কেহ আবার বলেন যে, কেন তাঁহাকে মানি, তাহা আমি জানি না ; কি এক অদ্ভুত জ্ঞান এবং প্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ যে তাঁহাতে দেখিয়াছি, তাহা জীবিত বা পরিচিত মনুষ্যকুলের ত কথাই নাই ; বেদপুরাণাদিগ্রন্থনিবদ্ধ জগৎপূজ্য আদর্শসমূহেও দেখিতে পাই না !—উহারাও তাঁহার পার্শ্বে আমার চক্ষে হীনজ্যোতিঃ হইয়া যায়। এটা আমার মনের ভ্রম কি-না তাহা বলিতে অক্ষম, কিন্তু আমার চক্ষু সেই উজ্জ্বল প্রভায় ঝলসিয়া গিয়াছে এবং মন তাঁহার প্রেমে চিরকালের মত মগ্ন হইয়াছে, ফিরাইবার চেষ্টা করিলেও ফিরে না, বুঝাইলেও বুঝে না ; জ্ঞান তর্ক যুক্তি যেন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এইটুকু মাত্র আমি বলিতে সক্ষম—

"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে ;
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে ?

ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত
জপ তপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে,
আছে মাত্র জানাজানি-আশ,
তাও প্রভু কর পার।" —স্বামী বিবেকানন্দ

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে অপর মানব-সাধারণ স্থূল বাহ্যিক বিভূতি অথবা সূক্ষ্ম মানসিক বিভূতির জন্যই তাঁহাতে ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া থাকে। স্থূলদৃষ্টি মানব মনে করে যে, তাঁহাকে মানিলে তাহারও রোগাদি আরোগ্য হইবে, অথবা তাহারও সঙ্কট বিপদাদির সময়ে বাহ্যিক ঘটনাসমূহ তাহার অনুকূলে নিয়মিত হইবে। স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার মনের ভিতর যে এই স্বার্থপরতার স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না।

দ্বিতীয়শ্রেণীমধ্যগত কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মদৃষ্টি মানবও তাঁহার কৃপায় দূরদর্শনাদি বিভূতি লাভ করিবে, তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া গোলকাদি স্থানে বাস করিবে অথবা আরও কিঞ্চিৎ সমুন্নত-দৃষ্টি হইলে সমাধিস্থ হইয়া জন্ম জরাদি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এইজন্যই তাঁহাকে মানিয়া থাকে। স্বকীয় প্রয়োজনসিদ্ধি যে এই বিশ্বাসেরও মূলে বর্ত্তমান, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

সত্য হইলেও ঐ সকলের আলোচনা আমাদের

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ দৈববিভূতিনিচয়ের ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেও অথবা নিজ নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রয়োজনরূপ সকাম ভক্তিও যে তাঁহাতে অর্পিত হইয়া অশেষ মঙ্গলের কারণ হয়, এ বিষয়ে সন্দিহান না হইলেও

উদ্দেশ্য নয়, কারণ সকাম ভক্তি উন্নতির হানিকর

তত্তদ্বিষয়-আলোচনা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তাঁহার মনুষ্যভাবের চিত্র কথঞ্চিৎ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করাই অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য।

সকাম ভক্তি—নিজের কোনরূপ অভাবপূরণের জন্য ভক্তি, ভক্তকে সত্যদৃষ্টির উচ্চ সোপানে উঠিতে দেয় না। স্বার্থপরতা সর্ব্বকালে ভয়ই প্রসব করিয়া থাকে এবং ঐ ভয়ই আবার মানবকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলে। স্বার্থলাভ আবার মানবমনে অহঙ্কার এবং কখন কখন আলস্যবৃদ্ধি করিয়া তাহার চক্ষু আবৃত করে এবং তজ্জন্য সে যথার্থ সত্যদর্শনে সমর্থ হয় না। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর ভিতর যাহাতে ঐ দোষ প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ধ্যানাদির অভ্যাসে দূরদর্শনাদি কোনরূপ মানসিক শক্তির নূতন বিকাশ হইয়াছে জানিলেই পাছে ঐ ভক্তের মনে অহঙ্কার প্রবেশলাভ করিয়া তাহাকে ভগবান্-লাভরূপ উদ্দেশ্যহারা করে, সেজন্য তিনি তাহাকে কিছুকাল ধ্যানাদি করিতে নিষেধ করিতেন, ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঐ প্রকার বিভূতিসম্পন্ন হওয়াই যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়, ইহা তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু দুর্ব্বল মানব নিজের লাভ-লোকসান না খতাইয়া কিছু করিতে বা কাহাকেও মানিতে অগ্রসর হয় না এবং ত্যাগের জলন্ত মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন্ হইতে ত্যাগ শিক্ষা না করিয়া নিজের ভোগসিদ্ধির জন্যই ঐ মহৎ জীবন আশ্রয় করিয়া থাকে। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার অলৌকিক তপস্যা, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্যানুরাগ, তাঁহার বালকের ন্যায় সরলতা এবং নির্ভরতা—এ সকল যেন তাহার ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল, এইরূপ মনে করে। আমাদের মনুষ্যত্বের অভাবই ঐ প্রকার হইবার কারণ এবং সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনুষ্যভাবের আলোচনাই আমাদের অশেষ কল্যাণকর।

যথার্থ ভক্তি ভক্তকে উপাস্যের অনুরূপ করিবে

ভক্তি যৎকিঞ্চিৎও যথার্থ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তকে উপাস্যের অনুরূপ করিয়া তুলে। সর্ব্বজাতির সর্ব্বধর্ম্মগ্রন্থেই একথা প্রসিদ্ধ। ক্রুশারূঢ় ঈশার মূর্ত্তিতে সমাধিস্থ-মন ভক্তের হস্তপদ হইতে রুধির-নির্গমন, শ্রীমতীর বিরহদুঃখানুভব-নিমগ্নমন শ্রীচৈতন্যে বিষম গাত্রদাহ এবং কখন বা মৃতবৎ অবস্থাদি, ধ্যানস্তিমিত বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে বৌদ্ধ ভক্তের বহুকালব্যাপী নিশ্চেষ্টাবস্থান প্রভৃতি ঘটনাই ইহার নিদর্শন। প্রত্যক্ষও দেখিয়াছি, মনুষ্য-বিশেষে প্রযুক্ত ভালবাসা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানুষকে তাহার প্রেমাস্পদের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছে; তাহার বাহ্যিক হাবভাব চালচলনাদি এবং তাহার মানসিক চিন্তাপ্রণালীও সমূলে পরিবর্ত্তিত হইয়া তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তিও তদ্রূপ যদি আমাদের জীবনকে দিন দিন তাঁহার জীবনের কথঞ্চিৎ অনুরূপ না করিয়া তুলে, তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ ভক্তি এবং ভালবাসা তত্তন্নামের যোগ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি আমরা সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হইতে সক্ষম? একের সম্পূর্ণরূপে অপরের ন্যায় হওয়া জগতে কখনও কি দেখা গিয়াছে? উত্তরে আমরা বলি, সম্পূর্ণ একরূপ না হইলেও এক ছাঁচে গঠিত পদার্থনিচয়ের ন্যায় নিশ্চিত হইতে পারে। ধর্ম্মজগতে প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচসদৃশ। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরাও সেই সেই ছাঁচে গঠিত হইয়া

অদ্যাবধি সেইসকল বিভিন্ন ছাঁচের রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মানুষ অল্পশক্তি; ঐ সকল ছাঁচের কোন একটির মত হইতে তাহার আজীবন চেষ্টাতেও কুলায় না। ভাগ্যক্রমে কেহ কখন কোন একটি ছাঁচের যথার্থ অনুরূপ হইলে আমরা তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। সিদ্ধ মানবের চালচলন, ভাষা, চিন্তা প্রভৃতি শারীরিক এবং মানসিক সকল বৃত্তিই সেই ছাঁচপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের সদৃশ হইয়া থাকে। সেই মহাপুরুষের জীবনে যে মহাশক্তির প্রথম অভ্যুদয় দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইয়াছিল, তাঁহার দেহমন সেই শক্তির কথঞ্চিৎ ধারণ, সংরক্ষণ এবং সঞ্চারের পূর্ণাবয়ব যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ-প্রণোদিত ধর্ম্মশক্তি-নিচয়ের সংরক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন জাতি আবহমানকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

অবতারপুরুষের জীবনালোচনায় কোন্ কোন্ অপূর্ব্ব বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়

ধর্ম্মজগতে যে সকল মহাপুরুষ অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ছাঁচের জীবন দেখাইয়া যান, তাঁহাদিগকেই জগৎ অদ্যাবধি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। অবতার ধর্ম্মজগতে নূতন মত, নূতন পথ আবিষ্কার করেন, *স্পর্শমাত্রেই অপরে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করেন;* তাঁহার দৃষ্টি কখনও অনিত্য সংসারে কামকাঞ্চনের কোলাহলের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তাঁহার জীবনপর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অপরকে পথ দেখাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিজের ভোগসাধন বা মুক্তিলাভও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হয় না। কিন্তু অপরের দুঃখে সহানুভূতি, অপরের উপর গভীর প্রেমই তাঁহাকে কার্য্যে

প্রেরণ করিয়া অপরের দুঃখনিবারণের পথ-আবিষ্করণের হেতু হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেবকান্তি যতদিন না দেখিয়াছিলাম, ততদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারখ্যাত মহাপুরুষগণের জীবনবেদ পাঠ করিতে একপ্রকার অসমর্থ ছিলাম। তাঁহাদের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী দলপুষ্টির জন্য শিষ্য-পরম্পরারচিত প্ররোচনাবাক্য বলিয়া মনে হইত; অবতার সভ্যজগতের বিশ্বাসবহির্ভূত কিস্তূতকিমাকার কাল্পনিক প্রাণি-বিশেষ বলিয়াই অনুমিত হইত। অথবা ঈশ্বরের অবতার হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও সেইসকল অবতারমূর্ত্তিতে যে আমাদেরই ন্যায় মনুষ্যভাবসকল বর্ত্তমান, একথা বিশ্বাস হইত না। তাঁহাদের শরীরে যে আমাদের মত রোগাদি হইতে পারে, তাঁহাদের মনে যে আমাদেরই মত হর্ষশোকাদি বিদ্যমান, তাঁহাদিগের ভিতরে যে আমাদেরই ন্যায় প্রবৃত্তিনিচয়ের দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতে পারে, তাহা ধারণা হইত না! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র স্পর্শেই সে বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছে। অবতারশরীরে দেব এবং মানুষ-ভাবের অদ্ভুত সম্মিলনের কথা আমরা সকলেই পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার পূর্ব্বে কোন মানবে যে বালকত্ব এবং কঠোর মনুষ্যত্বের একত্র সামঞ্জস্যে অবস্থান হইতে পারে, এ কথা ভাবি নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় বালকস্বভাবই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল। অজ্ঞান বালক সকলেরই প্রেমের আস্পদ এবং সকলেই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতঃ ত্রস্ত হইয়া থাকে।

পূর্ণবয়স্ক হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া লোকের মনে ঐরূপ ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়া তাঁহাদিগকে মোহিত ও আকৃষ্ট করিত। কথাটি কিছু সত্য হইলেও আমাদের ধারণা—পরমহংসদেবের শুদ্ধ বালকভাবেই যে জনসাধারণ আকৃষ্ট হইত তাহা নহে; কিন্তু হর্ষ ও প্রীতির সহিত দর্শকের মনে তৎসময়ে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় দেখিয়া মনে হয়, কুসুমকোমল বালক-পরিচ্ছদে আবৃত ভিতরের বজ্রকঠোর মনুষ্যত্বই ঐ আকর্ষণের কারণ। ভারতের যশস্বী কবি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের লোকোত্তর চরিত্র-বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

সেই কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধেও প্রতি পদে বলিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকভাব এক অতি অভিনব পদার্থ। অসীম সরলতা, অপার বিশ্বাস, অশেষ সত্যানুরাগ সে বালকের মনে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকিলেও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানব তাহাতে কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা এবং বিষয়বুদ্ধিরাহিত্যেরই পরিচয় পাইত। সকল লোকের কথাতেই তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস, বিশেষতঃ ধর্ম্মলিঙ্গধারীদের কথায়। দেশের এবং নিজ গ্রামের প্রচলিত ভাবসকলও তাঁহাতে এই অদ্ভুত বালকত্ব পরিস্ফুট করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

শস্যশ্যামলাঙ্গে হরিৎসমুদ্রপ্রতীকাশ অথবা তদভাবে ধূসর মৃত্তিকাসমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত বিস্তীর্ণ বহুযোজনব্যাপী প্রান্তর—তন্মধ্যে বংশ, বট, খর্জ্জুর, আম্র, অশ্বত্থাদি বৃক্ষাচ্ছাদিত কৃষককুলের মৃত্তিকানির্ম্মিত সুপরিচ্ছন্ন দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় শোভমান

পর্ণকুটীররাজি, সুনীল পত্রাচ্ছাদিত বৃহৎ তালবৃক্ষরাজিমণ্ডলিত ভ্রমরমুখরিত পদ্মসমাচ্ছন্ন হালদারপুকুরাদিনামাখ্যাত বৃহৎ সরোবরনিচয়, 'বুড়োশিবাদি'নামা প্রথিতযশ দেবাধিষ্ঠিত ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগৃহ, অদূরে পুরাতন গড়মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন স্তূপরাজি; প্রান্তে ও পার্শ্বে অস্থিসমাকুল বহুপ্রাচীন শ্মশান, তৃণাচ্ছাদিত গোচরভূমি, নিবিড় আম্রকানন, বক্রসঞ্চরণশীল ভূতির খাল খ্যাত ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী এবং সমগ্র গ্রামের অর্দ্ধেকেরও অধিক বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান বর্দ্ধমান হইতে পুরীধামে যাইবার যাত্রিসমাকুল সুদীর্ঘ রাজপথ—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম

শ্রীচৈতন্য এবং তৎশিষ্যগণ-প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মই এখানে প্রবল। কৃষাণ প্রজাকুল তাহাদের পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে অথবা দিনান্তে কার্য্যাবসানে তাঁহাদেরই রচিত পদাবলী-গানে আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রমাপনোদন করে। সরল পদ্মময় বিশ্বাসই এ ধর্ম্মের মূলে এবং জীবন-সংগ্রামের কঠোর তরঙ্গসমূহ হইতে সুদূরে বর্ত্তমান এই গ্রামের ন্যায় বালকের হৃদয়ও ঐরূপ বিশ্বাস এবং ধর্ম্মের বিশেষ অনুকূলভূমি। বালক রামকৃষ্ণের বালকত্ব কিন্তু এখানেও অদ্ভুত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তাহার বিচিত্র কার্য্যসকলে না হইলেও, উদ্দেশ্যের গভীরতা এবং একতানতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইত। 'রামনামে মানব নির্ম্মল হয়'—কথকমুখে একথা শুনিয়া কখন বা এ বালক দুঃখিতচিত্তে জল্পনা করিত, তবে কথক ঠাকুরের অদ্যাবধি শৌচের আবশ্যক হয় কেন? কখন বা একবারমাত্র

বালক রামকৃষ্ণের বিচিত্র কার্য্যকলাপ

যাত্রাদি শুনিয়া তাহার সকল অঙ্গ আয়ত্ত করিয়া বয়স্যগণসঙ্গে আম্রকাননমধ্যে উহার পুনরভিনয় করিত। গ্রামান্তরগন্তুকাম পথিক বালকের সে অদ্ভুত অভিনয় ও সঙ্গীত-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গন্তব্য পথে যাইতে ভুলিয়া যাইত! প্রতিমাগঠন, দেবচিত্রাদি লিখন, অপরের হাবভাব অনুকরণ, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আয়ত্তীকরণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গভীর অনুভবে এ বালকের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। তাঁহার শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, কৃষ্ণনীরদাবৃত গগনে উড্ডীন ধবল বলাকারাজি দেখিয়াই তিনি প্রথম সমাধিস্থ হন; তাঁহার বয়স তখন ছয় সাত বৎসর মাত্র ছিল।

যখন যে ভাব হৃদয়ে আসিত, সেই ভাবে তন্ময় হওয়াই এ বালক-মনের বিশেষ লক্ষণ ছিল। প্রতিবেশীরা এখনও এক বণিকের গৃহপ্রাঙ্গণ নির্দ্দেশ করিয়া গল্প করে, কিরূপে একদিন ঐ স্থানে হরপার্ব্বতী-সংবাদের অভিনয়কালে অভিনেতা সহসা পীড়িত হইয়া অপারগ হইলে রামকৃষ্ণকে সকলে অনুরোধ করিয়া শিব সাজাইয়া অভিনয় করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি ঐ সাজে সজ্জিত হইয়া এমনই ঐ ভাবে মগ্ন হইয়াছিলেন যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞামাত্র ছিল না! এই সকল ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যায় যে, বালক হইলেও বালকের চিত্তচাঞ্চল্য তাঁহাতে আশ্রয় করে নাই। দর্শন বা শ্রবণ দ্বারা কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেই তাহার ছবি তাঁহার মনে এরূপ সুদৃঢ় অঙ্কিত হইত যে, ঐ প্রেরণায় উহার সম্পূর্ণ আয়ত্তীকরণ এবং অভিনবরূপে পুনঃ প্রকাশ না করিয়া স্থির থাকা এ বালকের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

গ্রন্থাদি না পড়িলেও বাহ্যজগতের সংঘর্ষে এ বালকের ইন্দ্রিয়নিচয় স্বল্পকালেই সমুচিত প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। যাহা সত্য, প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা তাহা বুঝিয়া লইব—যাহা শিখিব তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিব এবং অসত্য না হইলে জগতের কোন বস্তুই ঘৃণার চক্ষে দেখিব না, ইহাই মনের মূল মন্ত্র ছিল। যৌবনের প্রথম উদ্গম—অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন বালক রামকৃষ্ণ শিক্ষার জন্য টোলে প্রেরিত হইলেন কিন্তু বালকত্বের সাঙ্গ হইল না। সে ভাবিল, এ কঠোর অধ্যয়ন, রাত্রিজাগরণ, টীকাকারের চর্ব্বিতচর্ব্বণ প্রভৃতি কিসের জন্য? ইহাতে কি বস্তুলাভ হইবে? মন ঐ প্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণ ফল টোলের আচার্য্যকে দেখাইয়া বলিল, 'তুমিও ঐরূপ সরল শব্দনিচয়ের কুটিল অর্থকরণে সুপটু হইবে, তুমিও উহার ন্যায় ধনী ব্যক্তির তোষামোদাদিতে বিদায়াদি সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে; তুমিও ঐরূপ শাস্ত্রনিবদ্ধ সত্যসকল পাঠ করিবে এবং করাইবে, কিন্তু চন্দনভারবাহী খরের ন্যায় তাহাদিগের অনুভব জীবনে করিতে পারিবে না।' বিচারবুদ্ধি বলিল, 'এ চালকলা-বাঁধা বিদ্যায় প্রয়োজন নাই। যাহাতে মানবজীবনের গূঢ়রহস্যসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ সত্য অনুভব করিতে পার, সেই পরাবিদ্যার সন্ধান কর।' রামকৃষ্ণ পাঠ ছাড়িলেন এবং আনন্দপ্রতিমা দেবীমূর্ত্তির পূজাকার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু এখানেও শান্তি কোথায়? মন বলিল, 'সত্যই কি ইনি আনন্দঘনমূর্ত্তি জগজ্জননী অথবা পাষাণ প্রতিমামাত্র? সত্যই কি ইনি ভক্তিসমাহৃত পত্রপুষ্পফলমূলাদি গ্রহণ করেন? সত্যই কি মানব ইঁহার কৃপাকটাক্ষলাভে সর্ব্বপ্রকার-

তাঁহার সত্যান্বেষণ

বন্ধনমুক্ত হইয়া দিব্য দর্শন লাভ করে? অথবা মানবমনের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কাররাজি কল্পনাসহায়ে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া ছায়াময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং মানব ঐরূপে আপনি আবহমানকাল ধরিয়া প্রতারিত হইয়া আসিতেছে?' প্রাণ এ সন্দেহ-নিরসনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং তীব্র বৈরাগ্যের অঙ্কুর বালকমনে ধীরে ধীরে উদগত হইল। বিবাহ হইল, কিন্তু ঐ প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া সাংসারিক সুখভোগ তাঁহার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। নিত্য নানা উপায়ে মন ঐ প্রশ্নসমাধানেই নিযুক্ত রহিল এবং বিবাহ, সংসার বিষয়বুদ্ধি, উপার্জ্জন, ভোগসুখ এবং অত্যাবশ্যকীয় আহার-বিহারাদি পর্য্যন্ত নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। সুদূর কামারপুকুরে যে বালকত্ব বিষয়বুদ্ধির পরিহাসের বিষয় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বালকত্বই দক্ষিণেশ্বর দেবমন্দিরে নিতান্ত প্রস্ফুটিত হইয়া সেই বিষয়বুদ্ধির আরও অধিক উপেক্ষণীয় বাতুলত্ব বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু এ বাতুলতায় উদ্দেশ্যহীনতা বা অসম্বদ্ধতা কোথায়? ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিব, স্পর্শ করিব, পূর্ণভাবে আস্বাদন করিব—ইহাই কি ইহার বিশেষ লক্ষণ নহে? যে লৌহময়ী ধারণা, অপরাজিত অধ্যবসায় এবং উদ্দেশ্যের ঋজুতা ও একতানতা কামারপুকুরে বালক রামকৃষ্ণের বালকত্বে অভিনব শ্রী প্রদান করিয়াছিল, তাহাই এখন আপাতদৃষ্টে বাতুল রামকৃষ্ণের বাতুলত্বকে এক অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার করিয়া তুলিল।

দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রবল মানসঝটিকা বহিতে লাগিল! অন্তঃ-প্রকৃতির সে ভীষণ সংগ্রামে অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতির তুমুল

তরঙ্গাঘাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনতরীর অস্তিত্বও তখন সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বীরহৃদয় আসন্ন-মৃত্যুসম্মুখেও কম্পিত হইল না, গন্তব্যপথ ছাড়িল না—ভগবদনুরাগ ও বিশ্বাস সহায়ে ধীর স্থিরভাবে নিজ পথে অগ্রসর হইল। সংসারের কামকাঞ্চনময় কোলাহল এবং লোকে যাহাকে ভালমন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্যাদি বলে—সে সকল কতদূরে পড়িয়া রহিল—ভাবের প্রবল তরঙ্গ উজানপথে ঊর্দ্ধে ছুটিতে লাগিল! সে প্রবল তপস্যায়, সে অনন্ত ভাবরাশির গভীর উচ্ছ্বাসে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবলিষ্ঠ দেহ ও মন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নূতন আকার, নূতন শ্রী ধারণ করিল! এইরূপে মহাসত্য, মহাভাব, মহাশক্তি-ধারণ ও সঞ্চারের সম্পূর্ণাবয়ব যন্ত্র গঠিত হইল।

ঐ সত্যান্বেষণের ফল

হে মানব! শ্রীরামকৃষ্ণের এ অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? তোমার স্থূল দৃষ্টিতে পরিমাণ ও সংখ্যাধিক্য লইয়াই পদার্থের গুরুত্ব বা লঘুত্ব গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে সূক্ষ্ম শক্তি স্বার্থগন্ধ পর্য্যন্ত বিদূরিত করিয়া অহঙ্কারকে সমূলে উৎপাটিত করে, যাহার বলে ইচ্ছা করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র স্বার্থচেষ্টা শরীর-মনের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে, সে শক্তিপরিচয় তুমি কোথায় পাইবে? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ধাতুস্পর্শমাত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের হস্ত আড়ষ্ট হইয়া তদ্ধাতুগ্রহণে অসমর্থ হইত, পত্র পুষ্প প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুজাতও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বত্বাধিকারীর বিনানুমতিতে গ্রহণ করিলে নিত্যাভ্যস্ত পথ দিয়া আসিতে আসিতে তিনি পথ হারাইয়া বিপরীতে গমন করিতেন; গ্রন্থিপ্রদান করিলে সে গ্রন্থি যতক্ষণ না

উন্মুক্ত করিতেন, ততক্ষণ তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ থাকিত—বহু চেষ্টাতেও বহির্গত হইত না; সুকোমল রমণীস্পর্শে তাঁহার কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সঙ্কোচাদি হইত! —এ সকল শারীরিক বিকার যে পবিত্রতম মানসিক ভাবনিচয়ের বাহ্য অভিব্যক্তি, আজন্ম স্বার্থদৃষ্টিপটু মানব-নয়ন তাহাদের দর্শন কোথায় পাইবে? আমাদের দূরপ্রসারী কল্পনাও কি এ শুদ্ধতম ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়? 'ভাবের ঘরে চুরি' করিতেই আমরা আজীবন শিখিয়াছি। যথার্থ গোপন করিয়া কোনরূপে ফাঁকি দিয়া বড়লোক হইতে পারিলে বা নাম কিনিতে পারিলে আমাদের মধ্যে কয়জন পশ্চাৎপদ হয়? তাহার পর সাহস। একবার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দশবার আঘাত করা অথবা অগ্নি-উদ্গারকারী তোপসম্মুখে ধাবিত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণবিসর্জ্জন, এ সাহস করিতে না পারিলেও শুনিয়া আমাদের প্রীতির উদ্দীপন হয়, কিন্তু যে সাহসে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পৃথিবী ও স্বর্গের ভোগসুখ এবং নিজের শরীর ও মন পর্য্যন্ত জগতের অপরিচিত অজ্ঞাত অনুপলব্ধ ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন, সে সাহসের কিঞ্চিৎ ছায়ামাত্রও আমরা কি অনুভবে সমর্থ? যদি পার, হে বীর শ্রোতা, তুমি আমার এবং সকলের পূজনীয় মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিয়াছ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি তুচ্ছ কথাসকল বা অতি ক্ষুদ্রকার্য্যসমূহও কি গভীর ভাবে পূর্ণ থাকিত, তাহা স্বয়ং না বুঝাইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। সমাধিভঙ্গের পরেই অনেক সময়ে যে তিনি নিত্যপরিচিত বস্তু বা ব্যক্তিসমূহের নামোল্লেখ ও স্পর্শ করিতেন অথবা কোন খাদ্যদ্রব্যবিশেষের উল্লেখ করিয়া ভক্ষণ

পানাদি করিতেন, তাহার গূঢ় রহস্য এক দিন আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "সাধারণ মানবের মন গুহ্য, লিঙ্গ এবং নাভি সমাশ্রিত সূক্ষ্ম স্নায়ুচক্রেই বিচরণ করে। কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলেই ঐ মন কখনও কখনও হৃদয়সমাশ্রিত চক্রে উঠিয়া জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্ম্ময় রূপাদির দর্শনে অল্প আনন্দানুভব করে। নিষ্ঠার একতানতা বিশেষ অভ্যস্ত হইলে কণ্ঠসমাশ্রিত চক্রে উহা উঠিয়া থাকে এবং তখন যে বস্তুতে সম্পূর্ণ নিষ্ঠ হইয়াছে তাহার কথা ছাড়া অপর কোন বিষয়ের আলোচনা তাহার পক্ষে অসম্ভবপ্রায় হয়। এখানে উঠিলেও সে মন নিম্নাবস্থিত চক্রসমূহে পুনর্গমন করিয়া ঐ নিষ্ঠা এককালে ভুলিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু যদি কখনও কোন প্রকারে প্রবল একনিষ্ঠা সহায়ে কণ্ঠের ঊর্দ্ধদেশস্থ ভ্রূমধ্যাবস্থিত চক্রে তাহার গমন হয়, তখন সে সমাধিস্থ হইয়া যে আনন্দ অনুভব করে, তাহার নিকট নিম্ন চক্রাদির বিষয়ানন্দ-উপভোগ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়; এখান হইতে আর তাহার পতনাশঙ্কা থাকে না। এখান হইতেই কিঞ্চিন্মাত্র আবরণে আবৃত পরমাত্মার জ্যোতিঃ তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। পরমাত্মা হইতে ঈষন্মাত্র ভেদ রক্ষিত হইলেও এখানে উঠিলেই অদ্বৈতজ্ঞানের বিশেষ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই চক্র ভেদ করিতে পারিলেই ভেদাভেদ-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান হয়। আমার মন তোদের শিক্ষার জন্য কণ্ঠাশ্রিত চক্র পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে, এখানেও ইহাকে কোনরূপে জোর করিয়া রাখিতে হয়। ছয় মাস কাল ধরিয়া পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করাতে ইহার

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সামান্য কথার গভীর অর্থ

গতি স্বভাবতঃই সেই দিকে প্রবাহিত রহিয়াছে। এটা করিব, ওটা খাইব, একে দেখিব, ওখানে যাইব ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাতে নিবদ্ধ না রাখিলে উহাকে নামান বড় কঠিন হইয়া পড়ে এবং না নামিলে কথাবার্ত্তা, চলাফেরা, খাওয়া ও শরীররক্ষা ইত্যাদি সকলই অসম্ভব। সেই জন্যই সমাধিতে উঠিবার সময়ই আমি কোন না কোন একটা ক্ষুদ্র বাসনা, যথা—তামাক খাব বা ওখানে যাব ইত্যাদি করিয়া রাখি, তত্রাপি অনেক সময়ে ঐ বাসনা বার বার উল্লেখ করায় তবে মন এইটুকু নামিয়া আইসে।"

পঞ্চদশীকার এক স্থানে বলিয়াছেন, সমাধিলাভের পূর্ব্বে মানব যে অবস্থায় যে ভাবে থাকে, সমাধিলাভের পরে সমধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াও নিজের সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে তাহার অভিরুচি হয় না; কেন না, ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত আর সকল বস্তু বা অবস্থাই তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রবল ধর্ম্মানুরাগ প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যে ভাবে চালিত হইত, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যসমূহে পাওয়া যাইত। তাহার দুই-চারিটি উল্লেখ করা এখানে অযুক্তিকর হইবে না।

শরীর, বস্ত্র, বিছানা প্রভৃতি অতি পরিষ্কার রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। যে জিনিসটি যেখানে রাখা উচিত, সে জিনিসটি ঠিক সেইখানে নিজে রাখিতে এবং অপরকেও রাখিতে শিখাইতেন, কেহ অন্যরূপ করিলে বিরক্ত হইতেন। কোনস্থানে যাইতে হইলে গামছা বেটুয়া প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যাদি ঠিক ঠিক লওয়া হইয়াছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার

কালেও কোন জিনিস লইয়া আসিতে ভুল না হয়, সেজন্য সঙ্গী শিষ্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। যে সময়ে যে কাজ করিব বলিতেন তাহা ঠিক সেই সময়ে করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। যাহার হস্ত হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, মিথ্যাকথন হইবার ভয়ে সে ভিন্ন অপর কাহারও হস্ত হইতে ঐ বস্তু কখনও গ্রহণ করিতেন না। তাহাতে যদি দীর্ঘকাল অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাহাও স্বীকার করিতেন। ছিন্ন বস্ত্র, ছত্র বা পাদুকাদি কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে, সমর্থ হইলে নূতন ক্রয় করিতে উপদেশ করিতেন এবং অসমর্থ হইলে কখন কখন নিজেও ক্রয় করিয়া দিতেন। বলিতেন, ওরূপ বস্তু-ব্যবহারে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া ও হতশ্রী হয়। অভিমান-অহঙ্কার-সূচক বাক্য তাঁহার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হওয়া এককালে অসম্ভব ছিল। নিজের ভাব বা মত বলিতে হইলে নিজ শরীর নির্দ্দেশ করিয়া 'এখানকার ভাব,' 'এখানকার মত' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। শিষ্যবর্গের হাত পা চোখ মুখ প্রভৃতি শারীরিক সকল অঙ্গের গঠন এবং তাহাদের চাল-চলন আহার-বিহার নিদ্রা প্রভৃতি কার্য্যকলাপ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তিনিচয়ের গতি, কোন্ প্রবৃত্তির কতদূর আধিক্য ইত্যাদি এরূপ স্থির করিতে পারিতেন যে, তাহার ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই।

দৈনন্দিন জীবনে যে সকল বিষয়ের তাঁহাতে পরিচয় পাওয়া যাইত

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব

তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। আমাদের বোধ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-দুঃখাদি জীবনানুভবের সহিত তাঁহার যে প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল তাহাই উহার কারণ। সহানুভূতি ও ভালবাসা বা প্রেম দুইটি বিভিন্ন বস্তু হইলেও শেষোক্তের বাহ্যিক লক্ষণ প্রথমটির সহিত বিশেষ বিভিন্ন নহে। সেইজন্য সহানুভূতিকে প্রেম বলিয়া ভাবা বিশেষ বিচিত্র নহে। প্রত্যেক বস্তু ভাবিবার কালে উহাতে তন্ময় হওয়া তাঁহার মনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল! ঐ গুণ থাকাতেই তিনি প্রত্যেক শিষ্যের মনের অবস্থা ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেন এবং ঐ চিত্তের উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক তাহাও ঠিক ঠিক বিধান করিতে পারিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকত্ব-বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, শৈশবকাল হইতে তিনি তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কতদুর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ শিক্ষাই যে পরে মনুষ্যচরিত্রগঠনে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শিষ্যবর্গও যাহাতে সকল স্থানে সকল বিষয়ে ঐরূপে ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার করিতে শিখে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক কার্য্যই বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে নিত্য উপদেশ করিতেন। বিচারবুদ্ধিই বস্তুর গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া মনকে যথার্থ ত্যাগের দিকে অগ্রসর করিবে এ কথা তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি। বুদ্ধিহীনের অথবা একদেশী বুদ্ধিমানের আদর তাঁহার নিকট কখনই ছিল না। সকলেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে, "ভগবদ্ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন?" অথবা "একঘেয়ে হস্ নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়, এখানে ঝোলেও খাব, ঝালেও খাব,

অম্বলেও খাব—এই ভাব।” একদেশী বুদ্ধিকেই তিনি একঘেয়ে বুদ্ধি বা একঘেয়ে ভাব বলিতেন। “তুইতো বড় একঘেয়ে”—ভগবদ্ভাবের বিশেষ কোনটিতে কোন শিষ্য আনন্দানুভব না করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিই তাঁহার বিশেষ তিরস্কারবাক্য ছিল। ঐ তিরস্কারবাক্য এরূপ ভাবে বলিতেন যে, উহার প্রয়োগে শিষ্যকে লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে হইত। ঐ উদার সার্ব্বজনীন ভাবের প্রেরণাতেই যে তিনি সকল ধর্ম্মমতের সর্ব্বপ্রকার ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ‘যত মত তত পথ’ এই সত্য-নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মপ্রচার কি ভাবে কতদূর হইয়াছে ও পরে হইবে

ফুল ফুটিল। দেশদেশান্তরের মধুপকুল মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। রবিকরস্পর্শে নিজ হৃদয় সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া ফুল্লকমল তাহাদের পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করিতে কৃপণতা করিল না। পাশ্চাত্য-শিক্ষাসংস্পর্শমাত্রহীন ভারতপ্রচলিত কুসংস্কারখ্যাত ধর্ম্মভাবে গঠিতজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্ম্মমধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত-আস্বাদ জগৎ পূর্ব্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? যে মহান্ ধর্ম্মশক্তি তিনি সঞ্চিত করিয়া শিষ্যবর্গে সঞ্চারিত করিয়াছেন, যাহার প্রবল উচ্ছ্বাসে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্ম্মকে জলন্ত প্রত্যেক্ষের বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম-মতের অন্তরে এক অপরিবর্ত্তনীয় জীবন্ত সনাতনধর্ম্ম-স্রোত প্রবাহিত দেখিতেছে—সে শক্তির অভিনয় জগৎ পূর্ব্বে আর কখনও কি অনুভব করিয়াছে? পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বায়ুসঞ্চরণের ন্যায়

ঠাকুরের মানুষভাব

সত্য হইতে সত্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্যজীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্ত্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং একদিন না একদিন সেই অনন্ত অপার অবাঙ্‌মনসোগোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণকাম হইবে - এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভারতের এবং ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি ভারতভিন্ন দেশের ধর্ম্মাচার্য্যেরা ধর্ম্মজগতের যে একদেশী ভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণবালক নিজ জীবনে সম্পূর্ণরূপে সেই ভাব বিনষ্ট করিয়া বিপরীত ধর্ম্মমতসমূহের প্রকৃত সমন্বয়রূপ অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হইল—এ চিত্র আর কখনও কেহ কি দেখিয়াছে? হে মানব, ধর্ম্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উচ্চাসন যে কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা নির্ণয়ে যদি সক্ষম হইয়া থাক, ত বল; আমরা কিন্তু ঐ বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, নির্জ্জীব ভারত তাঁহার পদস্পর্শে সমধিক পবিত্র ও জাগ্রত হইয়াছে এবং জগতের গৌরব ও আশার স্থল অধিকার করিয়াছে—তাঁহার মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করায় নরও দেবকূলের পূজ্য হইয়াছে এবং যে শক্তির উদ্বোধন তাঁহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র লীলাভিনয়ের কেবল আরম্ভমাত্রই শ্রীবিবেকানন্দে জগৎ অনুভব করিয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে গুরুভাবপর্ব্বে

উত্তরার্দ্ধ সম্পূর্ণ